[Approved and recommended as a text Book for Class IX of all High Schools of West Bengal and Tripura vide West Bengal Board of Secondary Education Notification No. TB/74/IX/PS/74 dated 12.12.75.]

রসায়ন ও পদার্থ-বিদ্যা

(নবম শ্রেণী)

ডক্টর ***ডি. পি. রায়চৌধুরী***, ডি. এস্‌সি
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ-বিদ্যা বিভাগের প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক ;
মধ্যশিক্ষা পর্ষতের প্রাক্তন সচিব

ও

ডক্টর ***এ. কে. সেনগুপ্ত*** ডি. এস্‌সি
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অজৈব রসায়ন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক

মুখার্জী ব্রাদাস
১৮এ, টেমার লেন, কলিকাতা-৯

guidelines thus, 'it is clear that the time has come to try to establish generally accepted principles for the composition of the secondary curriculum for all pupils. This does not presuppose uniform answers... But there is a need to investigate the part which might be played by a "protected" or "core" element of the curriculum common to all schools'.

The School Curriculum gave guidance to local authorities following consultations based upon the 1980 *Framework* and on an HMI paper. *A view of the Curriculum*. It was issued by Mark Carlisle, a Conservative Secretary of State and came to three major conclusions:

1 'The curriculum offered by a school, and the curriculum received by individual pupils, should not be simply a collection of separate subjects; nor is it sufficient to transfer, with modifications, the ideas about the curriculum in the separate selective and non-selective schools of an earlier generation into the comprehensive schools attended by most pupils today.'

2 'There is an overwhelming case for providing all pupils between 11-16 with curricula of a broadly common character with substantial common elements.'

3 School education needs to equip young people fully for adult and working life in a world which is changing very rapidly indeed.'

The DES Note of September 1984 continued the theme, but found the task of reaching decisions as difficult as ever and was prepared only to set out 'some tentative and provisional views'. It rejected the notion of short courses, arguing that 'the study of a subject should be sufficient to be of lasting value'. It listed the essential studies, but found that they added up to more than could be crammed into a week. Its main conclusions about the curriculum for 14-16 year olds are:

1 If the curriculum includes as much as 30% of free of unconstrained options, 'some serious sacrifice in

curriculum breadth results'; a maximum of 15% is mooted;

2 'It is government policy that there should be option choice for the 4th and 5th years';

3 These subjects or elements should be compulsory, either as core or as constrained options;

(a) Composite course to include careers, health and social education;

(b) Religious education (either separately or in the composite course);

(c) English (including literature);

(d) Mathematics;

(e) Science—'Government policy is that all pupils should be introduced, *under whatever guise* to all three. Pupils suffer a particular loss of subsequent opportunity if at the end of year 3 they cease to study *any important element of a broad science curriculum*'. One example mentions a school where the pupils gained entrance to Oxbridge to read science, having taken the Schools Council Integrated Science Project's O level syllabus as part of the core.

(f) Modern Languages - a tentative proposition that the least able pupils should not start a foreign language, that a large majority should study one language for 3 years (11-14) and that 'some' should study one language for 5 years and a second language for 2 or 3 years;

(g) Humanities - a proposition for years 1-3, that every pupil should study 'on a worthwhile scale' history and geography and in addition 'under whatever guise' the principles underlying a free society and some basic economic awareness, is followed by a question for years 4 and 5, 'Is it acceptable that any of these three (sic) elements can be dropped in these two years? The question seems to point towards integrated humanities or a seven-day week;

প্রথম সংস্করণ : ডিসেম্বর, ১৯৭৩
দ্বিতীয় সংস্করণ : জানুয়ারী ১৯৭৪
তৃতীয় মুদ্রণ : জানুয়ারী ১৯৭৬

প্রকাশক :
শিবনাথ দাস
মুখার্জী ব্রাদার্স
১৮এ, টেমার লেন,
কলিকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রাকর :
শ্রীপার্বতীচরণ রায়
গৌতম প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২০৯এ, বিধান সরণী,
কলিকাতা-৭০০০০৬

4|80

মূল্য : [মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ ও প্রকাশক সভায় আলোচনান্তে স্থির হইবে।]

SYLLABUS

CLASS—IX

(Common to both Physics & Chemistry)

Page limit of the text-book

Common to both Physics & Chemistry	— 30 pages	
Physics	— 47	,,
Chemistry	— 53	,,
Total	— 130 pages	

(A single text-book covering the items)

[Double Demy (1/16). Small Pica Type.]

1. Systems of measurement. Different physical quantities and their units. Measuring devices. Ordinary scale, common balance, measuring cylinders, clocks. [14 pages]
2. Matter and energy. Mass and weight, conservation of mass and conservation of energy. Different forms of energy. Transformation of energy (non-quantitative treatment). [8 pages]
3. Change of state. Freezing, melting, boiling, evaporation and condensation. Melting point and boiling point. Factors affecting them. Idea of latent heat. [8 pages]

PHYSICS

CLASS—IX 47 pages

1. Rest and motion ; Displacement, speed, velocity, acceleration and retardation. Newton's laws of motion. Definition of force. (Equations of motion excluded. Rotational motion excluded). [10 pages]
2. Work, energy and power—potential and kinetic energy. Units (No sums). Simple machines—inclined plane, wheel-and-axle and levers (Not mathematical). [9 pages]
3. Nature of heat. Heat and temperature. Factors determining the quantities of heat. Heat as a form of energy. Relationship with work. [8 pages]

4. Source of light. Ray of light. Reflection and Refraction of light. Total internal reflection. Explanation of some natural phenomena on the basis of refraction and total reflection. Propagation and velocity of light. Convex lens and its focussing action. Focal length. Convex lens as a magnifying glass.
Dispersion of light, Spectrum (Demonstration). [20 pages]

CHEMISTRY 53 pages

CLASS—IX

1. (i) Physical states of matter—reasons for existence of the three states—Melting and boiling points.
(ii) Identification of matter—physical and chemical properties—How matter (solid, liquid and gas) differs in physical properties (touch, colour, smell, solubility, magnetic property etc.) and chemical properties (behaviour on heating, treatment with acids etc.)
(iii) Physical and chemical changes : factors which induce and regulate chemical changes viz. contact, temperature, pressure, catalysis etc. Exothermic and Endothermic change :
(iv) Elements and compounds—Metals and Nonmetals. [16 pages]
2. Solution—Solvent and solute : Unsaturated and saturated solution. Solubility and its relation with temperature. [4 pages]
3. Symbols, formula and chemical equations : Significance of chemical equations and balancing, simple equations. [5 pages]
4. Electrolysis—Electrolytes and non-electrolytes—Decomposition of water : Electroplating. [6 pages]
5. Ideas of acids, bases and salts : Neutralization. [3 pages]
6. Oxidation and reduction. [2 pages]
7. Liquid air. Nitrogen and CO_2 Cycle (Elementary ideas) : use of the rare gases in air, Neon lighting. [5 pages]
8. Simple method of preparation and properties of Oxygen, Hydrogen, Nitrogen, Ammonia, Carbon dioxide, Sulphur dioxide, Sulphuretted hydrogen. [12 pages]

বিষয়সূচী

প্রথম অংশ

দ্বিতীয় অংশ—পদার্থ-বিদ্যা

তৃতীয় অংশ—রসায়ন

বিশেষ বক্তব্য

(১) জিজ্ঞাসু ছাত্রের কৌতূহল নিবৃত্তি বা (২) প্রথম শিক্ষার্থীকে কোন বিষয় সরল করিয়া বলিতে গিয়া তাহার কোন ভুল ধারণা না জন্মে বা থাকিয়া না যায়, এই দুই উদ্দেশ্যে বইয়ের কোথাও কোথাও *[ ]* চিহ্নের মধ্যে অল্প কিছু অতিরিক্ত কথা বলা হইয়াছে। এরূপ চিহ্নিত অংশগুলি পঠন বা পাঠনে বাদ দিয়া গেলে সিলেবাস অনুসরণে কোন ত্রুটি হইবে না।

প্রথম অংশ

(রসায়ন ও পদার্থ-বিদ্যা উভয়ে প্রযোজ্য)

I-1. মাপনের বিভিন্ন পদ্ধতি (Systems of measurement)। পদার্থ-বিদ্যা ও রসায়ন যে বর্তমানে এত আগাইয়া গিয়াছে তাহার মূলে রহিয়াছে সূক্ষ্ম মাপন। মাপন সম্বন্ধে বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক লর্ড কেলভিনের একটি উক্তি খুবই মূল্যবান। উক্তিটির ভাবার্থ এইরূপ—"আলোচ্য বিষয় মাপিয়া সংখ্যায় প্রকাশ করিতে পারিলে তখনই বোঝা যাইবে উহা সম্বন্ধে কিছু জানা গিয়াছে। অন্যথায় ঐ বিষয়ে জ্ঞান অতি সামান্য এবং সন্তোষজনক নয় মনে করিতে হইবে।" উক্তিটির মূল্য তোমরা ক্রমশ বুঝিতে পারিবে ; কথাটি মনে রাখিও।

আমাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনে দৈর্ঘ্য, সময়, ওজন, আয়তন প্রভৃতি কয়েকটি রাশি মাপিতে হয়। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই সকল রাশির সংখ্যা আরও অনেক বেশী এবং বিচিত্র ; তাহাদের কথা পরে বলা হইবে। কিছু মাপিতে গেলে দেখিতে পাইবে তোমরা অনুরূপ একটি রাশির সঙ্গে উহার তুলনা করিতেছ। তোমাকে যদি স্কুলের তোমার বসিবার বেঞ্চটির দৈর্ঘ্য কত মাপিতে বলা হয়, তুমি হয়ত হাত মাপিয়া বলিবে উহা পাঁচ হাত। বেঞ্চ কতটা চওড়া জানিতে চাহিলে তুমি বিঘৎ মাপিয়া হয়ত বলিবে উহা দেড় বিঘৎ। বেঞ্চের বসিবার কাঠখানা কত মোটা জিজ্ঞাসা করিলে তুমি হয়ত বলিবে দুই আঙুল।

তোমার কাছে একফুট লম্বা স্কেল থাকিলে উপরের প্রশ্নগুলির হয়ত অন্য রকম উত্তর দিতে। বলিতে 'বেঞ্চ লম্বায় সাত ফুট, চওড়ায় দশ ইঞ্চি এবং উহার কাঠ এক ইঞ্চি মোটা'। কিংবা আরও সূক্ষ্ম মাপ বলিবার চেষ্টায় বলিতে ঐ রাশিগুলি 7 ফুট 2 ইঞ্চি, 10·3 ইঞ্চি ও 0·9 ইঞ্চি।

এমনও হইতে পারে যে তোমার স্কেলের অন্য পাশে সেন্টিমিটারে দাগ কাটা আছে এবং তুমি জ্ঞাতব্য রাশিগুলি সেন্টিমিটারে মাপিয়া বলিলে।

বেঞ্চের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বেধ মাপনের যে উদাহরণ এখানে আমরা আলোচনা করিলাম তাহা হইতে মাপন সম্বন্ধে আমরা কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করিতে পারি :

১। দৈর্ঘ্য রূপ রাশিটি মাপিতে আমরা **পরিমেয় রাশিকে** (অর্থাৎ দৈর্ঘ্য, প্রস্থ বা বেধকে ; পরিমেয়=যাহা মাপা যায়) অনুরূপ আর একটি রাশির (অর্থাৎ হাত, বিঘৎ, আঙুল, ইঞ্চি বা সেন্টিমিটারের) সঙ্গে তুলনা করিয়াছি।

২। তুলনার জন্য যে রাশিটি নেওয়া হয়, তাহাকে ঐ রাশির **একক** বলে। এখানে 'হাত', 'বিঘৎ', 'আঙুল', 'ইঞ্চি', 'সেন্টিমিটার' এইগুলিকেই একক হিসাবে নেওয়া হইয়াছে।

৩। এককের তুলনায় পরিমেয় রাশিটি কতগুণ সেই সংখ্যা এবং এককের নাম বলিলে পরিমেয় রাশির মান সম্পূর্ণরূপে পাওয়া যায়।

উপরের উদাহরণ হইতে 'একক' সম্বন্ধেও কয়েকটি বিষয় দেখিবার আছে :

(ক) 'হাত', 'বিঘৎ', 'আঙুল' জাতীয় একক কাজের পক্ষে সুবিধার নয়, কারণ বিভিন্ন লোকের হাত, বিঘৎ বা আঙুলের মাপ সমান নয়। এ রকম একক ব্যবহার করিলে বিভিন্ন লোক একই জিনিসের দৈর্ঘ্য মাপিয়া বিভিন্ন মান পাইবে। এক জনের মাপে যাহা ঠিক পাঁচ হাত, অন্যের মাপে তাহা হয় কিছু বেশী না হয় কিছু কম হইবার সম্ভাবনা বেশী।

(খ) ইঞ্চি বা সেন্টিমিটার একক হিসাবে অনেক ভাল, কারণ সকল স্কেলেই দেখা যায় ইঞ্চিগুলির দৈর্ঘ্য বা সেন্টিমিটারগুলির দৈর্ঘ্য সমান। ইহাতে উপরের (ক) অংশে বলা গোলমালটা হইতে পারে না।

(গ) ইঞ্চি বা সেন্টিমিটার একক হিসাবে ভাল মানিলাম। কিন্তু উহাদের মধ্যে কোনটি লইব ?

(ঘ) কেহ একটি কেহ অন্যটি লইলেও দুয়ের সম্পর্ক অর্থাৎ এক ইঞ্চিতে কত সেন্টিমিটার বা এক সেন্টিমিটারে কত ইঞ্চি, তাহা জানা থাকা দরকার। তাহা হইলে ইহাদের মান যে এককেই প্রকাশ করা যাক না কেন, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিবে।

(ঙ)[1] তবে একই রাশির (এখানে আলোচিত ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্যের) ভিন্ন প্রকার এককের সংখ্যা যত কম হয় ততই ভাল। একথা সকল রাশির এককের ক্ষেত্রেই খাটে।

অতএব পৃথিবীর সর্বত্র, অর্থাৎ সব দেশে, একই রাশির মাত্র একটি করিয়া একক থাকিলে সব চেয়ে সুবিধা হয়। বিজ্ঞান ইহা করিতেই প্রয়াস পাইয়াছে। বৈজ্ঞানিক মাপনে এজন্য পৃথিবীময় মাত্র একটি পদ্ধতিই প্রচলিত। উহার সঠিক নাম আমরা পরে বলিব; এখন ঐ পদ্ধতিকে আমরা **মেট্রিক পদ্ধতি** (Metric system) বলিয়া উল্লেখ করিব।

দৈনন্দিন কাজে দৈর্ঘ্য, ওজন, আয়তন ইত্যাদি মাপনের ক্ষেত্রে এবং ইঞ্জিনিয়ারিং-এর কাজেও সকল দেশে একই একক ব্যবহৃত হয় না। ইংরেজী ভাষা-ভাষী দেশে এবং বৃটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্গত অনেকগুলি দেশে এই সকল কাজে **বৃটিশ পদ্ধতি** (British system) বলিয়া একটি পদ্ধতি প্রচলিত। ফ্রান্স ও ইউরোপের অন্যান্য

দেশে এবং তাহাদের পূর্বতন বা বর্তমান উপনিবেশগুলিতে প্রধানত সকল কাজেই মেট্রিক পদ্ধতি প্রচলিত। মেট্রিক পদ্ধতির উৎপত্তি ফ্রান্সে ও বৃটিশ পদ্ধতি উৎপত্তি ইংলণ্ডে।

মেট্রিক পদ্ধতিই আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয় হইলেও বৃটিশ পদ্ধতি সম্বন্ধেও আমরা কিছু কথা বলিব। জান বোধ হয় কিছুকাল হইতে ভারত সকল বিষয়েই মেট্রিক পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছে। আগে এখানে বৃটিশ পদ্ধতি প্রচলিত ছিল।

I-2. বিভিন্ন ভৌত রাশি ও তাহাদের একক (Different physical quantities and their units)। পদার্থ-বিদ্যার সূত্রগুলি প্রকাশ করিতে যে সকল রাশির দরকার হয় তাহাদের আমরা **ভৌত রাশি** (Physical quantity) বলি। ইহাদের সবগুলিই পরিমেয়, অর্থাৎ ইহাদের মাপা যায়। ভৌত রাশি কথাটি আরও বিস্তৃত অর্থেও অনেকে ধরিয়া থাকেন। যে রাশি মাপা যায় এবং যাহার মাপনের ফল সংখ্যায় প্রকাশ করা যায়, তাহারা সকলেই ভৌত রাশি।

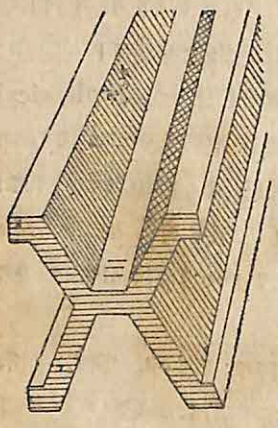
পদার্থ-বিদ্যা বা রসায়নে দৈর্ঘ্য, সময় ও ভর ছাড়া ক্ষেত্রফল, আয়তন, ঘনত্ব, বেগ, ভরবেগ, ত্বরণ, বল, চাপ প্রভৃতি অন্যান্য বহুপ্রকার রাশি মাপিতে হয়। ইহাদের সবগুলির সঙ্গে তোমাদের এখনও পরিচয় ঘটে নাই ; ক্রমশ ঘটিবে।

প্রত্যেক রাশির মাপনের জন্য একটি করিয়া এককের দরকার হয় একথা আমরা আগেই বুঝিয়াছি। প্রত্যেক রাশির জন্য পরস্পর সম্পর্কহীন একটি করিয়া একক আমরা অবশ্যই নিতে পারিতাম। তাহাতে যতগুলি রাশি ততগুলি একক হইত, এবং উহাদের সংখ্যা হইত প্রচুর। অতগুলি আলাদা আলাদা একক লইয়া কাজ করিতে অসুবিধা হইত অনেক।

কিন্তু বিজ্ঞানী এ অসুবিধা হইতে দেন নাই। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তিনি ক্রমশ বুঝিতে পারিলেন মৌলিক তিনটি রাশির, অর্থাৎ (১) দৈর্ঘ্য, (২) ভর ও (৩) কালের একক স্থির করিয়া দিলে উহাদের দিয়াই প্রয়োজনীয় অন্যান্য রাশির এককও স্থির করা যায় ; প্রত্যেকের জন্য আলাদা একক দরকার হয় না।

I-2.1. মেট্রিক পদ্ধতির মৌলিক একক। আগেই বলিয়াছি বিজ্ঞানের কাজে পৃথিবীর সর্বত্র মেট্রিক পদ্ধতি প্রচলিত এবং উহার জন্ম ফ্রান্সে। ফরাসী রাষ্ট্র-বিপ্লবের পর নবগঠিত ফরাসী সরকার দেশের জনসাধারণের উন্নতির জন্য নানাপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য একটি সংস্থা গঠন করিয়া উহার উপর অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে দৈর্ঘ্য, ভর ও কালের একটা নির্দিষ্ট **মাপকাঠি বা 'মানক'** (Standard) স্থির করার ভার দেওয়া হয়। এই সংস্থা স্থির করিলেন মানকগুলি প্রাকৃতিক কোন না কোন স্থির রাশি অনুসারে ঠিক হইবে। সাব্যস্ত হইল দৈর্ঘ্যের মাপকাঠি বা 'মানক' হইবে "বিষুব রেখা হইতে প্যারিসের মধ্য দিয়া যে দ্রাঘিমা

রেখা উত্তর মেরু পর্যন্ত গিয়াছে, সেই দ্রাঘিমা বরাবর মাপা দৈর্ঘ্যের এক কোটি বা দশ 'মিলিয়ন' (10^7) ভাগের এক ভাগ"। সেই অনুসারে একটি মাপকাঠি তৈয়ারি হয়, এবং তাহাকেই দৈর্ঘ্যের মানক (Standard) **মিটার** (Metre) বলা হয়। ইহার হিসাবে পৃথিবীর পরিধি হওয়া উচিত ছিল চার কোটি বা চল্লিশ 'মিলিয়ন' (4×10^7) মিটার। পরে সূক্ষ্মতর মাপনে টের পাওয়া যায় যে বাস্তব মিটার দণ্ডটি কল্পিত মিটারের চেয়ে প্রায় 0.2 মিলিমিটার ছোট। তাহা সত্ত্বেও পরে আন্তর্জাতিক সম্মতিক্রমে ঐ বাস্তব মিটারকেই দৈর্ঘ্যের মানক ধরা হয়।



I-1 চিত্র

এই মিটার দণ্ড 90 ভাগ প্ল্যাটিনাম ও 10 ভাগ ইরিডিয়ামের সংকর ধাতুতে তৈয়ারি। উহার এক অংশ I-1 চিত্রে দেখান হইয়াছে। দণ্ডের ছেদ, এবং চওড়াই ও খাড়াই ছবিতে যেমন দেখা যাইতেছে আসলে প্রায় তাহাই। দণ্ডের দুই প্রান্তের কাছে তিনটি করিয়া সমান্তরাল সূক্ষ্ম দাগ কাটা আছে। (এক পাশের তিনটি দাগ ছবিতে দেখান আছে)। দুপাশের দাগগুলির ঠিক মাঝখানের দাগ দুটির মধ্যে 0° সেলসিয়াস* (বা সেন্টিগ্রেড ; 0°C) উষ্ণতায় যে দূরত্ব, তাহাই এক **মিটার**। এই দণ্ডটি মাপ সংক্রান্ত একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার জিম্মায় প্যারিসের কাছে সুরক্ষিত আছে। ইহাকে 'মূল আন্তর্জাতিক মিটার' (International Prototype Metre) বলে। বিভিন্ন রাষ্ট্রকে ঠিক এই রকম দণ্ড তৈয়ারি করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

ফরাসী ঐ বৈজ্ঞানিক সংস্থা আরও ঠিক করেন যে, যে কোন মানকের ভগ্নাংশ ও গুণিতাংশ দশমিক প্রথায় প্রকাশ করা হইবে, এবং বিশেষ বিশেষ গুণিত বা ভগ্ন অংশ বুঝাইতে মানকের নামের আগে একটি বিশেষ শব্দাংশ বা উপসর্গ বসাইতে হইবে। বেশী ব্যবহৃত উপসর্গগুলির নাম নিচে দেওয়া হইল :

মেগা = দশ লক্ষ গুণ (10^6) বা 'মিলিয়ন' (Million)
কিলো = হাজার গুণ (10^3)

সেন্টি = শতাংশ (10^{-2})
মিলি = সহস্রাংশ (10^{-3})
মাইক্রো = দশলক্ষাংশ (10^{-6}) বা মিলিয়ন অংশ

* আগে যাহাকে 'সেন্টিগ্রেড ডিগ্রী' বলা হইত এখন তাহাকে উষ্ণতার সেন্টিগ্রেড স্কেলের উদ্ভাবক সেলসিয়াস (Celsius)-এর সম্মানার্থে 'সেলসিয়াস ডিগ্রী' বলা হয়। কিন্তু ডিগ্রী চিহ্ন °C-ই আছে।

এক সেন্টিমিটার মিটারের শতাংশ। এক কিলোমিটার এক হাজার মিটার। আন্তর্জাতিক প্রথার অনুকরণে আমরা মিটারকে সংক্ষেপে 'মি' (ইংরেজী m), কিলোমিটারকে 'কিমি' (ইংরেজী km), সেন্টিমিটারকে 'সেমি' (ইংরেজী cm) ইত্যাদি রূপে লিখিব। উপসর্গ ও মানকের নামের মাঝখানে কোন ফুটকি বা ড্যাশ চিহ্ন দিব না।

ভরের মানকের নাম **কিলোগ্রাম (Kilogram)**। ইহার সহস্রাংশের নাম **গ্রাম** (Gram)। দশ সেন্টিমিটার বাহুবিশিষ্ট ঘনকে 4° সেলসিয়াস (বা সেন্টিগ্রেড) উষ্ণতায় এক বায়ুমণ্ডল চাপে যে পরিমাণ বিশুদ্ধ জল ধরে তাহার ভরকেই ভরের মানক ধরিতে চাওয়া হইয়াছিল। সেই অনুসারে মিটার দণ্ডের মত একই সংকর ধাতুতে সমান উচ্চতা ও ব্যাসের (প্রায় 39 মিমি) একটি বেলন (cylinder) তৈয়ারি করা হয়। পরে দেখা যায় ঐ পরিমাণ জলের চেয়ে বেলনটি 28 মিলিগ্রাম বেশী ভারী। তাহা সত্ত্বেও এই বেলনের ভরকেই মিটার দণ্ডের মত আন্তর্জাতিক সম্মতিক্রমে ভরের মানক ধরা ঠিক হয়। এই বেলনকে 'মূল আন্তর্জাতিক কিলোগ্রাম' (International Prototype Kilogram) বলে। ইহা মূল মিটারের সঙ্গে একই জায়গায় রাখা আছে এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রকে ঠিক একই রকম বেলন তৈয়ারি করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

ফরাসী ঐ সংস্থা আয়তনেরও একটি মানক ঠিক করেন। তাহার নাম হয় **লিটার** (Litre)। 4° সেলসিয়াস উষ্ণতায় এক বায়ুমণ্ডল চাপে এক কিলোগ্রাম বিশুদ্ধ জলের আয়তনই হইল এক লিটার।

মিটার, কিলোগ্রাম বা লিটারের ক্ষেত্রে উষ্ণতার উল্লেখ দরকার, কারণ উষ্ণতা বদলাইলে দৈর্ঘ্য বদলায়। তা ছাড়া বিভিন্ন উষ্ণতায় নির্দিষ্ট ভর জলের আয়তনও আলাদা হয়। 4° সেলসিয়াসে জলের ঘনত্ব সবচেয়ে বেশী। তাই কিলোগ্রাম ও লিটারের ক্ষেত্রে জলকে তাহার ঘনতম অবস্থায় লইবার কথাই বলা হইয়াছে। জলের আয়তন চাপের সঙ্গে সামান্য হইলেও একটু বদলায়। তাই সংজ্ঞায় নির্দিষ্ট চাপের কথাও বলা হইয়াছে।

প্রশ্ন। মিটার ও কিলোগ্রাম কিভাবে স্থির করিতে চাওয়া হইয়াছিল? লিটার কাহাকে বলে?

কালের মানক **গড় সৌর সেকেণ্ড (Mean solar second)** বা সংক্ষেপে 'সেকেণ্ড' (সে)। পৃথিবীর নিজ অক্ষে আবর্তনের জন্য যে কোন স্থানে পর পর দুইবার মধ্যরেখা (meridian) বা সর্বোচ্চ সীমা অতিক্রম করিতে সূর্যকে যে সময় নিতে দেখা যায়, তাহা হইল এক সৌর দিন। নিজ কক্ষে পৃথিবীর গতি বৎসরের সব ঋতুতে সমান হয় না বলিয়া, বৎসরে সকল সৌর দিনও সমান হয় না। গ্রীষ্মকালে পৃথিবী নিজ কক্ষে একটু দ্রুত চলে বলিয়া সৌর দিন বড় হয়, শীতকালে ছোট। সৌর

দিনের গড় মানকে 24 ঘণ্টায়, ঘণ্টাকে 60 মিনিটে এবং মিনিটকে 60 ভাগ করিলে সময়ের যে ক্ষুদ্র অংশ পাওয়া যায় তাহাই এক গড় সৌর সেকেণ্ড। গড় সৌর দিনে $24 \times 60 \times 60 = 86{,}400$ গড় সৌর সেকেণ্ড হয়।

মানক ও এককের প্রভেদ। কোন রাশি মাপিতে এককের দরকার হয় বলিয়াছি। কিন্তু সেই একক পাইবার জন্য কোন মাপকাঠি যদি ঠিক করিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে সেই মাপকাঠিকে বলে মানক (Standard)। একক মানকের সমান বা অংশ বিশেষও হইতে পারে।

(ক) এককের সি-জি-এস্ পদ্ধতি (C. G. S. System of units)। মিটার, কিলোগ্রাম ও সেকেণ্ড যথাক্রমে দৈর্ঘ্য, ভর ও কালের মাপকাঠি বা মানক হিসাবে ব্যবহার করা হইবে ইহা ঠিক হইয়া গেলে বিজ্ঞানে মাপনের জন্য কোন্‌টির কত অংশ একক হিসাবে ব্যবহার করা হইবে তাহা স্থির হয়। প্রথমে **মিটারের শতাংশ সেণ্টিমিটারকে দৈর্ঘ্যের একক, কিলোগ্রামের সহস্রাংশ গ্রামকে ভরের একক এবং গড় সৌর সেকেণ্ডকে কালের একক** নেওয়া সাব্যস্ত হয়। এই তিনটি হইল সিজিএস্ পদ্ধতিতে মাপনের **মৌলিক একক**।

যৌগিক একক (Derived units)। ক্ষেত্রফল (Area), আয়তন (Volume), ঘনত্ব (Density), বেগ (Velocity), ভরবেগ (Momentum), ত্বরণ (Acceleration), বল, চাপ প্রভৃতি অন্যান্য ভৌত রাশির একক এই তিনটি মৌলিক এককের সাহায্যেই প্রকাশ করা যায় বলিয়া উহাদের জন্য আলাদা এককের কোন ব্যবস্থা করা দরকার হয় না। এক সেমি বাহুবিশিষ্ট বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল ক্ষেত্রফলের একক হইতে পারে। ইহার জন্য কোন ধাতুপাত নিয়া তাহার ক্ষেত্রফলকে একক বলার দরকার হয় না। এক সেমি বাহুবিশিষ্ট ঘনকের আয়তন আয়তনের একক, সেকেণ্ডে এক সেমি দূরত্ব বেগের একক, এক গ্রাম ভরের বস্তু সেকেণ্ডে এক সেমি বেগে চলিলে উহার ভরবেগকে ভরবেগের একক হিসাবে নেওয়া যায়। ইহাদের কাহারও একক অন্যভাবে ঠিক করা দরকার হয় না। উল্লিখিত অন্যান্য রাশিগুলির ক্ষেত্রেও একক একইভাবে ঠিক করা হয়। উহার যেটি যখন আমাদের আলোচনায় আসিবে তখন তাহার এককের কথা বলা হইবে।

এক ঘন সেণ্টিমিটার (1 সেমি^{3}) আয়তনের একক হইলেও তরল পদার্থের আয়তন মাপনে লিটার ও তাহার সহস্রাংশ মিলিলিটারও ব্যবহৃত হয়। ঔষধসংক্রান্ত ব্যাপারে মিলিলিটারের (ইংরেজীতে ml) প্রচলন বেশী ; পণ্যের (যেমন কেরোসিন, পেট্রল ইত্যাদির) ব্যাপারে লিটার। পদার্থ-বিদ্যার কাজে আমরা মিলিলিটার ব্যবহার করি না ; কিন্তু রসায়নে ইহা ব্যবহার হয়। 1 মিলিলিটার = 1·000028 সেমি^{3}

হওয়ায় দুয়ের প্রভেদ অতি সামান্য। সাধারণ কাজে এ প্রভেদ উপেক্ষা করা যায়। **এই কারণে 1 মিলিলিটার বা 1 ঘন সেন্টিমিটার জলের ভর 1 গ্রাম ধরা যায়।**

সেন্টিমিটার, গ্রাম ও সেকেণ্ডকে মৌলিক একক ধরিয়া বৈজ্ঞানিক মাপনের যে পদ্ধতি উদ্ভাবিত হইল তাহার নাম হইল **এককের সিজিএস্‌ পদ্ধতি**। লক্ষ্য কর সি. জি. এস্‌. (c. g. s.) অক্ষর তিনটি সেন্টিমিটার (centimetre), গ্রাম (gram) ও সেকেণ্ড (second) কথা তিনটির আদ্যক্ষর।

(খ) এককের এম্‌-কে-এস্‌ পদ্ধতি (M. K. S. System of units)। বিদ্যুৎ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান ও উহার প্রয়োগের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে, এবং অন্য কোন কোন কারণেও, সিজিএস্‌ পদ্ধতি সম্বন্ধে কয়েকটি অসুবিধা দেখা গেল। ইহা লইয়া আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সংস্থায় অনেক আলোচনা হয়, এবং ঐ অসুবিধাগুলি যথাসম্ভব দূর করার জন্য তাঁহারা 1954 খ্রীষ্টাব্দে এক সম্মেলনে (Tenth General Conference of Weights and Measures) মিলিত হইয়া সর্বসম্মতিক্রমে মিটার, কিলোগ্রাম ও সেকেণ্ডকে যথাক্রমে দৈর্ঘ্য, ভর ও কালের একক হিসাবে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। অন্যান্য ভৌত রাশির এককও এই নূতন মৌলিক এককগুলি অনুসারে পরিবর্তিত হয়। বর্তমানে ব্যবহৃত এককের এই পদ্ধতিকে **এম্‌ কে এস্‌ (mks) পদ্ধতি** বলে। লক্ষ্য করে এম্‌, কে, এস্‌ অক্ষর তিনটি মিটার (metre), কিলোগ্রাম (kilogram) ও সেকেণ্ড (second) কথা তিনটির আদ্যক্ষর। ইঞ্জিনিয়ারিং-এও এম্‌কেএস্‌ পদ্ধতি ব্যবহৃত হইতেছে।

এম্‌কেএস্‌ পদ্ধতিতেও যৌগিক এককগুলি ইহার মৌলিক একক তিনটি হইতেই পাওয়া যায়।

প্রশ্ন। এককের এম্‌কেএস ও সিজিএস্‌ পদ্ধতিতে প্রভেদ কি? উভয় পদ্ধতির মৌলিক এককগুলি বর্ণনা কর।

মৌলিক একক হইতে যৌগিক একক কিভাবে পাওয়া যায় তাহার তিনটি উদাহরণ দাও।

এক ঘন সেন্টিমিটার বা এক মিলিলিটার জলের ভর এক গ্রাম ধরা যায় কেন?

I-2.2. বৃটিশ বা এফ্‌ পি এস্‌ পদ্ধতি (British or F. P. S. System)। এই পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্যের একক **ফুট** (foot), ভরের একক **পাউণ্ড** (pound) ও কালের একক **সেকেণ্ড** (second)। ইংরেজী কথা কয়টির প্রথম অক্ষর লইয়া পদ্ধতির নামকরণ হইয়াছে। ইংলণ্ড উহার উৎপত্তিস্থান; তাই উহাকে বৃটিশ পদ্ধতিও বলা হয়। লণ্ডনে রাখা বিশেষ একটি ব্রোঞ্জদণ্ডের দুই প্রান্তের কাছের দুইটি দাগের মধ্যে 62° ফারেনহাইট উষ্ণতায় যে দূরত্ব, তাহা হইল এক গজ (yard)।

ফুট ইহার তৃতীয়াংশ। ভরের একক পাউণ্ড একই জায়গায় রাখা একটি প্ল্যাটিনাম বেলনের ভর। সেকেণ্ড আমাদের পরিচিত গড় সৌর সেকেণ্ড। বৃটিশ পার্লামেণ্টে গৃহীত একটি প্রস্তাব অনুসারে ইহাদের প্রচলন হয়।

বৃটিশ পদ্ধতির যৌগিক এককগুলি ইহার মৌলিক এককগুলির সাহায্যেই ঠিক করা।

বৃটিশ পদ্ধতিতে আয়তনের একটি ব্যবহারিক একক হইল **গ্যালন** (gallon)। ইহা 62° ফারেনহাইট উষ্ণতায় দশ পাউণ্ড জলের আয়তন।

মেট্রিক ও বৃটিশ পদ্ধতির পারস্পরিক সম্পর্ক

1 পাউণ্ড = 453·6 গ্রাম	1 কিলোগ্রাম (কেজি) = 2·2046 পাউণ্ড
1 ইঞ্চি = 2·54 সেমি	1 মিটার = 39·37 ইঞ্চি
1 ফুট = 30·48 সেমি	1 সেন্টিমিটার = 0·3937 ইঞ্চি

এই তালিকাটি এক পদ্ধতির মাপকে অন্য পদ্ধতির মাপে পরিণত করিতে পারে। ইহার প্রথম ও তৃতীয় সম্পর্কটি মনে রাখিলেই বাকী সবগুলি পাওয়া যায়।

বৃটিশ পদ্ধতির তুলনায় মেট্রিক পদ্ধতির বড় সুবিধা হইল (১) মেট্রিক পদ্ধতিতে দশমিক ব্যবহার। এককের গুণিতাংশ ও ভগ্নাংশগুলি মাত্র দশমিক বিন্দুর জায়গা বদলাইয়া বা 10-এর ঘাতাঙ্ক পরিবর্তন করিয়াই পাওয়া যায়। কিন্তু বৃটিশ পদ্ধতিতে তাহা নয়। উদাহরণ দেখ—**1** কিমি $= 10^3$ মি $= 10^5$ সেমি, ইত্যাদি। কিন্তু 1 মাইল = 1760 গজ = 1760 × 3 ফুট = 1760 × 3 × 12 ইঞ্চি।

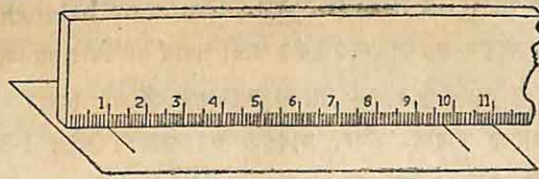
তাছাড়া, (২) মেট্রিক পদ্ধতি মূল মানকগুলিকে প্রাকৃতিক স্থির রাশির সঙ্গে মিলাইতে চাহিয়াছিল। কিন্তু বৃটিশ মানকগুলির সেরকম কোন গুণ নাই। মেট্রিক মানক ঈপ্সিত মানকের সঙ্গে সঠিক না মিলিলেও, প্রাকৃতিক স্থির রাশির সঙ্গে মানরেক সম্পর্ক রাখার প্রয়োজনীয়তা দেখাইয়াছে। এরকম করিলে মূল মানক কোন ভাবে নষ্ট হইলেও উহা ফিরিয়া আবার গড়া যায়।

প্রশ্ন। বৃটিশ পদ্ধতির তুলনায় মেট্রিক পদ্ধতির সুবিধা কি? এক পাউণ্ডে কত গ্রাম এবং এক ইঞ্চিতে কত সেণ্টিমিটার বল। 100 গজ দৌড়ের মাঠ বাড়াইয়া 100 মিটার করিতে উহা আগের কত শতাংশ বাড়াইতে হইবে?. এক গ্যালন জল ও পাঁচ লিটার জলে ভরের প্রভেদ মোটামুটি কত গ্রাম?

I-3. মৌলিক রাশিগুলির মাপন যন্ত্র (Measuring devices)। বিজ্ঞানসংক্রান্ত মাপনের প্রথম স্তরে দেখিতে পাইবে তোমাকে দৈর্ঘ্য, ভর বা সময় মাপিতে হইতেছে। প্রাথমিক স্তরের কয়েকটি মাপনযন্ত্র সম্বন্ধে পরে কিছু বলা হইল।

বিভিন্ন সূক্ষ্মতায় মাপনের জন্য বিভিন্ন যন্ত্র দরকার। বেশী সূক্ষ্ম মাপন যন্ত্রের গঠনে ও ক্রিয়ায় জটিলতা বেশী। প্রাথমিক স্তরে মাপনের জন্য যে সূক্ষ্মতা দরকার, সেই সূক্ষ্মতা দিতে পারে এমন যন্ত্রের কথাই এখানে বলা হইবে।

I-3.1. দৈর্ঘ্য মাপন। (ক) মিটার স্কেল। ইহা এক মিটার লম্বা কাঠের বা ইস্পাতের একটি স্কেল। স্কেলে সেন্টিমিটারের দাগ কাটা। প্রত্যেক সেন্টিমিটারকে আবার দশভাগ করিয়া মিলিমিটারের দাগ কাটা থাকে। ইহার সাহায্যে কোন



I-2 চিত্র

দূরত্ব মিটার, সেন্টিমিটার ও মিলিমিটারে মাপা যায়। মিলিমিটারের ভগ্নাংশ কিছুটা চোখের আন্দাজে (Eye estimation-এ) ঠিক করা যায়। কিন্তু ইহার জন্য অভ্যাস দরকার। দুই বিন্দুর মধ্যে দূরত্ব মাপিতে স্কেলের দাগগুলি উহাদের যত কাছে পার আনিবে (I-2 চিত্র দেখ)।

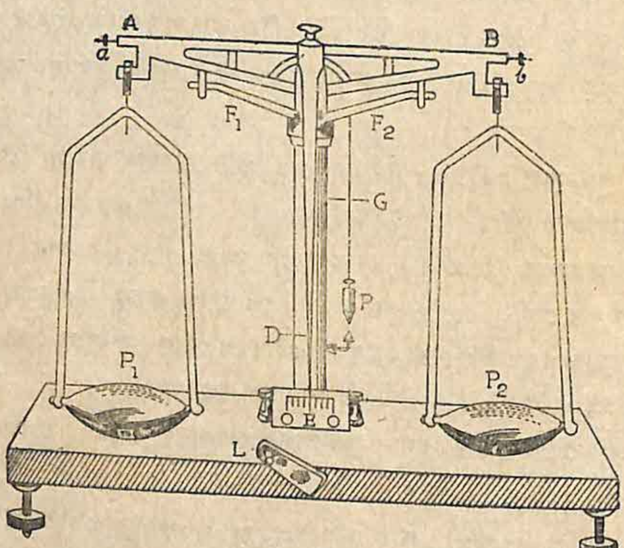
(খ) ফুট-রুল (Foot rule)। দৈর্ঘ্য ফুটে মাপিবার অনুরূপ স্কেল আছে। ইহাদের সাধারণত ফুট-রুল বা ফুট স্কেল বলা হয়। ইহাতে প্রত্যেক ইঞ্চিকে 10 ভাগ (কোন কোন ক্ষেত্রে 16 ভাগ) করিয়া দাগ কাটা থাকে। কোন কোন মিটার স্কেলের এক ধার সেন্টিমিটারে ও অন্য ধার ইঞ্চিতে দাগান থাকে। প্রত্যেক সেন্টিমিটার ও ইঞ্চিকে আবার দশ ভাগ করা থাকে। এই রকম স্কেলের সাহায্যে দৈর্ঘ্য সেন্টিমিটার ও মিলিমিটারে এবং ফুট, ইঞ্চি ও ইঞ্চির দশমাংশে পড়া যায়।

(সাধারণ কাজে মিটার স্কেল বা ফুট-রুলের ব্যবহারই যথেষ্ট। বৈজ্ঞানিক কাজে সূক্ষ্মতর মাপন দরকার হইলে স্লাইড ক্যালিপার্স (Slide Calipers), ভার্নিয়ার স্কেল (Vernier scale), স্ক্রু-গেজ (Screw gauge) প্রভৃতি যান্ত্রিক ব্যবস্থা ব্যবহার করিতে হয়। এগুলি আমাদের আলোচনার বাহিরে।)

I-3. 2. ভর মাপন। দোকানে ও বাজারে দাঁড়িপাল্লা দিয়া ওজন করিতে সকলেই দেখিয়াছ। ইহা ভর মাপন। কেহ এক কিলোগ্রাম (কেজি) জিনিস কিনিলে, কেহ 200 গ্রাম, কেহ বা মসলার দোকানে মাত্র 10 গ্রাম ছোট এলাচ কিনিলে। কয়লা কিনিতে হয়ত 40 কেজি চাহিবে। লক্ষ্য করিয়া থাকিবে বেশী ওজনের জন্য যে রকম দাঁড়িপাল্লা ব্যবহৃত হয়, কম ওজনের জন্য তাহা নয়। সোনার

দোকানের নিক্তিতে গ্রামের দশমাংশও মাপা যাইতে পারে। নিক্তি এবং ছোট বা বড় দাঁড়িপাল্লা সবগুলি একই উপায়ে ভর মাপে। সকল ক্ষেত্রেই **জানা** কতকগুলি ওজন, যেমন 10 কেজি, 1 কেজি, 500 গ্রাম, 100 গ্রাম, 10 গ্রাম, ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। দাঁড়িপাল্লা বা নিক্তির এক পাত্রে এই জানা ওজনগুলি থাকে, অন্যদিকে থাকে পণ্য। দাঁড়িপাল্লার আড়া ঠিক সোজা (অনুভূমিক) হইলেই (অর্থাৎ একদিকে কাত হইয়া না থাকিলেই) বোঝা গেল ওজন ঠিক হইয়াছে।

বৈজ্ঞানিক মাপনের সাধারণ তুলা (Common balance)। বৈজ্ঞানিক মাপন সাধারণত কয়েক গ্রামের চেয়ে বেশী ভারী পদার্থ মাপিবার দরকার হয় না এবং মাপনের সূক্ষ্মতা প্রাথমিক স্তরে এক গ্রামের দশমাংশ হইলেই চলে। ইহার জন্য যে দাঁড়িপাল্লা, বিজ্ঞানের ভাষায় 'তুলা', ব্যবহৃত হয় তাহার গঠন I-3 চিত্রে দেখান হইয়াছে। AB তুলাদণ্ড বা তুলার আড়া (Balance beam), P_1 ও P_2 তুলার পাত্র (Pan)। AB দণ্ডের ঠিক মাঝখানে এক খণ্ড তেশিরা ইস্পাত বা আগেট



I-3 চিত্র

(agate) পাথরের টুকরা দণ্ডের আড়াআড়ি করিয়া লাগান। উহার একধার নিচমুখী ; ইহাকে ক্ষুরধার (Knife-edge) বলে। ক্ষুরধার তুলার মাঝখানের G স্তম্ভের মাথায় সমতল পাতের উপর বসান। P_1 ও P_2 পাত্র দুইটি ক্ষুরধার হইতে সমান দূরত্বে AB আড়া হইতে ঝুলান। ক্ষুরধারের সঙ্গে লাগান লম্বা একটি কাঁটা বা 'সূচক' (Pointer) D আড়া দুলিলে, E-স্কেলটির উপর দিয়া এপাশ ওপাশ সরিতে

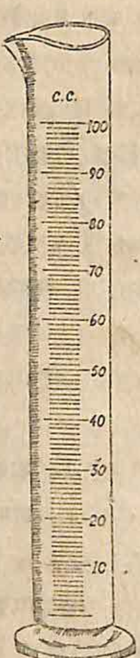
পারে। ব্যবহারের কাল ছাড়া অন্য সময় তুলাপাত্র সমেত আড়া F_1F_2 ফ্রেম বা মঞ্চের উপর স্থিরভাবে বসান থাকে। কাজের সময় L লিভার ঘুরাইয়া মঞ্চ নামাইয়া নিলে ক্ষুরধারের উপর AB দুলিতে থাকে ও D সূচক E স্কেলের উপর আনাগোনা করে। AB-র দুপাশে a ও b ভার দুইটি ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া সূচককে E স্কেলের মাঝখানে আনা যায়। দরকার হইলে a, b-র সাহায্যে প্রথমে D-কে E-র মাঝখানে আনিয়া নেওয়া হয়। পরে L লিভার উল্টাদিকে ঘুরাইয়া AB-কে মঞ্চে আটকাইয়া P_1 পাত্রে পরিমেয় বস্তু ও P_2 পাত্রে আন্দাজ মত ভর বসাইয়া L আবার ঘুরাইয়া সূচক কোন্ দিকে সরিল দেখিতে হয়। আবার AB-কে মঞ্চে আটকাইয়া দরকার মত জানা ওজন বাড়াইয়া বা কমাইয়া সূচককে ক্রমে প্রাথমিক দাগে আনিতে হয়। এই অবস্থা ঘটিলে পরিমেয় বস্তুর ভর জানা ওজনগুলির ভরের সমান হয়। এইভাবে ভর মাপা হয়।

মনে রাখিও প্রতিবার ওজন বাড়াইবার বা কমাইবার আগে AB-কে মঞ্চে আটকাইয়া লইতে হইবে। নহিলে যন্ত্রের ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা থাকে। জানা ওজনগুলি একটি বাক্সে সাজান থাকে। ইহাকে 'ওজনের বাক্স' (Weight box) বলে। এই ওজনগুলি কখনও হাতে ধরিতে নাই। উহাদের ধরিবার জন্য বাক্সে একটি চিমটা (Tongs) দেওয়া থাকে। ওজনগুলি 500 গ্রাম হইতে 0·2 বা 0·1 গ্রাম পর্যন্ত হইতে পারে।

তুলাপাত্র দুলিতে থাকিলে D সূচকের সঠিক অবস্থান জানা যায় না বলিয়া ওজনও ঠিক হয় না। হাওয়ায় যাহাতে তুলাপাত্রগুলি না দোলে সে জন্য সম্পূর্ণ তুলাটি দুপাশে বা সামনে দরজাওয়ালা একটি কাচের বাক্সে থাকে। দরজা খুলিয়া বস্তু ও ওজন বসান হয়। তুলার আড়া যে G স্তম্ভের উপরে বসান থাকে তাহাকে ঠিক খাড়া রাখা দরকার। সে জন্য G-তে একগাছা ওলন দড়ি (P) লাগান থাকে। P-র সরু মাথা G-তে লাগান আর একটি কাঁটার ঠিক উপরে থাকিলে বোঝা যায় G-স্তম্ভ ঠিক খাড়া হইয়াছে। তুলার পাটাতনের নিচে লেভলিং স্ক্রু (Levelling screw) আছে। দরকার হইলে ঐগুলি ঘুরাইয়া G-কে ঠিক খাড়া করা হয়। ইহা অবশ্য দরকার।

I-3.3. **আয়তন মাপন।** কঠিন, তরল বা বায়বীয় বস্তুর আয়তন মাপন এক উপায়ে হয় না। প্রধানত তরলের আয়তন মাপনের জন্য ঘন সেন্টিমিটারে দাগ কাটা কাচের বা পলিথিনের বেলন ব্যবহার করা হয় (I-4 চিত্র)। ইহাদের আমরা **'মাপক বেলন' (Measuring cylinder)** বলি। বিভিন্ন আয়তনের জন্য সরু, মোটা, খাট, লম্বা, নানা আকারের বেলন ব্যবহার হয়। 5 ঘন সেন্টিমিটার হইতে

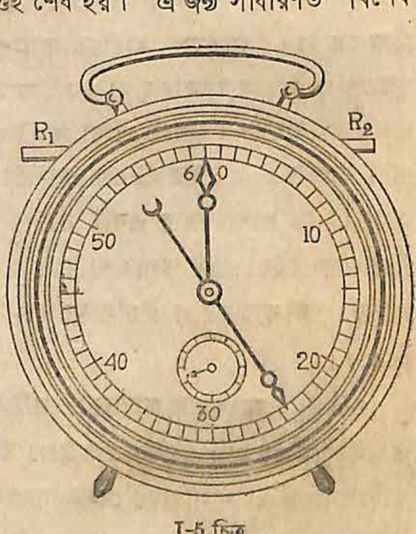
1000 ঘন সেন্টিমিটার পর্যন্ত মাপার জন্য বিভিন্ন বেলন থাকে। আকার বুঝিয়া বেলনগুলির সবচেয়ে ছোট দাগের মান 1 ঘন সেমি হইতে 0·1 ঘনসেমি পর্যন্ত হইতে পারে। ঘন সেন্টিমিটারকে ইংরেজীতে cubic centimetre বলে ও সংক্ষেপে উহাকে cm^3 লেখা হয়। রসায়নে সাধারণত cm^3-এর বদলে c.c. বা cc-র প্রচলন বেশী দেখা যায়। মাপক বেলনের দাগগুলি মিলিলিটার (ml-এ)-ও দেওয়া থাকে।



I-4 চিত্র

যে সকল কঠিন বস্তু জলে ডোবে অথচ গলে না, এমন বস্তুর আয়তনও মাপক বেলনের সাহায্যে পাওয়া যায়। কি ভাবে, তাহা এখন আমাদের আলোচ্য নয়।

I-3.4. **সময় মাপন**। ঘড়ির সাহায্যে সময় মাপা হয়। দেওয়াল ঘড়ি, টেবিল ঘড়ি (Timepiece), পকেট ঘড়ি, হাতঘড়ি—কতরকমের ঘড়িই না আছে! উহারা সকলেই 12 ঘন্টা হইতে 1 মিনিট বা এক সেকেণ্ড পর্যন্ত মাপে। বিজ্ঞানের কাজে আমাদের সময়ের একটা ব্যবধান মাপিতে হয়। কোন ক্রিয়া বা কোন গতি আরম্ভ হইল। আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত কতটা সময় গেল তাহাই আমাদের জানা দরকার হয়। সমস্ত কাজটি হয়ত কয়েক মিনিট বা কয়েক সেকেণ্ডেই শেষ হয়। এ জন্য সাধারণত বিশেষ গঠনের দুরকম ঘড়ি ব্যবহার করা হয়। একটির নাম 'স্টপ-ক্লক' (Stop-clock) (I-5 চিত্র) ও অন্যটির নাম, 'স্টপ-ওয়াচ' (Stop-watch) (I.6 চিত্র)। ইহাদের ইচ্ছামত চালান ও থামান যায়।



I-5 চিত্র

স্টপ-ক্লক (I-5 চিত্র) দেখিতে প্রায় টেবিল ঘড়ির মত। উহার বড় কাঁটা সেকেণ্ডের কাঁটা ও অন্য কাঁটাটি মিনিটের কাঁটা। মিনিটের কাঁটা ঘুরাইয়া শূন্যের (অর্থাৎ 60-এর) ঘরে আনার ব্যবস্থা থাকে। কোন কোন ঘড়িতে আরও ছোট একটি কাঁটা ঘড়ির নিচের অংশে গোল স্কেলের উপর ঘুরিয়া

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে আধ ঘণ্টা সময় বুঝায়। স্টপ-ক্লকের সবচেয়ে দরকারী অঙ্গ উহার উপরের দিকে R_1 R_2 দণ্ড। এই দণ্ড একদিকে ঠেলিলে ঘড়ি চলিতে আরম্ভ করে, অন্যদিকে ঠেলিলে ঘড়ি বন্ধ হয়। ইহাতে চলা আরম্ভ হইতে বন্ধ হওয়া পর্যন্ত সময়ের ব্যবধান সহজে দেখিয়া নেওয়া যায়। স্টপ-ক্লকের সেকেণ্ডের কাঁটা নিজ হইতে এক এক ধাক্কায় সাধারণত আধ সেকেণ্ড করিয়া সরে। অতএব ইহাতে আধ সেকেণ্ড পর্যন্ত সূক্ষ্মতায় সময়ের ব্যবধান মাপন চলিতে পারে।

'স্টপ-ওয়াচ' দেখিতে অনেকটা পকেট ঘড়ির মত। উহাতে সেকেণ্ডের দাগগুলি 1/5 বা 1/10 সেকেণ্ডে ভাগ করা থাকে। কাঁটাও এক এক ধাক্কায় 1/5 বা 1/10 সেকেণ্ড সরে। ইহাতে সময়ের ব্যবধান মাপন স্টপ-ক্লকের চেয়ে সূক্ষ্মতর হইতে পারে। ঘড়ি চালাইতে বা বন্ধ করিতে ঘড়ির মাথার B চাবিটি টিপিতে হয়। প্রথমবার টিপিলে বন্ধ ঘড়ি চলিতে শুরু করে, আবার টিপিলে ঘড়ির চলা বন্ধ হয়। তৃতীয়বার টিপিলে সেকেণ্ড ও মিনিটের কাঁটা শূন্যের ঘরে ফিরিয়া আসে।



I-6 চিত্র

খেলার প্রতিযোগিতায়, দৌড় বা সাঁতারের ক্ষেত্রে সময় মাপিতে স্টপ-ওয়াচের ব্যবহার কেহ কেহ লক্ষ্য করিয়া থাকিবে।

প্রশ্ন। দৈর্ঘ্য, ভর, কাল ও আয়তন মাপনের একটি করিয়া যন্ত্রের নাম উল্লেখ কর, এবং উহাদের কোন্‌টিতে কত সূক্ষ্মতায় মাপন সম্ভব তাহার আভাস দাও।

I-4. পদার্থ ও শক্তি (Matter and Energy)। মহাবিশ্বে মাত্র দুই প্রকার সত্তা আছে। একের নাম 'পদার্থ' (Matter), অন্যের নাম 'শক্তি' (Energy)। পদার্থে শক্তি সংযোগ হইলে পদার্থের কোন না কোন পরিবর্তন হয়। পদার্থের উপর শক্তির ক্রিয়াই সকল প্রকার পরিবর্তনের মূল। শক্তির ক্রিয়া না ঘটিলে পদার্থে নিজ হইতে কোন পরিবর্তন হয় না।

এখানে বলিয়া নেওয়া ভাল যে পদার্থের গঠনসংক্রান্ত বিষয়গুলি ও বিভিন্ন পদার্থের সংযোগে অন্য পদার্থ গঠন প্রধানত রসায়নের অন্তর্গত। পদার্থ-বিদ্যার আলোচ্য বিষয় পদার্থ ও শক্তির পারস্পরিক ক্রিয়া। মনে করিও না রসায়নে শক্তির ক্রিয়া নাই; সকল পরিবর্তনের মূলেই রহিয়াছে শক্তি। রসায়ন ও পদার্থ-বিদ্যা দুইটি সম্পূর্ণ আলাদা শাস্ত্র নয়, মৌলিক অনেকগুলি বিষয় উভয়েরই অন্তর্গত। জীবন বিজ্ঞানের মূলেও পদার্থ ও শক্তি লইয়া কাজ: একথা সকল বিজ্ঞান সম্বন্ধেই সত্য। বিভিন্ন বিজ্ঞানে

বিভিন্ন বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে মাত্র। পদার্থের ধর্ম এবং পদার্থ ও শক্তির পারস্পরিক ক্রিয়ার মূলসূত্রগুলি জানিতে পারাই বিজ্ঞানীর লক্ষ্য।

I-4.1. শক্তি (Energy)। শক্তি কি? বলা যাক **যাহা পদার্থে পরিবর্তন ঘটাইতে পারে তাহাই শক্তি।** শক্তি কোন পদার্থ নয়; কিন্তু উহার বিবিধ রূপ আছে। বিভিন্ন রূপগুলির নাম সাধারণত এই রকম করা হইয়া থাকে—(১) যান্ত্রিক (mechanical) শক্তি, (২) বৈদ্যুত (electrical) শক্তি, (৩) চৌম্বক (magnetic) শক্তি, (৪) আলোক (light) শক্তি, (৫) শব্দ (sound) শক্তি, (৬) তাপ (heat) শক্তি, (৭) রাসায়নিক (chemical) শক্তি ও (৮) পারমাণবিক (atomic) শক্তি। যান্ত্রিক শক্তিকে দুই ভাগ করা হয়—(ক) স্থিতিশক্তি ও (খ) গতিশক্তি এ দুটির কথা পরে 'পদার্থ-বিদ্যা' অংশের II-3 1 ও II-3.2 বিভাগে কিছু বিশদভাবে বলা হইয়াছে।

বিভিন্ন প্রকার শক্তির কিছু উদাহরণ আমরা এখানে দিব। ধর স্থিতিশক্তি। যে ঘড়ি স্প্রিং-এ চলে তাহাতে দম দিলে স্প্রিং-এর আকার বদলায় এবং এই কারণে উহা ঘড়ির যন্ত্রাংশগুলি চালাইবার ক্ষমতা পায়। দম না দিলে ঘড়ি চলে না। স্প্রিং-এর শক্তি স্থিতি-শক্তি। স্থিতিশক্তির সংজ্ঞা পরে দেওয়া হইবে ('পদার্থ-বিদ্যা' অংশের II-3.2 বিভাগ)।

কামানের গোলা দেওয়াল ভাঙিয়া ফেলিতে পারে। স্থির অবস্থায় থাকিলে গোলা দেওয়ালে কোন পরিবর্তন ঘটাইতে পারিত না। গোলার বেগের জন্যই দেওয়াল ভাঙিয়াছে। চলন্ত গোলার শক্তি গতিশক্তি। ঢিল ছুড়িয়া গাছ হইতে আম পাড়া ঢিলের গতিশক্তির জন্য সম্ভব হয়।

বৈদ্যুত শক্তির উদাহরণ বৈদ্যুতিক পাখার চলন, বৈদ্যুতিক মোটর ঘোরা, বিজলী বাতি জ্বলা ইত্যাদি। বৈদ্যুত শক্তির সাহায্যে জলকে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনে বিচ্ছিন্ন করা যায়।

চৌম্বকশক্তি লোহাকে কাছে টানিয়া আনে; চৌম্বক সমমেরু একে অন্যকে ঠেলিয়া কোন কোন মাপন যন্ত্রে কাঁটা ঘোরায়।

আলোকশক্তি চোখের ভিতর রেটিনা (Retina) নামক পর্দায় রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটাইয়া দৃষ্টির অনুভূতি জাগায়। খুব ছোট কণাকে আলোকশক্তি ঠেলিয়া দূরে সরাইয়া দিতে পারে। ধূমকেতুর লেজ ইহার একটি উদাহরণ। লেজার (Laser) নামক ব্যবস্থায় সৃষ্ট তীব্র আলোকে কেন্দ্রীভূত করিয়া ধাতুপাতে ছেঁদা করা যায়। আতশী কাচের সাহায্যে সূর্যের আলো কেন্দ্রীভূত করিয়া হয়ত তোমরা কেহ কেহ কাগজ জ্বালাইতে দেখিয়াছ।

শব্দশক্তি আসলে কম্পনের যান্ত্রিকশক্তি; উহা আলাদা কোনপ্রকার শক্তি নয়।

তাপশক্তি যোগে পদার্থের উষ্ণতা বাড়ে।

কয়লা জ্বলিয়া আমাদের তাপ দেয়। ইহা কয়লাতে সঞ্চিত রাসায়নিক শক্তির জন্য হয়। চলাফেরা করা, কথা বলা ইত্যাদি যাহা কিছু আমরা করি তাহার মূলে আমাদের খাদ্যে সঞ্চিত রাসায়নিক শক্তি। ডাইনামাইট দিয়া সেতু উড়াইয়া দেওয়া বা পাহাড় ভাঙিয়া খনিজ পদার্থ বাহির করা ডাইনামাইটে সঞ্চিত রাসায়নিক শক্তির ক্রিয়া।

অ্যাটম বোমা ও হাইড্রোজেন বোমার কথা বোধ হয় তোমরা সকলেই শুনিয়াছ। এই বোমার বিস্ফোরণে হঠাৎ যে বিপুল পরিমাণ শক্তি মুক্ত হইয়া ধ্বংস ঘটায় তাহা পারমাণবিক শক্তি। শুনিয়া আশ্চর্য হইবে পারমাণবিক শক্তি আসে কিছু পদার্থ শক্তিতে পরিণত হওয়ায়।

আমরা কি কোন ইন্দ্রিয় দিয়া শক্তি অনুভব করিতে পারি? ইহার উত্তরে বিজ্ঞানী বলেন শক্তি সাক্ষাৎভাবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, অর্থাৎ কেবলমাত্র শক্তিকে কোন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে টের পাওয়া যায় না। ইন্দ্রিয় যাহা অনুভব করে তাহা পদার্থের উপর শক্তির ক্রিয়ায় পদার্থের পরিবর্তন। স্পর্শেন্দ্রিয়ের সাহায্যে তাপশক্তি বোঝা যায় বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু স্পর্শেন্দ্রিয় যাহা অনুভব করে তাহা তাপের ক্রিয়ায় উষ্ণতার পরিবর্তন। পরিবর্তন শক্তি নয়; পরিবর্তন শক্তির ক্রিয়া। আলোকশক্তি আমরা চোখে দেখিতে পাই না; কিন্তু উহা যখন কোন বস্তুতে পড়িয়া সেখান হইতে আসিয়া আমাদের চোখে পড়ে তখন বস্তুটি আমরা দেখিতে পাই। আলোকশক্তি অদৃশ্য। কোনপ্রকার শক্তিই সোজাসুজি ইন্দ্রিয় দিয়া অনুভব করা যায় না। শব্দশক্তি কানের পর্দা কাঁপায় বলিয়া আমরা শব্দ শুনি।

প্রশ্ন। শক্তি কাহাকে বলে সংক্ষেপে বুঝাও। বিভিন্ন প্রকার শক্তির নাম কর, এবং উহাদের যে কোন তিনটির উদাহরণ দাও।

I-4 2. পদার্থ (Matter)। পদার্থ কী—এই প্রশ্নের উত্তর দিবার আগে খুঁজিতে হইবে পদার্থ অত বিচিত্র রকমের হইলেও সকল প্রকার পদার্থের একই কোন ধর্ম আছে কিনা এবং থাকিলে তাহা কি। আমাদের বর্তমান জ্ঞান হইতে ইহার উত্তর এখন আমরা সহজেই দিতে পারি—যদিও এ উত্তর পাইতে বিজ্ঞানীর বহুদিন লাগিয়াছিল।

(১) সকল পদার্থই খানিকটা স্থান জুড়িয়া থাকে। অতএব পদার্থের ব্যাপ্তি অর্থাৎ 'আয়তন' (Volume) আছে।

(২) কোন পদার্থ-খণ্ড (বা বস্তু ; Body) স্থির থাকিলে উহাকে নড়াইতে 'বল'

প্রয়োগ করিতে হয়। পদার্থের এই ধর্মকে 'জড়ত্ব' বা 'জাড্য' (Inertia) বলে। সকল পদার্থেরই জাড্য ধর্ম আছে।

(৩) পৃথিবীতে যত রকম পদার্থ আছে, দেখা গিয়াছে পৃথিবী তাহাদের সকলকেই নিজের কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে। সকল পদার্থেরই তাহা হইলে 'এমন কিছু' একটা আছে যাহার জন্য পদার্থ-খণ্ড (বস্তু) পৃথিবীর আকর্ষণ অনুভব করে। এই যে 'এমন কিছু' যাহা সকল পদার্থেই আছে, এবং যাহার জন্য উহারা পৃথিবীর আকর্ষণ অনুভব করে, তাহাকে আমরা নাম দিয়াছি **ভর (Mass)**। সকল পদার্থেরই ভর আছে।

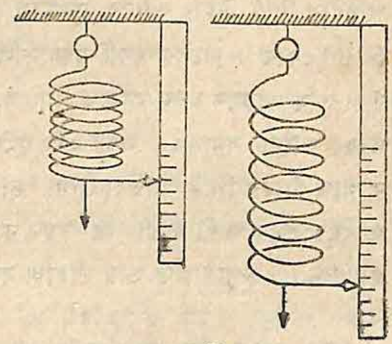
প্রশ্ন। পদার্থের বৈচিত্র্যের মধ্যে কি কি ঐক্য দেখা গিয়াছে? উহাদের নাম কি? ঐক্যের প্রকৃতি সংক্ষেপে বল।

I-4.3. ভর ও ভার (বা ওজন) (Mass and Weight)। পৃথিবী যে বলে কোন বস্তুকে টানে, সেই বলের সাহায্যে আমরা ভরের ধারণা আনিয়া থাকিলেও, সে আকর্ষণ কিন্তু ভর নয়। কোন বস্তুর উপর পৃথিবীর আকর্ষক বলকে আমরা ঐ বস্তুর 'ভার' বা 'ওজন' বলি। ভার ভরের উপর নির্ভর করে, কিন্তু ভার ও ভর আলাদা জাতীয় রাশি। ভার এক প্রকার বল, কিন্তু ভর বল নয়। **কোন বস্তুতে জাড্যের পরিমাণকেও আমরা বস্তুটির ভর বলি।**

একখানা বই হাতের তেলোর উপর রাখিলে হাতের মাংসপেশীতে যে টান অনুভব কর তাহা ঐ বইয়ের ভারের জন্য। মাটিতে রাখা একখানা ইট তুলিতে অনুরূপ পেশীর টান ইটের ভারের জন্য। বইখানা হয়ত ইটের তুলনায় অনেক হালকা, ইট ভারী। বইয়ের ভর কম, ইটের ভর বেশী বলিয়া উহাদের ভারে তফাত হইয়াছে। উহাদের ভর মাপিতে দাঁড়িপাল্লার সাহায্য নিতে হইবে। হয়ত দেখিবে বইয়ের ভর 0·25 কেজি (250 গ্রাম) এবং ইটের ভর 2.240 কেজি (2240 গ্রাম)। আকর্ষক বল মাপিতে হইলে বল মাপার কোন ব্যবস্থা করিতে হইবে। পেঁচান স্প্রিং-এর সাহায্যে বল মাপা যায়। স্প্রিং খাড়া রাখিয়া উহার উপরের প্রান্ত শক্ত করিয়া আঁটিয়া অন্য প্রান্তে টান দিলে স্প্রিং লম্বা হইবে। বেশী টানে উহা বেশী লম্বা হইবে। স্প্রিং কতটা লম্বা হইল তাহা দেখিয়া বল বেশী কি কম তাহা বোঝা যায়। বল মাপিবার এ রকম স্প্রিং বানান যায় (I-7 চিত্র)। নির্দিষ্ট স্থানে ভর তুলনা করিবার জন্য স্প্রিং-এর সঙ্গে স্কেল লাগাইয়া নেওয়া যায়। ইহাকে স্প্রিং তুলা (spring balance) বলে (I-8 চিত্র দেখ)।

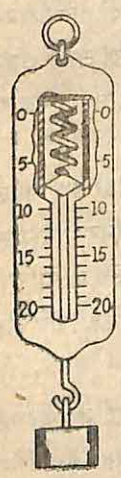
ভূপৃষ্ঠের বস্তুর উপর পৃথিবীর আকর্ষক বলকে আমরা উহার ভার বা ওজন বলিয়াছি। যদি একই বস্তুকে ভূপৃষ্ঠ হইতে অনেক উপরে নিয়া উহার ভার অর্থাৎ

পৃথিবীর আকর্ষক বল, ধর স্প্রিং-এর সাহায্যে দেখা হয়, তাহা হইলে দেখিব বল, অর্থাৎ বস্তুটির ওজন, ভূপৃষ্ঠে ওজনের চেয়ে কম। কিন্তু দাঁড়িপাল্লায় মাপিলে দেখিব ভূপৃষ্ঠে ভর মাপিতে অন্য পাল্লায় যে ভর বসাইতে হইয়াছিল, এখানেও তাহাই করিতে হইতেছে, অর্থাৎ ভর একই আছে। খনির গভীরতায় নিয়া গেলেও দেখিব ভর একই আছে, কিন্তু ভার কমিয়াছে।



I-7 চিত্র

বস্তুর ভার উহার ভরের সমানুপাতিক (অর্থাৎ একই জায়গায় ভর দ্বিগুণ করিলে ভারও দ্বিগুণ হইবে; ভরকে যতগুণ করিব ভারও ততগুণ হইবে)। কিন্তু ভার ভূকেন্দ্র হইতে বস্তুর দূরত্বের উপরেও নির্ভর করে। ভূপৃষ্ঠে আকর্ষক বল সব চেয়ে বেশী। ভূকেন্দ্র হইতে দূরত্ব ইহার চেয়ে বাড়িলে বা কমিলে ভার কমে। কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই ভরের পরিবর্তন হয় না। শুনিলে হয়ত আশ্চর্য হইবে যে নকল উপগ্রহে বস্তুর ভার একেবারেই থাকে না, কিন্তু ভর অপরিবর্তিত থাকে। ভূকেন্দ্রে কোন বস্তু নিয়া পরীক্ষা করা সম্ভব হইলে দেখা যাইত সেখানেও বস্তুর ভর ঠিক আছে, কিন্তু কোন ভার নাই। নকল উপগ্রহে বা ভূকেন্দ্রে বল মাপিবার স্প্রিং-এ যত ভরই ঝুলাও না কেন, স্প্রিং লম্বায় বাড়িবে না, কারণ ভর ভার হারাইয়াছে। ভারহীন অবস্থায় দাঁড়িপাল্লা ব্যবহার করিয়া ভরও তুলনা করা যায় না, একথাটিও মনে রাখিও। তবে ভর অন্যভাবে মাপা যায়, ইহার উপায় পরে জানিতে পারিবে (II-2.2 বিভাগ)।



I-8 চিত্র

ভূপৃষ্ঠেও ভারের কিছু পরিবর্তন দেখা যায়। বিষুব অঞ্চলে আকর্ষণ কম অর্থাৎ ভার কম, এবং মেরু অঞ্চলে বেশী। তফাত হয় প্রায় হাজার ভাগে পাঁচ ভাগ। বিষুব অঞ্চলে এক কেজি ভরের ভার মেরু অঞ্চলে বাড়িয়া প্রায় এক কেজি পাঁচ গ্রামের ভারের সমান হয়। কিন্তু এক কেজি ভর বিষুব অঞ্চলে যাহা মেরু অঞ্চলেও তাহাই। একাধিক কারণে নির্দিষ্ট ভরের উপর পৃথিবীর আকর্ষণের তফাত হয়।

পৃথিবীর নিজেরও ভর আছে; উহা প্রায় $5{\cdot}98 \times 10^{24}$ কেজি। ভরের মূল ধর্মই হইল অন্য ভরকে আকর্ষণ করা। আকর্ষণের মান আকর্ষক ও আকৃষ্ট ভরের ও উহাদের দূরত্বের বর্গের উপর নির্ভর করে। চাঁদের ভর পৃথিবীর ভরের তুলনায় প্রায়

81·5 গুণ কম। উহার ব্যাস পৃথিবীর ব্যাসের প্রায় চতুর্থাংশ (0·27)। এই কারণে চাঁদের পিঠে কোন বস্তুর উপর চাঁদের আকর্ষণ অর্থাৎ চাঁদের পিঠে কোন বস্তুর ভার পৃথিবীর পিঠে উহার ভারের তুলনায় প্রায় 6 গুণ কম। এখানে তুমি এক কুইন্টাল (100 কেজি) চালের একটি বস্তা তুলিতে পারিবে না। কিন্তু চাঁদের পিঠে হইলে উহা তুমি অক্লেশে বহন করিতে পারিবে, কারণ চাঁদে উহার ভার ভূপৃষ্ঠে প্রায় 16 কেজি ভরের ভারের সমান। অথচ এক কুইন্টাল দু'জায়গায়ই 100 কেজি ভর। খবরের কাগজে চাঁদের পিঠে অভিযাত্রীদের ছবি হয়ত দেখিয়াছ। তাঁহাদের পোশাক যেমন ভারী, তেমন ভারী ভারী যন্ত্র বহন করিয়া চাঁদের পিঠে তাঁহাদের চলাফেরা করিতে হইয়াছে। ভূপৃষ্ঠে অত ভার তাঁহারা বহন করিতে পারিতেন না।

প্রশ্ন। ভর ও ভারের প্রভেদ বুঝাইয়া বল। ভর আছে অথচ ভার নাই, এমন অবস্থা কোথায় হইতে পারে ?

I-4.4. ভরের নিত্যতা বা ভর-সংরক্ষণ (Conservation of mass)। কোন বস্তুতে যে কোন ভৌত পরিবর্তনই ঘটাও না কেন, তাহাতে উহার ভরের কোন পরিবর্তনই হইবে না। উহাকে ভাঙিয়া টুকরা কর, গুঁড়া কর বা তাপে গলাও, অসাবধানতায় উহার কোন অংশ হারাইয়া না গিয়া থাকিলে দেখিবে পরিবর্তনের আগে ও পরে ভর একই আছে। নির্দিষ্ট ভর জলে নির্দিষ্ট ভর চিনি গুলিয়া দ্রবণ ওজন করিলে দেখিবে উহার মোট ভর জল ও চিনির ভরের যোগফল। দ্রবণে চিনির বা জলের ভর বদলায় নাই।

খানিকটা লোহাচুর ও খানিকটা গন্ধক ওজন করিয়া জানা ভরের বদ্ধ পাত্রে উহাদের মিশাইয়া যথেষ্ট উষ্ণ করিলে লোহাচুর ও গন্ধকে কিছু রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিয়া নূতন একটি যৌগ সৃষ্ট হইবে, এবং কিছু লোহাচুর বা গন্ধক হয়ত উদ্বৃত্ত থাকিয়া যাইবে। এখন সবগুলি একসঙ্গে আবার ওজন করিলে দেখিবে রাসায়নিক বিক্রিয়ার আগে উহাদের যে ভর ছিল, বিক্রিয়ার পরও মোট ভর তাহাই আছে।

ভৌত বা রাসায়নিক বিক্রিয়ায় বস্তুর মোট ভরের কোন পরিবর্তন হয় না, এরকম অগণিত উদাহরণ আমাদের জানা আছে। মনে রাখিতে হইবে পরস্পর ক্রিয়াশীল বস্তুগুলির কোন অংশ অসাবধানতায় যেন হারাইয়া বা উবিয়া না যায়। এজন্য পরীক্ষাগুলি বদ্ধ পাত্রে করা দরকার। উপযুক্ত সতর্কতায় যতদূর সম্ভব সূক্ষ্মভাবেই আমরা ভৌত বা রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ভর পরিবর্তন মাপার চেষ্টা করিয়াছি, কোন ক্ষেত্রেই আমরা মোট ভরের কোন পরিবর্তন দেখিতে পাই নাই।

এই অভিজ্ঞতা হইতে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে 'ভরের সৃষ্টি বা বিনাশ নাই—ভর

নিত্য (বা সংরক্ষিত) রাশি'। এই সিদ্ধান্তকেই **ভরের নিত্যতার সূত্র** বা **ভর-সংরক্ষণ সূত্র** বলে।

প্রশ্ন। ভরের নিত্যতা বলিতে কি বুঝায় উদাহরণ দিয়া বল।

I-4.5. শক্তির নিত্যতা বা শক্তি-সংরক্ষণ (Conservation of energy)। ভর মাপা যত সহজ শক্তি মাপা মোটেই তেমন সহজ নয়। গতিশক্তি আমরা মাপিতে পারি ; স্থিতিশক্তির কেবল পরিবর্তন মাপা যায়। বৈদ্যুত শক্তিও আমরা অনেক ক্ষেত্রে মাপিতে পারি। যেখানে যে পরিবর্তন হয় সকলই শক্তির ক্রিয়ায়, ইহা আমরা আগেই বলিয়াছি। কিন্তু পরিবর্তন ঘটাইয়া শক্তি বিনষ্ট হয় না ; উহা অন্য প্রকার শক্তিরূপে থাকে।

কোন বস্তু মাটি হইতে উপরে তুলিলে উহা স্থিতিশক্তি পায়। ছাড়িয়া দিলে উহা মাটিতে পড়িতে গতিশক্তি লাভ করে। মাপনে দেখা যায় স্থিতিশক্তি হ্রাস গতিশক্তি বৃদ্ধির সমান। উপরের দিকে ঢিল ছুড়িলে উহাকে গতিশক্তি দেওয়া হইল। উপরে উঠিতে ঢিলের বেগ ক্রমশ কমিয়া ঢিল মুহূর্তেক স্থির থাকিয়া আবার নিচে পড়িতে থাকে। গতিশক্তি বেগের উপর নির্ভর করে। ঢিলের ওঠানামার পথের সকল জায়গায় উহার গতিশক্তি ও স্থিতিশক্তির যোগফল সমান থাকে। (গণিতের সাহায্যে ইহার প্রমাণ তোমরা পরে পাইবে।) এই দুই প্রকার শক্তির একটি অন্যটিতে পরিণত হয়, এবং একটি যতটা বাড়ে অন্যটি ঠিক ততটা কমে। এই প্রকার উদাহরণ হইতে দেখা যায় যান্ত্রিকশক্তি নিত্য বা সংরক্ষিত রাশি। ঢিলের যান্ত্রিকশক্তি যতক্ষণ যান্ত্রিক থাকে, ততক্ষণ উহার মান স্থির। ঢিল মাটিতে পড়ার পর যান্ত্রিকশক্তি খানিকটা শব্দশক্তিতে পরিণত হয়, খানিকটা ঢিলের ও মাটির আকার ও আয়তন বিকৃতি ঘটাইয়া শেষ পর্যন্ত তাপশক্তিতে পরিণত হয়।

বৈদ্যুত শক্তি বৈদ্যুত মোটর ঘুরিবার যান্ত্রিক শক্তিতে পরিণত হয়। উভয় শক্তিই যথেষ্ট সূক্ষ্মতায় মাপা যায়। মাপনে দেখা যায় নির্দিষ্ট পরিমাণ বৈদ্যুত শক্তি ব্যয়ে সব সময়ই নির্দিষ্ট পরিমাণ যান্ত্রিকশক্তি পাওয়া যায়। যান্ত্রিকশক্তি বা বৈদ্যুত শক্তিকে তাপ-শক্তিতেও পরিণত করা যায়। এখানেও উপযুক্ত অবস্থায় এবং সূক্ষ্ম মাপনে দেখা যায় নির্দিষ্ট পরিমাণ যান্ত্রিক বা বৈদ্যুত শক্তি ব্যয়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ তাপশক্তি পাওয়া যায়।

এই সকল অভিজ্ঞতা হইতে আমরা সিদ্ধান্ত করি 'শক্তির সৃষ্টি বা বিনাশ নাই— উহা নিত্য (বা সংরক্ষিত) রাশি'। এই সিদ্ধান্তকেই **শক্তির নিত্যতার সূত্র** বা **শক্তি-সংরক্ষণ সূত্র** বলে। শক্তির রূপান্তর হয় মাত্র এবং রূপান্তরে যে কোন প্রকারের নির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তি নির্দিষ্ট পরিমাণ অন্য শক্তিতে পরিণত হয়। সকল ক্ষেত্রে মাপিতে না পারিলেও শক্তির নিত্যতায় আমরা বিশ্বাস করি।

বর্তমান শতাব্দীতে আমরা নূতন একটি অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি। আমরা দেখিয়াছি উপযুক্ত পরিবেশে তীব্র ঘনীভূত শক্তি ভরে পরিবর্তিত হইতে পারে। আবার উপযুক্ত পরিবেশে ভরও শক্তিতে পরিণত হয়। অ্যাটম বোমায় বা হাইড্রোজেন বোমায় শেষোক্ত ক্রিয়া হয়। নির্দিষ্ট পরিমাণ ভরের বদলে নির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তি পাওয়া যায়। এই কারণে আমরা ভর ও শক্তিকে আলাদা আলাদা ভাবে সংরক্ষিত রাশি না বলিয়া ভর+শক্তিকে সংরক্ষিত রাশি বলি। ইহাতে বুঝায় মহাবিশ্বে ভর ও শক্তির যোগফল অপরিবর্তনীয় রাশি।

পদার্থ হইতে কিছু শক্তি আলোক, তাপ বা শব্দশক্তি রূপে বিকিরিত হইলেও উহার ভর কমে। কিন্তু এই কমা এত সামান্য যে সূক্ষ্মতম মাপনেও তাহা আমরা ধরিতে পারি না। ধরিতে পারি না বলিয়াই সাধারণ ব্যাপারে ভর ও শক্তিকে আমরা আলাদা আলাদা ভাবে সংরক্ষিত রাশিই বলি।

সাধারণ ব্যাপারে শক্তির ও ভরের নিত্যতা এবং সকল ব্যাপারে শক্তি+ভরের নিত্যতা বিজ্ঞানের ভিত্তি। আজ পর্যন্ত কোন অবস্থায় ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায় নাই।

প্রশ্ন। (১) শক্তির নিত্যতা বা শক্তি-সংরক্ষণ বলিতে কি বুঝায়? উত্তরে উদাহরণ দিবে। (২) আধুনিক বিজ্ঞান কি ভর ও শক্তিকে আলাদা আলাদা ভাবে সংরক্ষিত রাশি বলিয়া মনে করে? উত্তরের কারণ দেখাও।

I-4.6. শক্তির রূপান্তর (Transformation of energy)। শক্তির সৃষ্টি বা বিনাশ নাই, উহা রূপান্তরিত হয় মাত্র। এই উক্তির সমর্থনে উপরের I-4.5. উপবিভাগে আমরা কিছু কথা বলিয়াছি। এখানে রূপান্তর সম্বন্ধে আরও কিছু বলিব।

(১) গুলতি দিয়া একটি ঢিল ছুড়িলে। গুলতির টান করা রবারের স্থিতিশক্তি ঢিলকে গতিশক্তি দিল। এখানে রূপান্তর স্থিতিশক্তি→গতিশক্তি।

(২) স্যুইচ টিপিয়া বিজলী বাতিতে বিদ্যুৎপ্রবাহ যাইতে দিলে; প্রবাহের বৈদ্যুত-শক্তি বাতির তারে তাপে পরিণত হইল। উত্তপ্ত তার আলো বিকিরণ করিল। এখানে রূপান্তর বৈদ্যুতশক্তি→তাপশক্তি→আলোকশক্তি।

(৩) একটি পটকা ফাটাইলে। বিস্ফোরণে পটকার উপাদানের রাসায়নিক শক্তি মুক্ত হইয়া তাপ ও শব্দ উৎপন্ন করিল, পটকার ভিতরের কঠিন টুকরাগুলিতে গতিশক্তি দিল এবং আশপাশের বায়ুকে চাপিয়া উহাকে সাময়িক স্থিতিশক্তি ও গতিশক্তি দিল। এখানে রূপান্তর মোটামুটি রাসায়নিক শক্তি→তাপশক্তি+শব্দশক্তি+স্থিতিশক্তি+গতিশক্তি।

রূপান্তরের অন্যান্য বহু উদাহরণ দেওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে মনে রাখিও **(ক) শক্তি পদার্থ আশ্রয় করিয়াই থাকে** এবং **(খ) কোন প্রক্রিয়ায় মুক্ত হইয়া অন্য**

পদার্থে যাইবার সময় সাধারণত রূপান্তরিত হয়। আরও কয়েকটি উদাহরণ দেখ।

(৪) কয়লা জ্বালাইয়া উহার রাসায়নিক শক্তিকে তাপে রূপান্তরিত করিয়া আমরা রেলগাড়ির ইঞ্জিনে তাপশক্তিকে চাকা ঘুরিবার যান্ত্রিক শক্তিতে পরিণত করিয়া গাড়িকে গতিশক্তি দেই। ইঞ্জিনের হুইস্‌ল্ দিতে জলীয় বাষ্পের কিছু তাপ ও কিছু চাপশক্তি শব্দশক্তিতে পরিণত হয়।

(৫) মোটরগাড়িতে বা এরোপ্লেনে কয়লার বদলে পেট্রল জ্বালানির কাজ করে। প্রধানত কয়লা এবং জ্বালানি খনিজ তেল হইতেই আমরা আমাদের বেশীর ভাগ কলকারখানার যন্ত্র চালাইবার শক্তি পাই। বৈদ্যুতিক শক্তিও ইহা করে। কিন্তু বৈদ্যুতিক শক্তিও আসে কয়লা বা অন্য জ্বালানির রাসায়নিক শক্তি হইতে। এখন কোথাও কোথাও উহা পারমাণবিক শক্তি হইতে আসিতেছে। আমাদের দেশের কয়েক জায়গায়ও ইহা হইতেছে। রাসায়নিক শক্তির তুলনায় পারমাণবিক শক্তি লক্ষাধিক গুন তীব্র। ইহা পরে বুঝিবে।

(৬) আমরা যখন কথা বলি তখন দেহস্থ খাদ্যের জ্বলনের রাসায়নিক শক্তি ফুসফুস ও বাক্‌যন্ত্রের পেশীতে সংকোচন ঘটায়; ইহা স্থিতিশক্তিতে রূপান্তর। সংকুচিত পেশী ফুসফুস হইতে বায়ু ঠেলিয়া বাহির করিয়া দেয়; ইহা গতিশক্তিতে রূপান্তর। ইহাতে স্বরতন্ত্রী (vocal cords) কাঁপে ও শব্দ উৎপন্ন হয়। শব্দশক্তি ছড়াইয়া পড়িয়া বিভিন্ন পদার্থে শোষিত হইয়া সাধারণত তাপশক্তিতে পরিণত হয়। চলার সময় দেহস্থ রাসায়নিক শক্তি মাংসপেশীতে সংকোচন ঘটাইয়া পেশীকে স্থিতিশক্তি দেয়। পেশীর স্থিতিশক্তি রূপান্তরিত হইয়া পা ও হাত চালনা করিয়া উহাদের গতিশক্তি দেয়।

পৃথিবীতে শক্তির প্রধান উৎস সূর্য।

কয়লা বা খনিজ জ্বালানি উহার রাসায়নিক শক্তি পাইয়াছে সূর্য হইতে, কারণ কোটি কোটি বৎসর আগের গাছ এবং খুব ছোট অসংখ্য জীবদেহ মাটির নিচে চাপা পড়িয়া ক্রমশ চাপে ও তাপে কয়লায় ও খনিজ তেলে পরিবর্তিত হইয়াছে।

সূর্যের তাপে বিভিন্ন স্থান উষ্ণ হওয়ায় বায়ুস্রোত বহে, গাছের পাতা নড়ে, ঝড় হয়। সূর্যের তাপই সমুদ্র, নদ, নদী হইতে জলকে বাষ্প করিয়া মেঘের সৃষ্টি করে। মেঘ হইতে বৃষ্টি হয়। বৃষ্টির জলকণার গতিশক্তি আসে মেঘের স্থিতিশক্তি হইতে। এই স্থিতিশক্তি আসিয়াছে সূর্যের তাপ হইতে। পারমাণবিক শক্তি ও পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ তাপশক্তি ছাড়া পৃথিবীর আর সকল শক্তির মূল হইল সূর্য। প্রথমোক্ত শক্তি দুটি আমরা অল্প দিন হইল কাজে লাগাইতে শুরু করিয়াছি। এ জন্য আগে বলা হইত 'পৃথিবীর যাবতীয় শক্তির উৎস সূর্য।'

সূর্যে ভর শক্তিতে রূপান্তরিত হইয়া শক্তি যোগাইতেছে। এক সময় আসিবে যখন সূর্যের এই রূপান্তরের সামর্থ্য আর থাকিবে না। পৃথিবীতে তখন আর শক্তিস্রোত আসিবে না।

প্রশ্ন। (১) বিভিন্ন প্রকার শক্তির নাম কর এবং শক্তির রূপান্তরের পাঁচটি উদাহরণ দাও। (২) 'পৃথিবীর যাবতীয় শক্তির উৎস সূর্য'—এই কথাটি আলোচনা কর।

I-5. পদার্থের অবস্থার পরিবর্তন (Change of State)। পদার্থ কঠিন, তরল ও বায়বীয় বা গ্যাসীয় অবস্থায় থাকিতে পারে। কি অবস্থায় থাকিবে তাহা পদার্থের উষ্ণতা ও কিছুটা চাপের উপর নির্ভর করে। অধিকাংশ বিশুদ্ধ কোন কঠিন পদার্থের উষ্ণতা ক্রমশ বাড়াইতে থাকিলে উহা প্রথম তরলে ও পরে বায়বীয় (বাষ্পীয়) অবস্থায় পরিণত হইবে। আবার কোন গ্যাস বা বাষ্পকে ক্রমশ ঠাণ্ডা করিতে থাকিলে উহা প্রথমে তরলে, পরে কঠিনে পরিণত হইবে।

উদাহরণস্বরূপ বরফ লইয়া আমরা পরীক্ষা করিতে পারি। একটি পাত্রে বরফ নিয়া উহা উষ্ণ করিতে থাকিলে প্রথমে বরফ গলিয়া জল হইবে। জলকে উষ্ণ করিয়া চলিলে একটা বিশেষ উষ্ণতায় আসিয়া উহা ফুটিয়া বাষ্পে পরিণত হইবে। জলীয় বাষ্প চোখে দেখা যায় না। জল গরম করিবার ও ফুটাইবার সময় জলের উপর হইতে ধোঁয়ার মত যাহা বাহির হইতে দেখি তাহা বাষ্প নয়; উহা বাষ্প জমিয়া ক্ষুদ্র জলকণার সমষ্টি। একটু পরেই উহা মিলাইয়া গিয়া আবার বাষ্পে পরিণত হয়।

অতি সাধারণ এই উদাহরণটি হইতে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করা যায়:

১। **গলন** (Melting)। বরফ গলিয়া জলে পরিণত হইতেছে ইহা পরিষ্কার দেখিতে পাইবে। একটা নির্দিষ্ট উষ্ণতায় (0°C) বরফ গলে। গলিবার সময় বরফের উষ্ণতা স্থির থাকে।

কঠিন অবস্থা হইতে তাপ প্রয়োগে তরল হওয়াকেই আমরা 'গলন' বলি। গলনে বস্তুর আয়তন একটু বাড়ে বা কমে। ন্যাপথালিন গলিলে উহার আয়তন বাড়ে। বরফ গলিলে উহার আয়তন কমে। আয়তন পরিবর্তন কোন ক্ষেত্রেই বেশী নয়। বরফ গলিলে উহার আয়তন প্রায় 1/12 অংশ কমে।

২। **হিমন (Freezing)।** জলকে জমাইয়া বরফে পরিণত করা যায়। ইহার জন্য জলের উষ্ণতা কমাইয়া একটি বিশেষ উষ্ণতার নিচে আনিতে হইবে। এই উষ্ণতা আর বরফের গলনের উষ্ণতা একই। চার ভাগ বরফে এক ভাগ নুন মিশাইলে উহা খুব ঠাণ্ডা হয়। একটা ছোট শিশিতে খানিকটা জল নিয়া ছিপি বন্ধ করিয়া নুন মিশান বরফে ঢাকিয়া উহা ক্রমশ ঠাণ্ডা হইতে দিলে দেখা যাইবে শিশির জল

একসময়ে বরফ হইয়া গিয়াছে। শিশিটি যদি কেবল বরফে ঢাকিয়া রাখ তাহা হইলে কিন্তু জল জমিবে না। ইহার কারণ I-5.4 বিভাগে বলা হইয়াছে। শৈত্যে তরল জমিয়া কঠিনে পরিণত হওয়াকেই 'হিমন' বলা হয়।

৩। **স্ফুটন (Boiling)**। একটি পাত্রে জল নিয়া উনানে বসাইয়া রাখিলে উহা ক্রমশ গরম হয়। ক্রমে দেখা যায় পাত্রের ভিতরের গায়ে বিন্দু বিন্দু আকারে বায়ু জমিতেছে। জলে গুলিয়া থাকা বায়ু উষ্ণতা বৃদ্ধিতে বাহির হইয়া আসিয়াছে। ক্রমে বিন্দুগুলি জল হইতে বাহির হইয়া যায়। জলের উপর হইতে একটু ধোঁয়া উঠিতে দেখা যায়। এই ধোঁয়া জলের উপর হইতে ওঠা জলীয় বাষ্প জমা ছোট ছোট জলকণা। উহারা বায়ুতে জলীয় বাষ্প হইয়া মিলাইয়া যায়। ক্রমে দেখিবে জলের তলের দিক হইতে ছোট ছোট বুদ্বুদ বাহির হইয়া জলের ভিতরে খানিকটা উঠিয়া মিলাইয়া যাইতেছে ও চুরচুর শব্দ হইতেছে। এগুলি জলীয় বাষ্পের বুদ্বুদ এবং ইহাদের সৃষ্টি জল ফোটার সূচনা। কিছু পরেই জলের সর্বাঙ্গ হইতে এই রকম বাষ্প উঠিতে থাকিবে। ইহাই স্ফুটন। একটা নির্দিষ্ট উষ্ণতায় তরলের সর্বাঙ্গ হইতে তরলের বাষ্পীয় অবস্থায় পরিণত হওয়াকে স্ফুটন বলে। স্ফুটনের সময় তরলের উষ্ণতা বদলায় না।

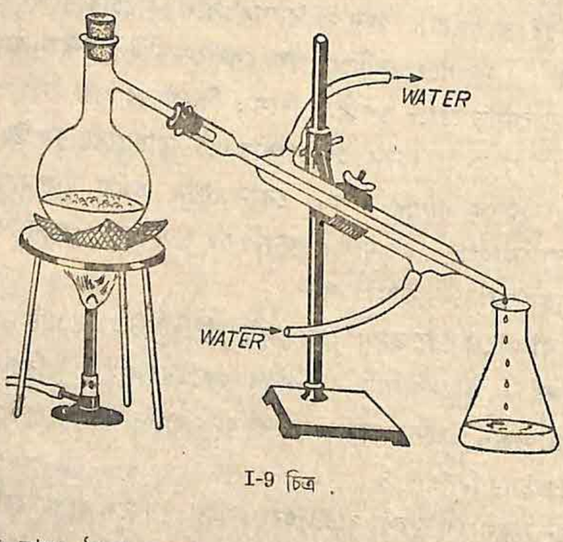
৪। **বাষ্পন (Evaporation)**। স্ফুটন ছাড়াও তরল অন্য একটি প্রক্রিয়ায় বাষ্পে পরিণত হইতে পারে। ইহাকে 'বাষ্পন' বলে। টেবিলে বা মেজেতে একটু জল পড়িয়াছিল। কিছু পরে দেখিলে জল সেখানে নাই; উবিয়া বাতাসে মিশিয়া গিয়াছে। ভিজা কাপড় রোদে শুকাইতে দিলে; কিছুক্ষণের মধ্যে উহা শুকাইয়া গেল। এগুলি বাষ্পনের উদাহরণ। স্ফুটন যে উষ্ণতায় ঘটে তার চেয়ে কম উষ্ণতায় তরলের বাষ্পে পরিণত হওয়াকে বাষ্পন বলে। কোন কোন তরলে বাষ্পন খুব দ্রুত হয়—যেমন স্পিরিট বা কোহল। কোনটিতে আবার সহজে হয় না—যেমন তেল। যে তরল সহজে বাষ্পিত হয় তাহাকে 'উদ্বায়ী' বলে।

স্ফুটন ও বাষ্পনে প্রভেদ। (ক) স্ফুটন নির্দিষ্ট উষ্ণতায় ঘটে। বিভিন্ন তরলে এই উষ্ণতা বিভিন্ন। স্ফুটনের জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আলাদা করিয়া তাপ প্রয়োগ করিতে হয় এবং স্ফুটনে তরলের সর্বাঙ্গ হইতে বাষ্প বাহির হয়। স্ফুটনের হার তাপ প্রয়োগের হারের উপর নির্ভর করে।

(খ) বাষ্পন সকল উষ্ণতায়ই ঘটে, এবং উষ্ণতা বাড়িলে বাষ্পন বেশী তাড়াতাড়ি হয়। একই উষ্ণতায় বিভিন্ন তরলের বাষ্পনের হার বিভিন্ন। বাষ্পনেও তাপের দরকার হয়; কিন্তু ইহা সাধারণত আলাদা করিয়া দেওয়া হয় না। তরল নিজেই তাহার আশপাশ হইতে তাপ সংগ্রহ করিয়া বাষ্পে পরিণত হয়। বাষ্পনে তরল কেবলমাত্র উপরের তল হইতে বাষ্পে পরিণত হয়, সর্বাঙ্গ হইতে নয়। অতএব তরল

যত ছড়াইয়া থাকে উহার বাষ্পন তত তাড়াতাড়ি হয়। একই পরিমাণ জল একটি গেলাস হইতে উবিয়া যাইতে যে সময় নিবে, একখানা থালায় ছড়াইয়া দিলে উবিবে অনেক তাড়াতাড়ি। তাছাড়া তরলের উপরেই ঐ তরলের বাষ্প বেশী মাত্রায় থাকিলে বাষ্পন আস্তে আস্তে হয়। ইহার উদাহরণ বর্ষার দিনে ভিজা কাপড় শুকান। বর্ষার দিনে বায়ুতে প্রচুর জলীয় বাষ্প থাকে বলিয়াই কাপড় শুকাইতে চায় না।

৫। **তরলন (Condensation)**। ইহা স্ফুটন ও বাষ্পনের বিপরীত প্রক্রিয়া। ঠাণ্ডায় বাষ্প জমিয়া তরলের পরিণত হওয়াকেই 'তরলন' বলে। শীত-কালের কাছাকাছি ভোরবেলা গাছের পাতায় যে শিশির দেখিতে পাও, তাহা বায়ুর জলীয় বাষ্প জমা জলকণা। রসায়নে পাতন (distillation) প্রক্রিয়া তরলনের খুব সুন্দর উদাহরণ। এক পাত্রে তরল ফুটাইতেছ। উহার সব দিক বন্ধ, কেবল মুখের ছিপির ভিতর দিয়া একটি লম্বা নলের এক প্রান্ত পাত্রের একটু ভিতরে ঢুকান। নলের অন্য প্রান্ত একটি ঠাণ্ডা পাত্রে শেষ হইয়াছে। কোন কোন গঠনের পাতন যন্ত্রে নলের বাহিরে জল স্রোত বহাইয়া নল ঠাণ্ডা করা হয় (I-9 চিত্র)। দেখিবে



I-9 চিত্র

ফুটন্ত তরলের বাষ্প ঠাণ্ডা হওয়ায় তরল হইয়া অন্য পাত্রে জমিতেছে। ফুটন্ত জলের কেতলির মুখের কাছে বাটি ধরিলে এই বাটিতেও জল জমিতে দেখিবে। কেতলিতে জল বাষ্প হইয়াছে। সেই বাষ্প বাটিতে ঠাণ্ডায় আবার জলে পরিণত হইয়াছে। কুয়াশা ও মেঘ, খুব ছোট ছোট জলকণার সমষ্টি। বায়ুর জলীয় বাষ্প ঠাণ্ডায় জমিয়া

কুয়াশায় বা মেঘে পরিণত হইয়াছে। তরলনের জন্য বাষ্পের উষ্ণতা স্ফুটনাঙ্কের চেয়ে কম হওয়া দরকার। উষ্ণতা বেশী থাকিলে তরলন হইবে না।

প্রশ্ন। (১) গলন, স্ফুটন ও বাষ্পন কি ভাবে হয় বর্ণনা কর। ইহাদের বিপরীত প্রক্রিয়াগুলি কি ? (২) স্ফুটন ও বাষ্পনে প্রভেদ বুঝাইয়া বল।

I-5.1. গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক (Melting point and Boiling point)। যে সকল বিশুদ্ধ মৌল বা যৌগ তাপ প্রয়োগে গলে তাহাদের গলন একটা নির্দিষ্ট উষ্ণতায় হয়। ঐ উষ্ণতাকে ঐ পদার্থের 'গলনাঙ্ক' (Melting point) বলে। ইহারা যখন তরল হইতে কঠিনে পরিণত হয়, তখনও হিমন একটি নির্দিষ্ট উষ্ণতায় ঘটে। এই উষ্ণতাকে তরলের 'হিমাঙ্ক' (Freezing point) বলে। কেলাসিত (Crystalline) বিশুদ্ধ মৌল বা যৌগের গলনাঙ্ক ও হিমাঙ্ক একই। বিশুদ্ধ না হইলে দুই-এ তফাত হয়। অকেলাসিত পদার্থের (যেমন মাখন, চর্বি, মোম, কাচ, ইত্যাদির) স্থির গলনাঙ্ক নাই। ইহাদের কোন কোনটির গলন ও হিমন বিভিন্ন উষ্ণতায় হয়। মাখন 28°C হইতে 33°C-র মধ্যে গলে কিন্তু জমে 20°C হইতে 22°C-র মধ্যে। মিশ্রণেরও কোন স্থির গলনাঙ্ক বা হিমাঙ্ক থাকে না।

বিশুদ্ধ তরলে যখন স্ফুটন হয় তাহাও এক নির্দিষ্ট উষ্ণতায় ঘটে। ইহাকে স্ফুটনাঙ্ক (Boiling point) বলে। অবিশুদ্ধ তরলের স্থির স্ফুটনাঙ্ক থাকে না।

গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক উভয়েই পরীক্ষণীয় কঠিন বা তরলের উপরস্থ চাপের (সাধারণত বায়ুমণ্ডলের চাপের) উপর নির্ভর করে। চাপ পরিবর্তনে গলনাঙ্কের চেয়ে স্ফুটনাঙ্কের পরিবর্তন হয় অনেক বেশী। এজন্য গলনাঙ্ক বা স্ফুটনাঙ্ক উল্লেখ করিতে উহা কত চাপে পাওয়া গিয়াছে তাহা বলা দরকার—বিশেষ করিয়া তরলের ক্ষেত্রে। এই গোলমাল এড়াইবার জন্য এক প্রমাণ বায়ুমণ্ডলের যে চাপ (One standard atmospheric pressure) সেই চাপে গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক বাহির করা হয়, এবং এই মানকে 'প্রমাণ' (normal) গলনাঙ্ক বা 'প্রমাণ' স্ফুটনাঙ্ক বলা হয়। তবে সন্দেহের অবকাশ না থাকিলে 'প্রমাণ' কথাটির প্রায়ই উল্লেখ করা হয় না। উল্লেখ না থাকিলে উহা সাধারণত 'প্রমাণ' বলিয়া মনে করা হয়। 'প্রমাণ' উল্লেখ করাই ভাল।

কোন কোন পদার্থ, যেমন আয়োডিন (Iodine), নিশাদল (NH_4Cl) প্রভৃতি, উষ্ণ করিলে তরল না হইয়া সোজাসুজি গ্যাসীয় অবস্থায় চলিয়া যায়। ইহাদের 'প্রমাণ' গলনাঙ্ক নাই।

নিচের সারণিতে কয়েকটি পদার্থের প্রমাণ গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক সেলসিয়াস ডিগ্রীতে (°C) দেওয়া হইল।

গলনাঙ্ক (°C)			স্ফুটনাঙ্ক (°C)		
প্ল্যাটিনাম	–	1769°	গন্ধক	–	444·6°
তামা	–	1083°	পারা	–	357°
সোনা	–	1063°	গ্লিসারিন	–	290°
রূপা	–	960·8°	জল	–	100°
দস্তা	–	419·5°	কোহল	–	78°
সীসা	–	327·3°	ক্লোরোফর্ম	–	61°
টিন	–	231·9°	ইথার	–	35°
গন্ধক	–	119°	অক্সিজেন	–	–183°
ন্যাপথালিন	–	80·2°	হাইড্রোজেন	–	–253°
পারা	–	–39°	হিলিয়াম	–	–269°

প্রশ্ন। গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক কাহাকে বলে? কি রকম ক্ষেত্রে পদার্থের গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক স্থির থাকে না, বা একেবারেই থাকে না উদাহরণের সাহায্যে বল।

I-5.2. **গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক যে সকল বিষয়ের উপর নির্ভর করে।** **(ক) চাপ।** বিশুদ্ধ পদার্থে গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক চাপের উপর নির্ভর করে তাহা আগেই বলিয়াছি। **বরফের মত যে সকল পদার্থ গলিলে আয়তনে কমে, তাহাদের উপর চাপ বাড়াইলে তাহারা আরও সহজে গলে, অর্থাৎ গলনাঙ্ক আরও কম হয়,** যদিও কমার পরিমাণ খুব সামান্য। বরফের উপর চাপ এক বায়ুমণ্ডল না হইয়া প্রায় 133 বায়ুমণ্ডল হইলে বরফ -1°C উষ্ণতায় গলিবে। ইহার অর্থ এই বর্ধিত চাপে বরফ ও জল -1°C-তে একসঙ্গে থাকিতে পারিবে; জল জমিবে না।

ন্যাপথালিন বা মোমের মত যে সকল পদার্থ গলিলে আয়তনে বাড়ে, তাহাদের ক্ষেত্রে ক্রিয়া বরফের বিপরীত। চাপ বাড়াইলে তাহারা আরও বেশী উষ্ণতায় গলিবে, অর্থাৎ বেশী চাপে গলাইতে ইহাদের আরও বেশী উষ্ণ করিতে হইবে।

স্ফুটনাঙ্কের ক্ষেত্রে চাপের ক্রিয়া অনেক বেশী। **সব তরলের ক্ষেত্রেই চাপ বাড়াইলে স্ফুটনাঙ্ক উপরে উঠে, অর্থাৎ তরল আরও বেশী উষ্ণতায়**

ফোটে। জল এক বায়ুমণ্ডল চাপে 100°C-তে ফোটে। জলের উপর চাপ মোট দুই বায়ুমণ্ডল হইলে জল প্রায় 120°C উষ্ণতায় ফুটিবে। তোমাদের অনেকের বাড়িতে রান্নার জন্য হয়ত 'প্রেসার কুকার' ব্যবহার হয়। প্রথমে কুকারের জল ফুটিয়া বাষ্প বাহির হইলে বাহির হইবার মুখে একটি ভার চাপা দেওয়া হয়। ইহাতে বাষ্পের চাপ আরও না বাড়িলে উহা ভার ঠেলিয়া বাহির হইতে পারে না। বাষ্পের চাপ এই ভাবে হয়ত দুই বায়ুমণ্ডলের মত হয়; এবং জল 100°C-র বদলে 115°—120°C-তে ফোটে। উষ্ণতা বেশী থাকায় সব জিনিস সিদ্ধ হইতে সময় কম লাগে। বাষ্পীয় ইঞ্জিনের বয়লারে জল বেশী চাপে ফুটান হয়। ইহাতে নির্গত বাষ্পের চাপও বেশী হয়।

পাহাড়ের উপরে বায়ুর চাপ কম; সেখানে জলও কম উষ্ণতায় ফোটে। মোটামুটি প্রতি হাজার ফুট উচ্চতায় জলের স্ফুটনাঙ্ক 1°C করিয়া কম হয়। এভারেস্ট শৃঙ্গে জল 70°C-তে ফুটিবে।

(খ) অপবস্তু (Impurity)। পদার্থ বিশুদ্ধ না হইয়া উহাতে অপবস্তু থাকিলে গলনাঙ্ক বদলায়—সাধারণত কমে; কমার পরিমাণ অপবস্তুর প্রকৃতি ও পরিমাণের উপর নির্ভর করে। অপবস্তু কম থাকিলে গলনাঙ্কের পরিবর্তনও সামান্য হয়। এই কারণে গলনাঙ্ক মাপিয়া পদার্থের বিশুদ্ধতা যাচাই করা যায়।

তরলে অপবস্তু দ্রাবিত থাকিলে উহার স্ফুটনাঙ্ক বাড়ে। বাড়ার পরিমাণ অপবস্তুর আপেক্ষিক পরিমাণের উপর নির্ভর করে। অপবস্তু বেশী থাকিলে স্ফুটনাঙ্ক বেশী বাড়ে, কম থাকিলে কম বাড়ে। এই কারণে স্ফুটনাঙ্ক মাপিয়া তরলের বিশুদ্ধতা বোঝা যায়।

প্রশ্ন। কি কি কারণে গলনাঙ্ক বা স্ফুটনাঙ্কের পরিবর্তন হইতে পারে? 'প্রমাণ' স্ফুটনাঙ্ক কাহাকে বলে? 'প্রমাণ' কথাটি বলিবার দরকার কি?

পাহাড়ের উপরে ও ইঞ্জিনের বয়লারে জলের স্ফুটনাঙ্ক উহার প্রমাণ স্ফুটনাঙ্কের চেয়ে বেশী না কম।

I-5.3. লীন তাপ (Latent heat)। কোন পদার্থে তাপ যোগ করিয়া যাইতে থাকিলে উহার উষ্ণতা ক্রমশ বাড়িতে থাকে। পদার্থটি কঠিন অবস্থায় থাকিলে গলনাঙ্কে পৌঁছিয়া উহা গলিতে থাকে এবং তাপ পাইয়া চলিলেও গলন শেষ না হওয়া পর্যন্ত উহার উষ্ণতা বদলায় না। পদার্থটি তরল অবস্থায় থাকিলে স্ফুটনাঙ্কে পৌঁছিয়া উহা বাষ্পে পরিণত হইতে থাকে, এবং তাপ পাওয়া সত্ত্বেও স্ফুটনের সময় তরলের উষ্ণতা বদলায় না। গলনাঙ্কে পৌঁছিয়া আরও তাপ না পাইলে কঠিনের গলন হয় না, এবং স্ফুটনাঙ্কে পৌঁছিয়া আরও তাপ না পাইলে তরলেও স্ফুটন হয় না।

ইহা দেখিয়া আমরা প্রশ্ন করিতে পারি তাপে উষ্ণতা বাড়ে, কিন্তু গলন বা স্ফুটনের সময় তাপ পাওয়া সত্ত্বেও উষ্ণতা বাড়ে না কেন? তখন যে তাপ দেওয়া হইল তাহা

কোথায় গেল—কি শক্তিতে রূপান্তরিত হইল ? এই 'কোথায় যাওয়া' তাপের নামই 'লীন তাপ'। সংজ্ঞা হিসাবে বলা যায় **একক ভরের কঠিন পদার্থকে উষ্ণতা পরিবর্তন না করিয়া সম্পূর্ণরূপে তরলে পরিণত করিতে যে পরিমাণ তাপের দরকার হয়, তাহাকে ঐ পদার্থের গলনের লীন তাপ (Latent heat of fusion) বলে।** বাষ্পনের ক্ষেত্রে অনুরূপে বলা হয় **একক ভর তরলকে উষ্ণতা পরিবর্তন না করিয়া সম্পূর্ণরূপে বাষ্পে পরিণত করিতে যে তাপ দরকার তাহা ঐ তরলের বাষ্পনের লীন তাপ** (Latent heat of evaporation)।

বাষ্প যখন ঘনীভূত হইয়া তরলে পরিণত হয় তখন বাষ্পিত হইতে উহা যে লীন তাপ নিয়াছিল তাহা ছাড়িয়া দেয়। একক ভর বাষ্প যখন উষ্ণতা না বদলাইয়া সম্পূর্ণরূপে তরলে পরিণত হয়, তখন উহা যে পরিমাণ তাপ ছাড়িয়া দেয় তাহাকে 'তরলনের লীন তাপ' (Latent heat of condensation) বলে। ইহা ঐ একই উষ্ণতা তরলের বাষ্পনের লীন তাপের সমান। তরল কঠিন হইতে গিয়া একই কারণে তাপ ছাড়ে। এই তাপ বাহির করিয়া দিতে না পারিলে হিমাঙ্কে থাকিলেও তরল জমিবে না। জল নিয়া এই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পার। ছোট একটি শিশিতে একটু জল নিয়া ছিপি বন্ধ করিয়া বরফ দিয়া শিশি ঢাকিয়া রাখ। জল জমিবে না। উহার হিমনের লীন তাপ (Latent heat of freezing) বাহির করিয়া নিতে উহাকে আর একটু ঠাণ্ডা করা দরকার। (এ তাপও গলনের লীন তাপের সমান।) এ জন্য চার ভাগ বরফ ও এক ভাগ নুনের মিশ্রণ নাও। ইহা বরফের চেয়েও ঠাণ্ডা। ইহাতে বসাইলে শিশির জল হইতে তাপশক্তি বাহির হইয়া যাইতে পারিবে ও জল জমিবে।

একটু ফুটন্ত জল গায়ে পড়িলে যে জ্বালা হয়, সমান ওজনের ও উষ্ণতার জলীয় বাষ্প গায় লাগিতে দিলে জ্বালা হইবে তাহার চেয়ে অনেক বেশী। বাষ্প প্রথমে জমিয়া জল হইতে তাহার লীন তাপ ছাড়িবে। জমা জল ঠাণ্ডা হইবার তাপের তুলনায় লীন তাপ কয়েকগুণ বেশী ; তাই জ্বালাও বেশী। জলের গলনের চেয়ে স্ফুটনের লীন তাপ অনেক বেশী।

বরফ নিজ গলনাঙ্কে (0°C-তে) থাকিয়া তাপ না দেওয়া সত্ত্বেও গলে বলিয়া তোমার মনে হইতে পারে। কিন্তু বরফের আশপাশের সব বস্তুর বরফের চেয়ে গরম বলিয়া বরফ তাহাদের কাছ হইতে পরিবহণ ও বিকিরণে তাপ পায় ; তাই গলিতে পারে। থার্মফ্লাস্কে বরফ অনেক বেশীক্ষণ বরফ অবস্থায়ই থাকিতে পারে কারণ উহাতে পরিবহণ ও বিকিরণে তাপ প্রবেশ খুব কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

প্রশ্ন। (১) লীন তাপ কাহাকে বলে ? (২) একটি ছোট শিশিতে জল নিয়া উহাকে সম্পূর্ণভাবে বরফে ঢাকিয়া রাখিলে জল জমিবে কি না, কারণ দেখাইয়া বল।

দ্বিতীয় অংশ

পদার্থ-বিদ্যা

II-1. বলবিজ্ঞানের গোড়ার কথা: স্থিতি ও গতি (Rest and Motion)।

সম্ভবত গতিই মানুষের বিজ্ঞানের প্রথম প্রেরণা জাগায়। আকাশে সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, তারার গতির প্রকৃতি জানিতে ও বুঝিতে চাওয়ার ফলে জ্যোতির্বিদ্যার (Astronomy-র) সৃষ্টি হয়। অল্প কায়িক পরিশ্রমে বেশী ফল পাইতে এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রার নানা প্রয়োজনে মানুষ যন্ত্র বানাইতে শেখে ; ক্রমে যন্ত্রবিষয়ক মূলতত্ত্বগুলিও জানিতে পারে। এই সকল জানিতে ও বুঝিতে বহু শতাব্দী অতীত হইয়াছিল। তীক্ষ্ণ মেধাসম্পন্ন মনীষীরা এই সকল তত্ত্বকে সরল ভাষায় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। আমরা এখানে II-1 হইতে II-3 বিভাগ পর্যন্ত ও উহাদের উপবিভাগে 'গতি' (motion), গতির কারণ স্বরূপ 'বল' (force), বলের ক্রিয়া ও সরল তিনটি যন্ত্র সম্বন্ধে একেবারে গোড়ার কয়েকটি কথা বলিব।

পদার্থবিজ্ঞানের প্রথম কাজ হইল কোন প্রাকৃতিক ঘটনার সঠিক বর্ণনা দেওয়া। ইহার জন্য কোন কোন শব্দ বিশেষ অর্থে ব্যবহার করিতে হয়। গতির বর্ণনায়ও আমাদের এরূপ কয়েকটি শব্দ ব্যবহার করিতে হইবে। আমরা প্রথমে এরূপ কয়েকটি শব্দ ও তাহাদের অর্থ স্পষ্ট বুঝিতে চেষ্টা করিব।

১। বস্তু (Body)। ছোট বা বড় যে কোন পদার্থখণ্ডকেই আমরা 'বস্তু' বলিব। একটুকরা পাথর, একখানা বই, একখণ্ড ইট, ইত্যাদি সবই 'বস্তু'।

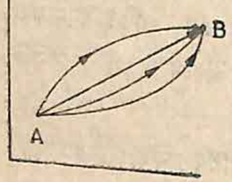
২। কণা (Particle)। কণা বলিতে সাধারণ ভাষায় আমরা পদার্থের খুব ছোট একটি খণ্ড বা অংশ বুঝি, যেমন ধূলিকণা, জলকণা ইত্যাদি। গতিবিষয়ক বিজ্ঞানে কণা কথাটির একটু অন্য রকম অর্থ আছে। 'কণা' পদার্থের অতি ক্ষুদ্র এক অংশ ; উহার ভর আছে, কিন্তু উহার আয়তন উপেক্ষা করিয়া একটি জ্যামিতিক বিন্দু দিয়াই উহার অবস্থান আমরা বুঝাই। বিভিন্ন দূরত্বে অবস্থিত ছোট বা বড় বস্তুর আকারে (অর্থাৎ দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বেধের) তুলনায় উহাদের দূরত্ব যদি অনেক বেশী হয়, তাহা হইলেও ঐ বস্তু যত বড়ই হউক না কেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা উহাকে কণা বলিয়াই ধরি। সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর গতি আলোচনায় সূর্য ও পৃথিবীকে উপরোক্ত বিশেষ অর্থে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কণা বলিয়া ধরা যায়।

৩। **স্থিতি (Rest) ও গতি (Motion)**। কোন বস্তু তাহার আশপাশের অন্যান্য বস্তু সাপেক্ষে স্থির থাকিলে আমরা বলি উহা 'স্থিতি'তে আছে। পরিপার্শ্ব সাপেক্ষে উহা চলিতে থাকিলে বলি উহার 'গতি' আছে।

চলন্ত রেলগাড়ির মধ্যে একজন যাত্রী গাড়ির মেঝেয় বা উপরে রাখা বাক্সটিকে স্থির মনে করিবেন। বাক্স তাহার পরিপার্শ্ব সাপেক্ষে স্থির আছে। কিন্তু গাড়ির বাহিরে মাটিতে দাঁড়ান দর্শক বাক্সটিকে সচল মনে করিবেন। অতএব স্থিতি ও গতি কথা দুইটি আপেক্ষিক (relative)। একজনের দৃষ্টিতে যাহা স্থির, অন্যের দৃষ্টিতে তাহা সচল হইতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিপার্শ্ব বলিতে আমরা ভূপৃষ্ঠই বুঝি। ভূপৃষ্ঠ সাপেক্ষে বাক্সটির গতি আছে। গাছপালা, বাড়িঘর ভূপৃষ্ঠ সাপেক্ষে স্থির, কিন্তু অন্য গ্রহ হইতে তাহাদের সচল মনে হইবে, কারণ পৃথিবীর সঙ্গে তাহারা চলিতেছে। কোন বস্তুই গ্রহ, নক্ষত্র, নীহারিকা, ইত্যাদি সব কিছু সাপেক্ষে স্থির হইতে পারে না।

দুইটি বস্তুর মধ্যে দূরত্ব সময়ের সঙ্গে বদলাইতে থাকিলে সুবিধার জন্য উহাদের যে কোনটিকে স্থির ও অপরটিকে সচল ধরা যায়। গতিও আপেক্ষিক—ইহা সকল সময়েই এক বস্তু সাপেক্ষে অন্য বস্তুর স্থান পরিবর্তন।

৪। **সরণ (Displacement)**। কোন কণা এক অবস্থান হইতে অন্য অবস্থানে গেলে উহার প্রথম অবস্থান বিন্দু হইতে দ্বিতীয় অবস্থান বিন্দু পর্যন্ত সরল রৈখিক দূরত্বকে কণার **সরণ** বলে ; সরণ বুঝাইতে সরণের মান ছাড়া দিক্‌ও বলিতে হয়। সরিবার সময় কণা কোন্ পথে আদি অবস্থান A (II.1 চিত্র) হইতে শেষ অবস্থান B-তে গিয়াছে তাহার উপর সরণ নির্ভর করে না। A হইতে B অবধি টানা সরল রেখাটি সরণ নির্দেশ করে। সরণ আদি ও শেষ অবস্থানের দূরত্ব ও গতির দিক্ বুঝায়।



II-1 চিত্র

৫। **বেগ (Velocity) ও দ্রুতি (Speed)**। সময়ের সহিত সরণ পরিবর্তনের হারকে **বেগ** বলে। দুই সেকেণ্ডে পূবদিকে সরণ এক মিটার হইয়া থাকিলে বেগ পূবদিকে 1 মিটার÷2 সেকেণ্ড=প্রতি সেকেণ্ডে 50 সেমি ; ইহাকে 0·5 মি/সে রূপেও লেখা যায়। (মিটারের সংক্ষিপ্তরূপ 'মি' ও সেকেণ্ডের 'সে'।) বেগ কথাটিতে কেবল স্থান পরিবর্তনের হার বুঝায় না, উহাতে সরণের দিক্‌ও বুঝায়। বেগের মান ও দিক্‌ও উভয়ই আছে।

বস্তু বা কণা সরলরেখায় না চলিয়া বক্ররেখায় চলিলে গতির সময় উহার দিক্ পরিবর্তন হইতে থাকে। এক্ষেত্রে দিকের কথা না আনিয়া আমরা কেবল কি হারে

বস্তু বা কণাটি চলিতেছে (দূরত্ব অতিক্রম করিতেছে) তাহাই বলিতে পারি। সময়ের সহিত কোন বস্তু বা কণার দূরত্ব অতিক্রম করার হারকে **দ্রুতি** বলে। দ্রুতিতে দিকের কোন উল্লেখ থাকে না। গোল মাঠে সাইকেল রেস্ হইতে থাকিলে বলিতে পার যে প্রথম হইয়াছে তাহার দ্রুতি ছিল ঘন্টায় দশ মাইল বা ষোল কিলোমিটার। গতি সরলরেখায় হইলে সে ক্ষেত্রে বেগ কথাটির প্রয়োগ সহজ হয়, কারণ দিক্ ঠিক আছে। বেগের দিক্ না বলিয়া কেবল মান বলিলে উহা দ্রুতি। বেগ ও দ্রুতিতে উপরোক্ত প্রভেদ আছে বলিলেও বেগ সর্বদা গতির অভিমুখে এ কথা মনে রাখিলে উহার প্রয়োগে কোন অসুবিধা হয় না।

কোন বস্তু বা কণা সমান সময়ে (তা সে সময় যতই কম হউক না কেন) সমান দূরত্ব অতিক্রম করিলে উহার বেগকে 'সুষম' (uniform) বলা হয়। অন্যথায় বেগ 'অসম' (non-uniform)। সুষম বেগে সরণ বেগ ও সময়ের গুণফলের সমান (সরণ = সুষম বেগ × গতি কাল। চলার পথে বেগ অসম হইলে পথের মোট দৈর্ঘ্যকে মোট সময় দিয়া ভাগ করিয়া আমরা 'গড় বেগ' (Mean বা average velocity) পাই।

৬। **ত্বরণ (Acceleration)**। সময়ের সহিত বেগ বৃদ্ধির হারকে **ত্বরণ** বলে। বেগের মান ও দিক্ উভয়ই আছে বলিয়া ত্বরণেরও মান এবং দিক্ দুইই থাকিবে। ত্বরণের উদাহরণ স্বরূপ রেলগাড়ির চলা ধরিতে পার। স্টেশনে গাড়ি থামিয়া আছে এবং ধর রেল লাইন সোজা। স্থির অবস্থায় গাড়ির বেগ শূন্য। ইঞ্জিন চলিতে শুরু করিল। প্রথমে উহার গতি মন্থর থাকে এবং ক্রমশ উহা বাড়ে। বেগ প্রথমে কম এবং ক্রমে বেশী। চলিতে আরম্ভ করিয়া গাড়ির বেগ বাড়িতেছে—আমাদের নূতন ভাষায় উহার 'ত্বরণ' ঘটিয়াছে (বা উহা 'ত্বরিত' হইয়াছে।) এ রকম বহু উদাহরণ পাইবে। আমরা দাঁড়াইয়া আছি, চলিতে শুরু করিলাম। আমাদের ত্বরণ হইল না? হাতের ঢিল ছুড়িয়া মারিলে ঢিলটি হাতে প্রথমে স্থিতিতে ছিল; উহার বেগ ছিল শূন্য। হাত নাড়ার সঙ্গে উহা বেগ পাইল। দুই অবস্থার মধ্যে উহার বেগ পরিবর্তন ঘটিয়া উহা ত্বরিত হইল।

রেলগাড়ি চলিতে গিয়া ধর প্রথম সেকেণ্ডে গড় মাত্র এক মিটার গেল। উহার গড় বেগ 1 মি/সে। দশম হইতে একাদশ সেকেণ্ডে উহা যেন 7 মিটার গেল। এই এক সেকেণ্ডে উহার বেগ 7 মি/সে। দশ সেকেণ্ডে গাড়ির বেগ 1 মি/সে হইতে বাড়িয়া 7 মি/সে হইল। অতএব উহার

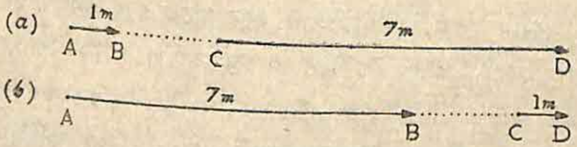
$$\text{ত্বরণ} = \frac{7 \text{ মি/সে} - 1 \text{ মি/সে}}{10 \text{ সে}} = \frac{6 \text{ মি/সে}}{10 \text{ সে}} = 0{\cdot}6 \text{ মি/সে}^2$$

বা প্রতি বর্গ সেকেণ্ডে 0·6 মিটার। ত্বরণে সময়ের উল্লেখ দুবার কেন করিতে হয় তাহা উপরের উদাহরণ হইতে বুঝিতে পারিবে—বেগের উল্লেখে একবার এবং বেগ পরিবর্তনের উল্লেখে আর একবার।

বেগের মান পরিবর্তন না ঘটিয়া কেবল দিক্ পরিবর্তন ঘটিলেও (যেমন বাঁকা লাইনে গাড়ি চলিলে) ত্বরণ হইয়াছে বলিতে হইবে। সাইকেল চালাইতে চালাইতে দ্রুতি না কমাইয়া যখন বাঁক নাও তখন কেবল দিক্ই বদলায়। ইহাতেও ত্বরণ ঘটিয়াছে বলিতে হইবে। আমরা কেবল বেগের মান পরিবর্তনে ত্বরণের কথাই বলিব ; দিক্ পরিবর্তনে ত্বরণের আলোচনা করিব না।

৭। **মন্দন (Retardation)**। সময়ের সহিত বেগ কমার হারকে 'মন্দন' বলে। ইহা ত্বরণের বিপরীত ; ত্বরণে বেগ বাড়ে ও মন্দনে বেগ কমে। অনেক সময় ত্বরণ কথাটি দিয়াই বেগের বৃদ্ধি বা হ্রাস বুঝান হয়। বেগ কমিলে ত্বরণ নেগেটিভ রাশি হয়।

ত্বরণ প্রসঙ্গে বলা রেলগাড়ির উদাহরণটিই ধর। মনে কর গাড়ি আসিয়া স্টেশনে থামিবে। খানিক আগে হইতেই গাড়ি উহার বেগ কমাইতে থাকে, অর্থাৎ উহার 'মন্দন' ঘটে (বা উহা 'মন্দিত' হয়)। থামিবার শেষে সেকেণ্ডে গাড়ি যেন 1 মি. চলিয়া থামিল। তাহার দশ সেকেণ্ড আগে উহা সেকেণ্ডে 7 মিটার চলিয়াছিল। অতএব দশ সেকেণ্ডে বেগ 7 মি/সে হইতে কমিয়া 1 মি/সে হইল। আগের মত হিসাব করিয়া দেখিতে পাই



II-2 চিত্র

মন্দন = (7 মি/সে − 1 মি/সে) ÷ 10 সে = 0·6 মি/সে^{2}। বিকল্পে বলা চলে এক্ষেত্রে ত্বরণ ঋণ রাশি, কারণ ত্বরণের সংজ্ঞা অনুসারে বেগ বৃদ্ধি = অন্তবেগ − আদিবেগ = 1 মি/সে − 7 মি/সে = −6 মি/সে। ইহা দশ সেকেণ্ডে ঘটিয়া থাকায় বেগ বৃদ্ধির হার, অর্থাৎ ত্বরণ = −6 মি/সে ÷ 10 সে = −0·6 মি/সে^{2}।

II.2 চিত্রে ত্বরিত ও মন্দিত গতির প্রকৃতি কিছুটা বুঝিতে পারিবে। (a)-চিত্রে ত্বরণ ও (b)-চিত্রে মন্দন দেখান। উভয় চিত্রে প্রথম সেকেণ্ডে অতিক্রান্ত পথ AB, এবং শেষ সেকেণ্ডে অতিক্রান্ত পথ CD ; গতির মধ্যের অংশ দেখান হয় নাই ; উহা যে আছে ফুটকিগুলিতে তাহা বুঝায়।

সাইকেল যখন থামাইতে চাও তখন ব্রেক কষিয়া মন্দন ঘটাও। দৌড়ের উপর নিজেকে যখন থামাইতে চাও তখন পা মাটিতে আটকাইবার চেষ্টা করিয়া নিজের মন্দন ঘটাও। একটু ভাবিয়া দেখিলেই ত্বরণ ও মন্দনের অসংখ্য উদাহরণ পাইবে। স্থিতি হইতে গতিতে বা গতি হইতে স্থিতিতে যাইতে যথাক্রমে ত্বরণ এবং মন্দন ঘটে।

প্রশ্ন। স্থিতি ও গতিকে আপেক্ষিক বলা হয় কেন? বেগ ও দ্রুতিতে প্রভেদ কি? ত্বরণ ও মন্দন কাহাকে বলে একটি করিয়া উদাহরণ দিয়া বুঝাও।

II-1.1. বিনা বাধায় পতনে ত্বরণ সুষম (Acceleration uniform in free fall)। উপরে ত্বরণের যে উদাহরণগুলি আমরা দিয়াছি সে সকল গতিতে ত্বরণ বরাবর সমান থাকে না। রেলগাড়ি গোড়ায় ত্বরিত হইয়া শেষে কার্যত সুষম বেগে চলে; তখন উহার ত্বরণ শূন্য। থামিতে গিয়া বেগ যখন ক্রমশ কমিতে থাকে তখন মন্দন গোড়ায় যদিও বা সুষম হয়, থামার পর মন্দন শূন্যে পরিণত হয়।



II-3 চিত্র

সুষম ত্বরণে গতির একটি উদাহরণ সর্বদাই আমরা দেখিতে পাই। উহা হইল উপর হইতে ভারী বস্তুর পতন। ছাদের উপর হইতে স্থির একটি ঢিল মাটির দিকে ছাড়িয়া দিলে। পৃথিবীর আকর্ষণে উহা মাটিতে পড়িবে। বায়ু ইহার গতিতে কিছু বাধা দেয়। কিন্তু ঢিলের ভার বায়ুর বাধার তুলনায় অনেক বেশী হইলে ঢিল সুষম ত্বরণে মাটিতে পড়ে; অর্থাৎ পতনকালে সময়ের সঙ্গে উহার বেগ একই হারে বাড়িতে থাকে। প্রতি সেকেণ্ডে বেগ প্রায় 9·8 মিটার (বা 32 ফুট) করিয়া বাড়ে, ইহা জানা আছে। এক্ষেত্রে সুষম ত্বরণ প্রতি বর্গ সেকেণ্ডে প্রায় 9·8 মিটার (বা 32 ফুট)।

II-3. চিত্রে বিনা বাধায় পতনে গতির প্রকৃতি দেখান হইয়াছে। গতির বৈশিষ্ট্য হইল স্থিতি হইতে আরম্ভ করিয়া গতি যতক্ষণ ধরিয়া চলে, পতনে অতিক্রান্ত পথ হয় সেই সময়ের বর্গের আনুপাতিক। সুষম ত্বরণকে f অক্ষর দিয়া, গতিকালকে t দিয়া এবং t সময়ে অতিক্রান্ত পথকে s অক্ষর দিয়া বুঝাইলে $s=\frac{1}{2}ft^2$ হয়। এরূপ পতনে $f=$ 32 ফুট/সে^{2} ধরিলে, প্রথম সেকেণ্ডে পতন 16 ফুট, প্রথম দুই সেকেণ্ডে পতন 64 ফুট, প্রথম তিন সেকেণ্ডে 144 ফুট, ইত্যাদি (II-3. চিত্র দেখ)। দ্বিতীয় সেকেণ্ডে ঢিলটি পড়ে $64-16=48$ ফুট, তৃতীয় সেকেণ্ডে $144-64=80$ ফুট। ছবিতে ইহাও দেখান আছে।

এক টুকরা কাগজ বা একটা পাতা এভাবে পড়িবে না, কারণ উহার ভারের তুলনায় বায়ুর বাধা মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। বায়ুর বাধা ভারের তুলনায় উপেক্ষণীয় (তুলনায় খুবই কম) হইলে তবেই পতনকে কার্যত বিনা বাধায় পতন (free fall) বলা চলে।

ঢিল খাড়াভাবে উপরে ছুড়িলে উহার বেগ সেকেণ্ডে পূর্বোক্ত হারে কমিতে থাকে। ইহা সুষম মন্দন।

বিনা বাধায় পতনে সকল বস্তুর ত্বরণ সমান। একখানা ইট এবং একসঙ্গে বাঁধিয়া দু খানা ইট একই উচ্চতা হইতে ছাড়িয়া দিলে উহারা একসঙ্গে মাটিতে পড়ে। ভর দ্বিগুণ হওয়ায় বেগ বা ত্বরণ কোনটি দ্বিগুণিত হয় নাই, একই রহিয়াছে।

বিনা বাধায় পতন সংক্রান্ত বিষয়গুলি ইটালীয় বৈজ্ঞানিক গ্যালিলিওর (1564-1642 খ্রীঃ) আবিষ্কার।

প্রশ্ন। সুষম ত্বরণে গতির একটি সুপরিচিত উদাহরণ দাও। এরূপ গতির বৈশিষ্ট্যগুলি বল। (সংকেত—(১) বেগ গতিকালের আনুপাতিক, (২) অতিক্রান্ত পথ গতিকালের বর্গের সমানুপাতিক (৩) সকল ভারী বস্তু একই ত্বরণে পড়ে।)

II-2. নিউটনের গতিবিষয়ক সূত্র (Newton's laws of motion)। II-1 বিভাগে আমরা কেবল সরল রৈখিক গতির বর্ণনা সংক্রান্ত কথা বলিয়াছি। বৃটিশ বৈজ্ঞানিক স্যার আইজাক নিউটন (1642-1727 খ্রীঃ) গতি সংক্রান্ত তত্ত্বগুলি তিনটি সূত্রে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এর সূত্র তিনটিই যন্ত্রবিজ্ঞান (Mechanics)-এর (বা স্থিতিবিদ্যা ও গতিবিদ্যার) ভিত্তি। এ তিনটি জানা না থাকিলে যন্ত্রবিজ্ঞান এবং উহার উপর নির্ভরশীল বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা কিভাবে আগাইত তাহা ধারণা করা যায় না। সূত্রগুলিতে আমাদের আলোচিত গতিবিষয়ক বিশেষ শব্দগুলি ছাড়াও দুইটি নূতন কল্পনের (concept) আশ্রয় নিতে হইয়াছে। আগের শব্দগুলিতে শুধু দূরত্ব আর কালের কল্পন আছে। সূত্রগুলিতে 'ভর' ও 'বল'-এর কল্পন উহাদের সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে।

নিউটনের ভাষায় ব্যক্ত সূত্র তিনটির অনুবাদ না করিয়া আধুনিক বিজ্ঞানের ভাষায় উহাদের নিচের মত করিয়া বলা যায় :

প্রথম সূত্র। বাহির হইতে কোন বল প্রয়োগ না করিলে স্থির বস্তু স্থিতিতেই থাকিবে এবং সচল বস্তু সুষম বেগে সরলরেখায় চলিতে থাকিবে।

দ্বিতীয় সূত্র। প্রযুক্ত বল কোন বস্তুতে যে ত্বরণ সৃষ্টি করে তাহা বলের সমানুপাতিক এবং বলের অভিমুখে।

* [এ সূত্রটিকে অন্যভাবেও লেখা হয়—'ভরবেগ' (momentum) পরিবর্তনের হার প্রযুক্ত বলের সমানুপাতিক এবং বলের অভিমুখে। 'ভরবেগ' কথাটির সঙ্গে আমাদের

এখনও পরিচয় হয় নাই বলিয়া আমরা ত্বরণের সাহায্যে সূত্রটি লিখিয়াছি। দুই-এ কোন প্রভেদ নাই। II-2.2 উপবিভাগে এই সূত্র আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা সে কথা বুঝিতে পারিব।]*

তৃতীয় সূত্র। ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া সমান ও বিপরীত। অন্য ভাষায়—প্রত্যেক ক্রিয়ারই সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া থাকে।

সূত্রগুলি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বা পরীক্ষার ফল নয়। উহারা গতি সংক্রান্ত সকল অভিজ্ঞতার মূল অনুধাবনের ফল। প্রত্যক্ষভাবে সূত্রগুলি পরীক্ষায় প্রমাণ করা যায় না। কিন্তু এগুলি হইতে আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার গতির ও ভরের ক্ষেত্রে যে সকল সিদ্ধান্ত করা যায় তাহার কোনটিই ভুল প্রমাণিত হয় নাই।

ব্যাখ্যা না করিলে সূত্রগুলির অর্থ পরিষ্কার হইবে না। নিচের তিনটি উপবিভাগে সূত্র তিনটির ব্যাখ্যা দেওয়া হইল।

II-2.1. প্রথম সূত্রের ব্যাখ্যা। প্রথম সূত্রটিকে 'জাড্যের বা জড়ত্বের সূত্র'ও (Law of inertia) বলে। ইহাতেই বল ও ভরের কল্পন আনা হইয়াছে। সূত্রে বলা হইয়াছে কোন বস্তুই বাধ্য না হইলে তাহার স্থিতি বা গতির অবস্থা বদলায় না। ইহাতে বোঝা যায় **সকল বস্তুরই এমন একটি ধর্ম আছে যাহার জন্য সে নিজ হইতে স্থিতি বা গতির অবস্থা বদলায় না, অবস্থা পরিবর্তনে বাধা দেয়। এই ধর্মকে 'জাড্য' বা জড়ত্ব' (Inertia) বলে।** পরে দেখিব ইহা হইতে ভরের ধারণায় যাওয়া যায়, কারণ এই ধর্ম সকল পদার্থের ধর্ম।

প্রথম সূত্রে বলের সংজ্ঞাও পাওয়া যায়। এই সূত্র অনুসারে **'বল' তাহাই যাহা বস্তুর স্থিতীয় বা গতীয় অবস্থার পরিবর্তন ঘটাইতে পারে।** কিন্তু এ রকম সংজ্ঞা হইতে বলের মান কিভাবে পাইব তাহা বোঝা যায় না। উহা আসে দ্বিতীয় সূত্র হইতে।

জাড্যধর্মের সঙ্গে তোমাদের পরিচয় আছে। রেলগাড়ি, বাস, ট্রাম হঠাৎ চলিতে শুরু করিলে সকলে পিছনের দিকে একটা ধাক্কা খাই। দাঁড়াইয়া থাকিলে পিছনদিকে পড়িয়া যাইতেও পারি। ইহা স্থিতি জাড্যের (Inertia of rest-এর) জন্য। স্থির আছি; স্থির থাকিতে চাই। গাড়ি সামনের দিকে চলায় গাড়ির সঙ্গে পা বা দেহের নিচের অংশ আগাইয়া যায়। কিন্তু উপরের দেহাংশ নিজের জায়গায় থাকিতে চায়। গাড়ি হঠাৎ থামিলে অনুরূপে সামনের দিকে ধাক্কা খাই। দেহ গাড়ির সঙ্গে চলিতেছিল। গাড়ি থামায় উহার সঙ্গে লাগা নিচের অংশ থামিয়া গেল, উপরের দেহাংশ আগের মতই চলিতে চাহিল। ইহা গতি জাড্য (Inertia of motion)।

বল ক্রিয়া না করিলে গতি জাড্যের জন্য গতি সরলরেখায় সুষম বেগে হইবে তাহার কোন পরীক্ষামূলক প্রমাণ দেওয়া যায় না। তবে ইহা অনুমান করা যায়। মসৃণ মেঝের উপর বল গড়াইয়া দিলে উহা খানিকদূর গিয়া থামিয়া যায়। মেঝের সঙ্গে ঘর্ষণ ইহার কারণ। ঘর্ষণ সব সময় গতিতে বাধা দেয়। ঘর্ষণ আমরা সম্পূর্ণ দূর করিতে পারি না ; তবে যত কমাই তত দেখি একই বস্তু একই বেগে চলিলে ঘর্ষণ যত কম থাকে উহা তত বেশী দূর যায়। ঘর্ষণ একেবারে না থাকিলে বস্তুটিকে কেহ থামাইত না, এবং একই বেগে উহা চলিতে থাকিত—এ অনুমান সঙ্গত। বলের ক্রিয়া না থাকিলে সচল বস্তু সুষমবেগে সরলরেখায় চলিত ইহা পরীক্ষায় প্রমাণ করিতে পারি না। ঘর্ষণ বা অন্য বস্তুর আকর্ষণ থাকিয়াই যায়। প্রমাণ না থাকিলেও ঐ অনুমানের ভিত্তিতে গৃহীত কোন সিদ্ধান্তই ভুল প্রমাণিত হয় নাই।

প্রশ্ন। নিউটনের গতীয় সূত্রগুলি বল। বস্তুর জাড্য বলিতে কি বুঝায়? স্থিতি- ও গতি-জাড্যের উদাহরণ দাও। জাড্য হইতে ভরের ধারণা কি করিয়া আনা যায়? (II-2.2 দেখ।)

সুষম বেগে চলন্ত রেলগাড়িতে কোন যাত্রী একটি বল উপরের দিকে ছুড়িয়া দিলেন। বল তাঁহার হাতেই ফিরিয়া আসিবে কি না কারণ দেখাইয়া বল। (উত্তরের আভাস—বল ও যাত্রীর বেগ সমান। বল উপরে উঠিয়া নিচে নামিতে যে সময় নিবে, সে সময়ে বল ও যাত্রী সমান দূর আগাইয়া যাইবে।)

II-2.2. দ্বিতীয় সূত্রের ব্যাখ্যা। কোন বস্তুকে ঠেলিতে বা টানিতে মাংসপেশীতে আমরা যে টান অনুভব করি তাহাই আমাদের বলের অনুভূতি। কোন বস্তুকে কম বেগে ঠেলিয়া দিতে কম বল লাগে ; একই সময়ে উহাকে বেশী বেগে ঠেলিয়া দিতে বেশী বল লাগে। তা ছাড়া ঠেলা যেদিকে দেওয়া হয় বস্তু সে দিকেই সরে। এ সকলই আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। দ্বিতীয় সূত্রে নিউটন বলকে গতি পরিবর্তনের সঙ্গে যুক্ত করিয়াছেন। গতি পরিবর্তন অর্থই ত্বরণ। উপরের উদাহরণে প্রথম ক্ষেত্রে ত্বরণ কম, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বেশী।

তা ছাড়া, যে বস্তুগুলিকে হালকা বলিয়া মনে করি, তাহার কোনটিকে ঠেলিয়া দিতে যে বল লাগে, একই বেগে তাহার চেয়ে ভারী বলিয়া বোধের বস্তুকে ঠেলিয়া দিতে আরও বেশী বল লাগে। ইহা বস্তুত জাড্যের জন্য। হালকা বস্তু একই বলে গতি পরিবর্তনে কম বাধা দেয় ; ভারী বস্তু বেশী বাধা দেয়। হালকা বস্তুর জাড্য কম, ভারী বস্তুর জাড্য বেশী। **কোন বস্তুতে উহার জাড্যের পরিমাণকে উহার 'ভর' বলে।**

বস্তুর ভর বেশী হইলে উহাকে একই ত্বরণ দিতে বেশী বল লাগিবে। m ভরের বস্তুতে f ত্বরণ দিতে যে P বলের দরকার হইবে তাহা m ও f উভয়ের আনুপাতিক। গণিতের ভাষায় এরূপ সম্পর্ককে লেখা হয় $P = kmf$; ইহাতে k একটি স্থির সংখ্যা।

বলের একক এ পর্যন্ত আমরা স্থির করি নাই। 1 একক ভরকে 1 একক ত্বরণ দিতে যে বলের দরকার হয় তাহাকে বলের একক ধরিলে $k=1$ হয়। মেট্রিক বা বৃটিশ পদ্ধতিতে ইহাই করা হয়। (বলের এককের জন্য II-2.4 উপবিভাগ দেখ।)

$P=mf$ সূত্রটি গতির মূল সূত্র। ইহা হইতে ভর ও ভারের সম্পর্ক আমরা অবিলম্বে পাইতে পারি। m ভরের উপর পৃথিবীর আকর্ষক বলে ভর যে ত্বরণ পায় তাহাকে g বলা যাক। II-1. 1 বিভাগে আমরা দেখিয়াছি সকল বস্তু মাটিতে একই ত্বরণে পড়ে। অতএব বস্তুর ভর m হইলে উহার ভার $W=mg$।

$P=mf$ সূত্র অনুসারে, **কোন বস্তুতে নির্দিষ্ট কোন বল প্রয়োগ করিয়া উহার ত্বরণ মাপিতে পারিলে বল ÷ ত্বরণ এই ভাগফলই হইবে বস্তুর ভর।** ত্বরণ মাপন কঠিন হইলেও ভর এইভাবে মাপা যায়। **জানা ভরের বস্তুতে নির্ণেয় বলে সৃষ্ট ত্বরণ মাপিয়া বলের মান জানা যায়।**

*[**ভরবেগ (Momentum)**। কোন বস্তুর ভর ও উহার বেগের গুণফলকে বস্তুটির 'ভরবেগ' বলে। সুবিধার জন্য ধরা যাক m ভরের বস্তু সরলরেখায় চলিতেছে। গতির দিকে বল প্রয়োগের আগে বস্তুটির বেগ ধর v_1 ছিল। t সময় ধরিয়া ইহার গতির দিকে স্থিরমান বল P প্রয়োগ করায় বেগ v_2 হইল। ইহাতে বস্তুটির ভরবেগের পরিবর্তন হইল $mv_2 - mv_1$ এবং ভরবেগ পরিবর্তনের হার হইল $m(v_2 - v_1)/t$। ত্বরণের সংজ্ঞা অনুসারে $(v_2 - v_1)/t=$ ত্বরণ $=f$। ভরবেগের সাহায্যে দ্বিতীয় সূত্রের যে রূপ দেওয়া হইয়াছে তাহাতে বলে 'বল ভরবেগ পরিবর্তনের হারের আনুপাতিক'। অতএব এভাবে দেখিলেও $P=kmf$। আগের মত বলের একক স্থির করিলে $k=1$ হইবে।]*

প্রশ্ন। নিউটনের প্রথম সূত্র হইতে বলের সংজ্ঞা কিভাবে পাওয়া যায়? দ্বিতীয় সূত্র বল মাপনের উপায় কিভাবে নির্দেশ করে?

II-2.3 তৃতীয় সূত্রের ব্যাখ্যা। বল যে বস্তুটির উপর ক্রিয়া করে প্রথম দুই সূত্রে কেবল তাহারই উল্লেখ আছে; যে বল প্রয়োগ করিল তাহার কোন উল্লেখ নাই। তৃতীয় সূত্রে তাহাকেও আনা হইয়াছে। বৃষ্টির বারিবিন্দু মাটিতে পড়িতেছে। প্রথম দুই সূত্র বারিবিন্দু সম্বন্ধে প্রযোজ্য। বারিবিন্দুতে বল প্রয়োগ করিতেছে পৃথিবী। তৃতীয় সূত্রে পৃথিবীকে আনা হইয়াছে। বারিবিন্দুর উপর পৃথিবীর আকর্ষণ হইল বারিবিন্দুতে প্রযুক্ত বল; ইহাকে 'ক্রিয়া' বলা যাক। তৃতীয় সূত্রে বলে বারিবিন্দুও পৃথিবীর উপর সমান ও বিপরীত বল প্রয়োগ করিবে; ইহাই প্রতিক্রিয়া। লক্ষ্য কর **ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন বস্তুর উপর কাজ করে।** একটি যতক্ষণ থাকে অন্যটিও ততক্ষণ থাকে। একের অবর্তমানে অন্যটি নাই। দেখা যায় **বল কখনও একক ক্রিয়া করে না; বলের ক্রিয়া জোড়ায় জোড়ায়।**

[বলিতে পার বারিবিন্দুর টানে পৃথিবী বারিবিন্দুর দিকে ত্বরিত হইয়া সরে না কেন ? $P = mf$ সূত্র হইতে দেখা যায় $f = P/m$। পৃথিবীর ভর বারিবিন্দুর তুলনায় এত বেশী (প্রায় 10^{27} গুণ) যে বারিবিন্দুর টানে পৃথিবীর ত্বরণ কল্পনাতীত কম (প্রায় 10^{-24} সেমি/সে^{2})।]

টেবিলের উপর একখানা বই রাখা আছে। পৃথিবীর আকর্ষণে উহা মাটিতে পড়িতেছে না কেন ? নিশ্চয়ই সমান ও বিপরীত কোন বল উহার উপর ক্রিয়া করিতেছে। বইয়ের ওজন টেবিলের উপর ক্রিয়া করে। বইয়ের উপর টেবিলের প্রতিক্রিয়া ইহার সমান ও বিপরীত। টেবিলের প্রতিক্রিয়া বইয়ের উপর প্রযুক্ত হইয়া পৃথিবীর টানকে প্রতিমিত (balance) করে। ইহাতে বই স্থিতিতে (বা সাম্যে) থাকে। মাটির প্রতিক্রিয়া টেবিলের ভারকে প্রতিমিত করে।

দুই দল দড়ি টানাটানি করিতেছ ; কিন্তু কেহ কাহাকেও সরাইতে পারিতেছ না। 'ক' দল দড়ির মাধ্যমে 'খ' দলের উপর একটা বল প্রয়োগ করিতেছে। প্রতিক্রিয়া স্বরূপ 'খ' দলও 'ক' দলের উপর সমান ও বিপরীত বল একই দড়ির মাধ্যমে প্রয়োগ করিতেছে। দড়ি দ্বিমুখী বল বহন করে এবং উহা দুই প্রান্তের দুই বস্তুর উপর ক্রিয়া করে। দড়ির টান (Tension) বলিতে এই দুই বলের যে কোনটিকে বুঝায়। ইহারা ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া।

ক্রিয়া থাকিলেই সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া থাকিবে। ইহা সব ক্ষেত্রে সাক্ষাৎভাবে প্রমাণ করা শক্ত। কিন্তু ইহার সত্যতায় আমরা সন্দেহ করি না।

প্রশ্ন। নিউটনের তৃতীয় সূত্র ব্যাখ্যা কর। প্রথম দুটি সূত্র হইতে ইহা কি কি মূল বিষয়ে পৃথক ? ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া সমান ও বিপরীত হইলে উহাদের ক্রিয়ায় সাম্য প্রতিষ্ঠা হইতে পারে না কেন ? খুঁটিতে দড়ি বাঁধিয়া তুমি দড়ি ধরিয়া টানিতেছ। ইহাতে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া কি ভাবে কাজ করিতেছে দেখাও। দড়ির টান বলিতে কি বুঝায় ?

(সংকেত—সাম্যের জন্য একই বস্তুর উপর সমান ও বিপরীত বল প্রযুক্ত হইতে হইবে। কিন্তু ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন বস্তুর উপর ক্রিয়া করে।)

II-2. 4. বলের সংজ্ঞা। যাহা বস্তুর স্থিতি বা গতির অবস্থার পরিবর্তন করিতে পারে তাহাকেই আমরা 'বল' বলিয়াছি। কেহ কেহ বলেন 'যাহা বস্তুর স্থিতি বা গতির অবস্থান পরিবর্তন করিতে পারে বা করিতে প্রয়াস পায়, তাহাই বল।' 'প্রয়াস' কথাটি যোগ করার সার্থকতা দেখাইয়া একটি উদাহরণ দেওয়া হয়। ঘরের একটা দেওয়ালকে খুব জোরে ঠেলিলেও দেওয়ালের স্থিতির অবস্থা বদলায় না ; অথচ অবশ্যই এখানে বল প্রয়োগ করা হইয়াছে। দেওয়াল মাটিতে শক্ত করিয়া গাঁথা না থাকিলে তাহার স্থিতির অবস্থা অবশ্যই বদলাইত। এখানে প্রযুক্ত বলকে অন্য বল

প্রতিমিত করিয়াছে। প্রতিমান (balancing) অন্য ঘটনা ; ইহাকে বলের সংজ্ঞায় যুক্ত করার কোন দরকার নাই।

বলের একক। মেট্রিক বা বৃটিশ পদ্ধতিতে বলের মান বস্তুর ভর ও উহাতে সঞ্জাত ত্বরণের গুণফলের সমান। **সিজিএস্ পদ্ধতিতে বলের এককের নাম 'ডাইন'** (dyne)। একগ্রাম ভরকে প্রতি বর্গ সেকেণ্ডে এক সেমি ত্বরণ দিতে যে বলের দরকার তাহাই এক ডাইন। এ বলের পরিমাণ অত্যন্ত কম—প্রায় একটি মশার ওজনের সমান। **এম্‌কেএস্ পদ্ধতিতে বলের এককের নাম 'নিউটন' (newton)** ; ইহা এক কেজি ভরকে প্রতি বর্গ সেকেণ্ডে এক মিটার করিয়া ত্বরণ দিতে পারে। 1 নিউটন $=$ 1 কেজি $\times$ 1মি/সে^{2} $=$ 1000 গ্রাম $\times$ 100 সেমি/সে^{2} $= 10^5$ ডাইন। 1 কেজি ভরের ওজন 9·8 নিউটন (1 কেজি $\times$ 9·8 মি/সে^{2})। **এফ্ পি এস্ পদ্ধতিতে বলের একক 'পাউণ্ডাল' (poundal)** ; এক পাউণ্ড ভরকে প্রতি বর্গ সেকেণ্ডে একফুট করিয়া ত্বরণ দেয়। 1 পাউণ্ডাল $=$ 1 পাউণ্ড $\times$ 1 ফু/সে^{2} $=$ 453·6 গ্রাম $\times$ 30·48 সেমি/সে^{2} $= 1{\cdot}382 \times 10^4$ ডাইন $=$ 0·1382 নিউটন। এক পাউণ্ড ভরের ওজন 1 পাউণ্ড $\times$ 32 ফু/সে^{2} $=$ 32 পাউণ্ডাল।

বলের ক্রিয়া। বলের মান ও দিক্ উভয়ই আছে। (১) একটি মাত্র বল (বা একাধিক হইলে উহাদের 'অপ্রতিমিত' (unbalanced) অংশ) কোন বস্তুর উপর ক্রিয়া করিলে বল বস্তুকে বলের অভিমুখে ত্বরণ দেয়। বল ক্রিয়া করিয়া চলিলে বস্তুর বেগ ক্রমশ বাড়ে। বল বন্ধ হইলে বস্তু বলের ক্রিয়াকালে যে বেগ পাইয়াছিল সেই বেগে চলিতে থাকে। বিপরীত বলের ক্রিয়া উহাকে থামায়।

(২) দুই সমান ও বিপরীত বল এক সঙ্গে একই সরলরেখায় একই বস্তুর উপর ক্রিয়া করিলে উহারা একে অন্যের ক্রিয়া বিনষ্ট করে। ফলে বস্তুটির স্থিতি বা গতির অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় না। বিজ্ঞানের ভাষায় আমরা বলি এক বল অন্য বলকে 'প্রতিমিত' (balance) করিয়াছে এবং বস্তুটি 'সাম্যে' (in equilibrium) আছে। 'অপ্রতিমিত' বল বস্তুকে ত্বরণ দেয়, 'প্রতিমিত' বল বস্তুকে সাম্যে রাখে।

(৩) দুই প্রতিমিত বল বস্তুকে বিকৃত করিতে পারে। একটি রবারের বলকে দুই হাতে চাপিয়া ধর। উহা সাম্যে থাকিবে, কিন্তু আকারে বিকৃত হইবে। পেঁচান স্প্রিং-এর দুমাথা ধরিয়া দুহাতে টান দাও। স্প্রিং ত্বরিত গতিতে চলিবে না, লম্বা হইবে মাত্র।

প্রায় সকল ক্ষেত্রেই বস্তুর উপর একাধিক বল এক সঙ্গে ক্রিয়া করে। পৃথিবীর আকর্ষণ সকল বস্তুর উপর সব সময়ই আছে। টেবিলের উপর হইতে একখানা বই তুলিতে এই আকর্ষণের চেয়ে বেশী বল আকর্ষণের বিপরীত দিকে প্রয়োগ করিতে

হইবে। প্রথমে বইয়ের ত্বরণ ঘটিবে। পরে বল ঠিক মত কমাইয়া বই সুষম বেগে উপরে তোলা যায়। এ সময়ে প্রযুক্ত বল ত্বরণ না ঘটাইয়া কেবল ভারের ক্রিয়া প্রতিমিত (balance) করে।

মেঝেয় রাখা একখানা ইট আস্তে ঠেলিলে উহা সরিবে না। ইহা মেঝের সঙ্গে ইটের ঘর্ষণের জন্য হয়। ঘর্ষণ গতিতে বাধার সৃষ্টি করে। কিন্তু ঠেলার জোর ক্রমশ বাড়াইলে উহা এক সময়ে ঘর্ষণের বাধা অতিক্রম করিয়া ইটকে সরাইবে। চলিতে শুরু করার গোড়ায় ইটের ত্বরণ ঘটে। পরে এমন হইতে পারে যে ঠেলা থাকা সত্ত্বেও ইট সমবেগে চলে। এ সময় প্রযুক্ত বল সম্পূর্ণভাবে ঘর্ষণের বাধা অতিক্রম করিতে ব্যয়িত হয়; ইটের ত্বরণ ঘটায় না।

প্রশ্ন। বলের সংজ্ঞা দাও। এম্‌কেএস্ ও সিজিএস্ পদ্ধতিতে বলের একক দুইটির নাম ও উহাদের সম্পর্ক বল।

প্রতিমিত ও অপ্রতিমিত বলের ক্রিয়ায় প্রভেদ কি প্রকার তাহা একটি উদাহরণ দিয়া বুঝাও।

II-3. কার্য (Work), ক্ষমতা (Power) ও শক্তি (Energy)।

পদার্থ-বিদ্যায় কার্য, ক্ষমতা ও শক্তি কথা কয়টি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়।

কার্য (Work)। কোন বস্তুর উপর ক্রিয়া করিয়া কোন বল বস্তুটিকে বলের ক্রিয়ার অভিমুখে সরাইলে বল বস্তুটির উপর 'কার্য' করিয়াছে বলা হয়। আলোচনার সুবিধা ও সরলতার জন্য 'বল' বলিতে আমরা নির্দিষ্ট দিকে ক্রিয়াশীল স্থিরমান বল বুঝিব। বলের ক্রিয়ায় বস্তুর স্থান পরিবর্তন সুষম বেগে বা সুষম ত্বরণে হইতে পারে।

সকল ক্ষেত্রেই কার্য অন্য কোন বলের 'বিরুদ্ধে' হইয়া থাকে। ঘর্ষণের বিরুদ্ধে বল কোন বস্তুকে সরাইলে বল 'ঘর্ষণের বিরুদ্ধে' 'বস্তুর উপর' কার্য করিয়াছে বলিতে হইবে। মেঝে হইতে কিছু তুলিলে পৃথিবীর আকর্ষণের বিরুদ্ধে বস্তুটির উপর 'কার্য' করা হইয়াছে। [পৃথিবীর আকর্ষণকে 'অভিকর্ষ' (Gravity)-ও বলে। পরে একথাটি আমরা ব্যবহার করিব। অতএব অর্থ মনে রাখিও।] অভিকর্ষের ক্রিয়ায় কোন বস্তু মাটিতে পড়িলে অভিকর্ষ বস্তুটির উপর কার্য করে। এ ক্ষেত্রে কার্য বস্তুর জাড্যের বিরুদ্ধে হয়। জাড্য গতিতে বাধা দেয়। এরূপ পতনে 'বস্তুটি কার্য করিয়াছে' একথাও আমরা বলি।

কার্যের একক। কার্যের মান বলের মান ও বলের ক্রিয়ায় সরণের গুণফল। এককের সিজিএস্ পদ্ধতিতে কার্যের একক হইবে 1 ডাইন$\times$1 সেমি$=$**1 আর্গ** (**erg**)। এক ডাইন বল কোন বস্তুর উপর ক্রিয়া করিয়া উহাকে এক সেন্টিমিটার সরাইলে বল এক আর্গ কার্য করিয়াছে বলা হয়। 2 ডাইন বল বস্তুকে

0·5 সেমি সরাইলেও এক আর্গ কার্য হয়। এম্‌কেএস্ পদ্ধতিতে কার্যের একক 1 নিউটন × 1 মিটার = 1 **জুল (joule)**। এক জুল 10^7 আর্গের সমান, কারণ 1 নিউটন = 10^5 ডাইন ও 1 মি = 100 সেমি। এফ্‌পিএস্ পদ্ধতিতে কার্যের একক **ফুট-পাউণ্ডাল (foot-poundal)** = 1 পাউণ্ডাল × 1 ফুট = 453·6 গ্রাম × 30·48 সেমি/সে^{2} × 30·48 সেমি = 4·214 × 10^5 আর্গ = 4·214 × 10^{-2} জুল।

ইহা ভিন্ন মেট্রিক ও বৃটিশ উভয় পদ্ধতিতে কার্যের আর একটি একক ব্যবহৃত হয়। তাহাকে 'অভিকর্ষীয় একক' (Gravitational unit) বলে। এক পাউণ্ড ভর অভিকর্ষের বিরুদ্ধে এক ফুট তুলিলে এক **ফুট পাউণ্ড (foot-pound)** কার্য হয়। এক পাউণ্ডের ভার 32 পাউণ্ডাল ধরিলে এই কার্য 32 ফুট পাউণ্ডাল। একই ভাবে এক কিলোগ্রাম ভরকে অভিকর্ষের বিরুদ্ধে এক মিটার তুলিলে ইহাকে এক কিলোগ্রাম-মিটার কার্য বলা যায়। এক গ্রাম-সেন্টিমিটার কার্যেরও অনুরূপ অর্থ। কোন পদ্ধতির অভিকর্ষীয় একককে ঐ পদ্ধতির পূর্ববর্ণিত এককে পরিণত করিতে হইলে, ঐ পদ্ধতির অভিকর্ষীয় ত্বরণ g দিয়া গুণ করিতে হয়। ইহার অর্থ ভরকে ভারে পরিণত করিয়া লওয়া। বৃটিশ পদ্ধতিতে অভিকর্ষীয় এককের প্রচলন বেশী।

ক্ষমতা (Power)। কার্যের বিচারে শুধু বল ও সরণই আসে, বল কতক্ষণ ধরিয়া প্রযুক্ত আছে সে গণনায় আসে না। **'ক্ষমতা' বলিতে সময়ের সহিত বলের কার্য করার হার বুঝায়।**

কোন কার্য হইতে যে সময় লাগিয়াছে বা লাগিবে, কার্যকে সেই সময় দিয়া ভাগ করিলে কার্যের হার অর্থাৎ ক্ষমতার মান পাওয়া যায়। কার্য করিতে পারে এমন যন্ত্রের গুণ বিচারে উহা কতটা কার্য করিতে পারে তাহা বিবেচনার বিষয় নয়। উহা কি হারে কার্য করিতে পারে তাহাই বিবেচ্য। ধর শহরে জল সরবরাহের জন্য এক জায়গায় নদী হইতে 50 ফুট উপরে একটি ট্যাংকে 1000 গ্যালন জল ভরিতে হইবে। ছোট পাম্প বসাইয়া ইহা আস্তে আস্তে করা যায়; আবার জোরাল পাম্প বসাইয়া ইহা দ্রুতও করা যায়। ব্যবহারের সময় ট্যাংকের জল যদি সেকেণ্ডে 10 গ্যালন হারে খরচ হয়, তাহা হইলে ট্যাংক ভরা রাখিতে হইতে তোমাকে এমন পাম্প বসাইতে হইবে যাহা সেকেণ্ডে 10 গ্যালন করিয়া জল 50 ফুট উপরে তুলিতে পারে। ইহার কার্যের হার বা ক্ষমতা হওয়া উচিত অন্তত সেকেণ্ডে 100 পাউণ্ড × 50 ফুট = 5000 ফুট-পাউণ্ড/সে।

ক্ষমতার একক প্রতি সেকেণ্ডে এক একক কার্য। কার্যের এককগুলির কথা আগে বলা হইয়াছে। উহাদের সময়ের একক সেকেণ্ড দিয়া ভাগ করিলে ক্ষমতার

একক পাওয়া যাইবে। সিজিএস্ পদ্ধতিতে ক্ষমতার একক **সেকেণ্ডে এক আর্গ** বা 1 আর্গ/সে। এম্‌কেএস্ পদ্ধতিতে একক 1 জুল/সে ; ইহাকে 1 **ওয়াট (watt)** বলে। এফ্‌পিএস্ পদ্ধতিতে ক্ষমতার একক প্রতি সেকেণ্ডে 1 ফুট-পাউণ্ডাল। ইহার প্রচলন কম ; অভিকর্ষীয় একটি এককের প্রচলন খুব বেশী। সেকেণ্ডে 550 ফুট-পাউণ্ড কার্যের হারকে এক **হর্স পাওয়ার (horse power)** বলে। ট্যাংকে জল ভরার উপরের ঐ উদাহরণটিতে তোমার পাম্পের ক্ষমতা প্রায় দশ হর্স পাওয়ার হওয়া দরকার। ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ইহার প্রচলন খুব বেশী। মেট্রিক পদ্ধতিতে ইঞ্জিনিয়ারিং-এ অনুরূপ একক এক **কিলোওয়াট** = 1000 ওয়াট। 1 হর্স পাওয়ার = 746 ওয়াট = 0·746 কিলোওয়াট। 1 কিলোওয়াট = 1·34 হর্স পাওয়ার।

আমরা কায়িক পরিশ্রম যখন করি তখন বিজ্ঞানের অর্থে কার্যই করি। আস্তে আস্তে কার্য করিলে, অর্থাৎ কম ক্ষমতা খাটাইলে ক্লান্তি কম হয়। একই কার্য অল্প সময়ে করিলে কার্য করার হার বাড়ে, অর্থাৎ বেশী ক্ষমতা প্রযুক্ত হয়। ইহাতে ক্লান্তি বোধ বাড়ে। ক্লান্তি মোট কার্যের সঙ্গে জড়িত নয় ; উহা কার্য করার হার বা ক্ষমতার সঙ্গে জড়িত। 100 মিটার রেস্ ধর। 100 মিটার যাইবার কার্যটুকু সকলেই করিতে পার। কিন্তু তাড়াতাড়ি করিতে হইলে কি অবস্থা হয় !

প্রশ্ন। কার্য ও ক্ষমতা কাহাকে বলে উদাহরণ দিয়া বুঝাও। ইহাদের কোন্‌টির সঙ্গে আমাদের ক্লান্তি বোধ সম্পর্কিত ?

এককের সিজিএস্, এম্‌কেএস্ ও এফ্‌পিএস্ পদ্ধতিতে কার্য ও ক্ষমতার এককের নাম বল। হর্স পাওয়ার কাহাকে বলে ?

শক্তি (Energy)। I-4.1, I-4.5 ও I-4.6 উপবিভাগে শক্তি সম্বন্ধে আমরা নানা কথা বলিয়াছি। জড়ে যাহা পরিবর্তন ঘটাইতে পারে তাহাকেই শক্তি বলা হইয়াছে। এই সংজ্ঞায় শক্তির মান পাইবার কোন উপায় পাওয়া যায় না। অথচ মাপন পদার্থ-বিদ্যার ভিত্তি। যেখানে কার্য হয় সেখানে কার্য দিয়া পরিবর্তন মাপা যায়। অতএব এরকম ক্ষেত্রে বলা যায় 'কার্য করার সামর্থ্য হইল শক্তি'। যতটা কার্য হইল তাহাকেই শক্তির মান ধরা যায়।

যে বস্তু কার্য করিতে পারে তাহার শক্তি আছে। এক হিসাবে শক্তির এই সংজ্ঞা হইল যান্ত্রিক শক্তির (Mechanical energy-র) সংজ্ঞা, অর্থাৎ যে শক্তির ক্রিয়ায় বল প্রযুক্ত হইয়া বলের অভিমুখে সরণ ঘটায়। কোন বস্তুর যান্ত্রিক শক্তিই একমাত্র শক্তি নয়। সাধারণত তাহার অন্য প্রকার শক্তিও থাকে যদিও শক্তির এই অংশকে কার্যে পরিণত করার কোন উপায় আমাদের জানা না থাকিতে পারে। বিশেষ

ক্ষেত্রে কোন বস্তু কতটা কার্য করিতে পারিবে তাহা দিয়াই বস্তুটির যান্ত্রিক শক্তির মান নির্দেশ করা হয়। শক্তি কার্যের এককেই মাপা হয়।

II-3.1. **গতিশক্তি (Kinetic energy)**। যান্ত্রিক শক্তি দুই প্রকার—গতিশক্তি ও স্থিতিশক্তি। সচল বস্তু গতিতে থাকার জন্য উহার কার্য করিবার যে সামর্থ্য আসে তাহাকে উহার **গতিশক্তি (Kinetic energy)** বলে। একটি বল গড়াইয়া তাহার ধাক্কায় অন্য একটি বল সরাইতে পারে। হাতুড়ি দিয়া পেরেকে ঘা মারিলে পেরেক কাঠের বাধা অতিক্রম করিয়া ভিতরে ঢুকিতে পারে। হাতুড়ি তাহার গতির জন্য কাঠে পেরেক ঢুকাইয়া কার্য করিতে পারিয়াছে। হাতুড়ি দিয়া বেশী জোরে ঘা মারিলে পেরেক বেশী ভিতরে ঢুকিবে, অর্থাৎ বেশী কার্য হইবে। দেখা যায় গতিশক্তি বেগের উপর নির্ভর করে। বেগ সমান হইলে ভারী হাতুড়িতে কার্য হইবে বেশী। গতিশক্তি ভরের উপরেও নির্ভর করে।

স্টেশনে মালগাড়ি হইতে একখানা গাড়ি কাটিয়া নিয়া ইঞ্জিন তাহাকে অন্য লাইনে ঠেলিয়া ছাড়িয়া দিল। গাড়ি গড়াইয়া গড়াইয়া লাইনের ঘর্ষণের বাধায় খানিক দূর গিয়া থামিল। গাড়িকে গতির বিপরীতে ঠেলা দিয়া আরও অল্প দূরত্বের মধ্যে থামান যায়। কোন সচল বস্তুকে উহার গতির বিরুদ্ধে বল প্রয়োগ করিয়া থামাইলে, বস্তুটি থামিবার আগ পর্যন্ত প্রযুক্ত বিপরীত বলের বিরুদ্ধে যে কার্য করিতে পারে তাহা দিয়াই বস্তুটির গতিশক্তি মাপা হয়। ইহা প্রযুক্ত বলের মানের উপর নির্ভর করে না। বস্তুর ভর m ও বেগ v হইলে, এইভাবে হিসাব করিয়া দেখা যায় উহার গতিশক্তির মান $K=\frac{1}{2}mv^2$, অর্থাৎ

$$\text{গতিশক্তি}=\tfrac{1}{2}\times\text{বস্তুর ভর}\times\text{বস্তুর বেগের বর্গ।}$$

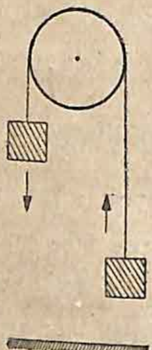
[বল বস্তুর উপর ক্রিয়া করিলে বস্তু গতিশক্তি পায়। F বল m ভরের স্থির বস্তুর উপর প্রয়োগ করিলে উহার ত্বরণ হইবে $f=F/m$। বলের ক্রিয়াকাল t হইলে, এই t সময় বস্তুটির বেগ হইবে $v=ft$। বল এই সময় বস্তুটিকে $s=\frac{1}{2}ft^2$ দূরত্ব সরায়। ইহাতে বলের ক্রিয়াবিন্দু বলের অভিমুখে s দূরত্ব সরে বলিয়া বল কার্য করিল $F.s=F.\frac{1}{2}ft^2=mf.\frac{1}{2}ft^2=\frac{1}{2}m(ft)^2=\frac{1}{2}mv^2$। বস্তুর উপরে করা এই কার্যই বস্তুর গতিশক্তির মান।]

II-3.2. **স্থিতিশক্তি (Potential energy)**। কোন বস্তুর বিভিন্ন অংশের আপেক্ষিক অবস্থান পরিবর্তন করিলে, বা অন্য বস্তু সাপেক্ষে উহার স্থান পরিবর্তন করিলে, যদি উহা কার্য করার সামর্থ্য পায় তাহা হইলে উহার 'স্থিতিশক্তি' আছে বলা হয়। স্থিতিশক্তি আছে তখনই বলা হয় যখন বস্তুটি স্থিতিতে আছে অথচ পরিপার্শ্ব সাপেক্ষে অথবা উহার নিজের দেহে এমন কোন পরিবর্তন ঘটিয়াছে যাহাতে বস্তুটি অন্য

বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করিতে পারে। সকল ক্ষেত্রেই একটা নির্দিষ্ট অবস্থায় বা নির্দিষ্ট অবস্থানে ফিরিয়া যাইতে বস্তুটি যে কার্য করিতে পারে তাহাই উহার স্থিতিশক্তির মান।

স্প্রিং-এর ক্রিয়া বস্তুর বিভিন্ন অংশের আপেক্ষিক অবস্থান পরিবর্তনের উদাহরণ। ঘড়ির স্প্রিং সম্বন্ধে একথা আগে বলা হইয়াছে। দম দেওয়া অবস্থা হইতে দম ফুরান অবস্থা পর্যন্ত যাইতে স্প্রিং যে কার্য করিতে পারে তাহাই উহার স্থিতিশক্তির মান।

ভূপৃষ্ঠ সাপেক্ষে কোন বস্তুকে উপরে তুলিলে উহা কার্য করার সামর্থ্য পায়। নিচে পড়িতে উহা অন্য বস্তুকে অভিকর্ষের বিরুদ্ধে টানিয়া তুলিতে পারে (II-4 চিত্র)।



II-4 চিত্র

কুয়া হইতে জল তুলিতে কোথাও কোথাও স্থিতিশক্তির সাহায্য নেওয়া হয়। বাঁশের এক প্রান্তে একটি ভার বাঁধা থাকে ; অন্য প্রান্তে দড়ি আর বালতি। হাড়িকাঠের মত অন্য দুটি বাঁশের মাথায় এই বাঁশের মাঝখান লাগান থাকে। দড়ি টানিয়া বালতি কুয়ায় নামাইতে ভার উপরে ওঠে ও স্থিতিশক্তি পায়। বালতিতে জল ভরিয়া তুলিবার সময় এই স্থিতিশক্তি বালতি তুলিতে সাহায্য করে। বড় বড় ইমারতের ভিত্তি শক্ত করার জন্য মাটিতে কাঠের মোটা খুঁটি শক্ত করিয়া পোঁতা হয়। ইহার জন্য খুব ভারী একটা লোহার পিণ্ড বার বার উপরে তুলিয়া খুঁটির মাথায় ফেলা হয়। লোহার পিণ্ডের স্থিতিশক্তি খুঁটিকে মাটির ভিতর ঢুকায়।

m ভরের বস্তু মাটি হইতে h উচ্চতায় থাকিলে উহার ভার mg-কে অভিকর্ষের বিরুদ্ধে h উচ্চতা তোলায় উহার উপর কার্য হইয়াছে mgh। এই কার্য বস্তুটিতে স্থিতিশক্তি রূপে থাকে। সুবিধামত ব্যবস্থার সাহায্যে উহাকে দিয়া ঠিক এই পরিমাণ কার্য করাইয়া নেওয়া যায়। অভিকর্ষের জন্য যে স্থিতিশক্তি হয় তাহাকে 'অভিকর্ষীয় স্থিতিশক্তি' (Gravitational potential energy) বলে।

নদীতে বাঁধ দিয়া প্রচুর জল আটকাইয়া রাখা যায়। মাইথন, তিলাইয়া, ভাকরা-নাঙ্গাল প্রভৃতি বাঁধের কথা তোমরা অনেকে শুনিয়াছ। বাঁধের প্রায় উপর পর্যন্ত জল জমা থাকায় উহাতে প্রচুর অভিকর্ষীয় স্থিতিশক্তি থাকে। নিচের দিক হইতে নল দিয়া এই জলের সাহায্যে টারবাইন (turbine) ঘুরাইয়া জলের স্থিতিশক্তিকে বৈদ্যুত শক্তিতে পরিণত করিয়া আলো জালাইবার বা মোটর ঘুরাইয়া কলকারখানায় পণ্য উৎপাদনের শক্তি পাওয়া যায়।

বেশী চাপে রাখা বায়ুও প্রসারিত হইয়া স্বাভাবিক চাপে আসিতে অন্য বস্তুর উপর

বল প্রয়োগ করিয়া কার্য করিতে পারে। এয়ার গান (Air gun) অনেকেই দেখিয়াছ। উহাতে গুলি ছোটে বায়ুর চাপে। বায়ুর চাপে অনেক যন্ত্রও চালান হয়। বেশী চাপের বায়ুতে বায়ুকণাগুলি স্বাভাবিক অবস্থার তুলনায় অনেক কাছে আসায় বায়ু স্থিতিশক্তি পাইয়াছে।

[এখানে একটি জিনিস লক্ষ্য করিতে পার। স্থিতিশক্তির সকল ক্ষেত্রেই দেখিবে বস্তুটি নিজ হইতে সেই অবস্থায় যাইতে চায় যে অবস্থায় তাহার স্থিতিশক্তি সব চেয়ে কম। ইহা প্রকৃতির (Nature) একটি সত্য। ইহাকে 'অবম স্থিতিশক্তির তত্ত্ব' (Principle of minimum potential energy) বলে। প্রকৃতি সকল বস্তুর স্থিতিশক্তি কমাইতে চায়। এই প্রয়াসেই বল প্রযুক্ত হইয়া কার্য হয়।]

প্রশ্ন। স্থিতিশক্তি ও গতিশক্তি কাহাকে বলে উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দাও। একটি হইতে অন্যটিতে রূপান্তরের উদাহরণ দাও। স্থিতিশক্তি আমরা কি ভাবে কাজে লাগাইতে পারি তাহার একটি উদাহরণ দাও।

II-4. কয়েকটি সরল যন্ত্র। সেলাইয়ের কল, ইনজিন বা কারখানার যত জটিল যন্ত্রের কথাই ভাব না কেন, ইহাদের ঘোরার অংশের কথা বাদ দিলে বাকী অংশকে মোট ছয় প্রকার সরল যন্ত্রাংশে ভাগ করা যায়। ইহাদের মধ্যে তিনটি সম্বন্ধে তোমাদের এখানে কিছু বলিব। ইহাদের নাম (১) লিভার (Lever), (২) চক্র-ও-অক্ষদণ্ড (Wheel-and-axle) এবং (৩) নত-তল (Inclined plane)। যন্ত্রাংশ মনে না করিয়া ইহাদের আমরা সরল যন্ত্র হিসাবেই দেখিব, এবং ইহাদের ক্রিয়া কি রকম বুঝিতে চেষ্টা করিব।

যন্ত্রের ব্যবহারে যে যে সুবিধা পাওয়া যায় তাহা প্রধানত :

(১) একস্থানে বল প্রয়োগ করিয়া অন্যস্থানে, এমন কি অন্য দিকে, বলের ক্রিয়া পাওয়া ;

(২) কম বল প্রয়োগে বেশী বলের ক্রিয়া পাওয়া ;

(৩) কম সরণে বেশী সরণ বা তাহার বিপরীত ক্রিয়া পাওয়া।

যন্ত্রগুলির ক্রিয়াবর্ণনায় কয়েকটি নূতন কথা ব্যবহার করা দরকার হইবে। যন্ত্রবিজ্ঞানের ভাষায় যন্ত্রে প্রযুক্ত বল F_1-কে বলে 'আয়াস' বা 'এফর্ট' (Effort)। F_1 বলের ক্রিয়ার যন্ত্র যে F_2 বল অন্যত্র প্রয়োগ করিতে পারে তাহাকে বলে 'বোঝা' বা 'লোড' (Load)। লোডকে এফর্ট দিয়া ভাগ করিলে যে রাশি পাওয়া যায় তাহাকে বলে 'যান্ত্রিক সুবিধা'।

যান্ত্রিক সুবিধা (Mechanical advantage) = লোড (Load) ÷ এফর্ট (Effort)।

সরল যন্ত্রগুলির ক্রিয়া বিবেচনায় সব সময়ই ধরা হয় লোড ও এফর্ট সুষম হারে কার্য করিতেছে, অর্থাৎ উহাদের প্রয়োগ বিন্দু সুষম বেগে চলিতেছে। এফর্টের সরণ s_1 হইলে লোডের সরণ যদি s_2 হয়, তবে s_1/s_2 রাশিটিকে 'বেগানুপাত' (Velocity ratio) বলে।

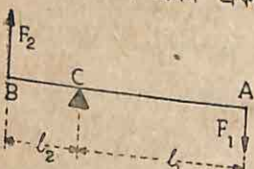
বেগানুপাত (Velocity ratio) = এফর্টের সরণ (s_1) ÷ লোডের সরণ (s_2)।

যন্ত্রে ঘর্ষণের ক্রিয়া উপেক্ষা করিলে এবং অন্য কোন ভাবে শক্তি অপচয় হইতে না দিলে, যন্ত্রে যে পরিমাণ শক্তি সরবরাহ করা হইবে শক্তির নিত্যতার জন্য যন্ত্র তাহাই ফিরাইয়া দিবে। ইহার অর্থ শক্তি অপচয় বিহীন আদর্শ অবস্থায় যন্ত্রের উপরে যে পরিমাণ কার্য করা হইবে যন্ত্রও সেই পরিমাণ কার্য করিতে পারিবে। যন্ত্রের উপরে করা কার্যকে 'নিবেশ' বা 'ইনপুট' (Input) এবং যন্ত্র হইতে পাওয়া কার্যকে 'নির্গম' বা 'আউটপুট' (Output) বলে। আদর্শ ক্ষেত্রে উহারা সমান ; $F_1s_1 = F_2s_2$। অতএব $F_2/F_1 = s_1/s_2$, বা যান্ত্রিক সুবিধা = বেগানুপাত। এরূপ যন্ত্রকে 'আদর্শ যন্ত্র' (Ideal machine) বলে। আমরা ইহারই আলোচনা করিব। তবে জানিয়া রাখিতে পার যন্ত্রের ভিতরে ঘর্ষণে কিছু শক্তি ব্যয় হইবেই, এবং আউটপুট ইনপুটের চেয়ে কম হইবে। এরূপ ক্ষেত্রে

আউটপুট/ইনপুট রাশিটিকে যন্ত্রের 'দক্ষতা' (Efficiency) বলে।

বাস্তব যন্ত্রে দক্ষতা 1-এর চেয়ে কম হয়। দক্ষতা সাধারণত শতকরা হারে প্রকাশ করা হয়। ভাল বৈদ্যুত মোটরের দক্ষতা 95% বা বেশীও হইতে পারে।

II-4.1. লিভার (Lever)। নিজের দেহের কোন বিন্দু সাপেক্ষে খানিকটা ঘুরিতে পারে এমন একটি শক্ত, সরল বা বাঁকা দণ্ডকে লিভার মনে করা যায় (II-5 চিত্র)। বাঁকা লিভারের কথা আমরা আলোচনা করিব না। যে বিন্দু সাপেক্ষে লিভার ঘুরিতে পারে তাহাকে উহার 'আলম্ব' (Fulcrum) বলে (II-5 চিত্রের C বিন্দু)। চিত্রের লিভারের একপ্রান্তে F_1 বল প্রয়োগ করিলে উহার অন্য-প্রান্ত উপরের দিকে উঠিবে এবং ঐ দিকে F_2 বল প্রয়োগ করিতে পারিবে। F_1 এফর্ট ও F_2 লোড। আলম্ব হইতে এফর্টের দূরত্ব l_1 ও লোডের দূরত্ব l_2 হইলে আদর্শ লিভারে $F_1l_1 = F_2l_2$ হয়।



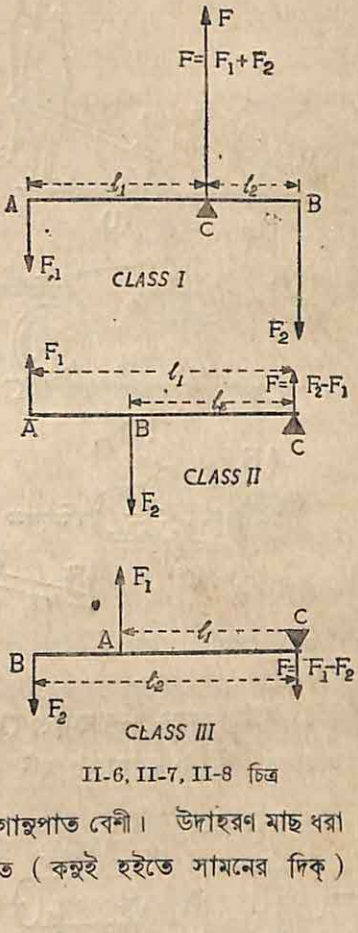
II-5 চিত্র

এফর্ট ও লোডের ক্রিয়াবিন্দু (A ও B) সাপেক্ষে C-র অবস্থান কোথায় তাহা দেখিয়া লিভারগুলিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় :

প্রথম শ্রেণীর লিভার। ইহাতে আলম্ব C এফর্টের ক্রিয়াবিন্দু A ও লোডের

ক্রিয়াবিন্দু B-র মাঝখানে কোথাও থাকে (II-6 চিত্র)। যান্ত্রিক সুবিধা $F_2/F_1 = l_1/l_2$; ইহা 1 বা 1-এর চেয়ে কম বা বেশী হইতে পারে। ভারী জিনিস উঁচা করিবার ডাণ্ডা, টিউব-ওয়েলের পাম্পের হাতল, তুলার দণ্ড, শিশুদের খেলার 'সি-স' (see-saw) কাঁচি প্রভৃতি ইহার উদাহরণ (কাঁচি ডবল লিভার ; II-9 চিত্র)

দ্বিতীয় শ্রেণীর লিভার। ইহাতে আলম্ব এক প্রান্তে ও এফর্ট অন্যপ্রান্তে (II-7 চিত্র)। লোড থাকে উহাদের মাঝখানে কোথাও। যান্ত্রিক সুবিধা 1 অপেক্ষা বেশী হয়। দাঁড়, মালটানা বা ময়লা ফেলার এক চাকার গাড়ি, সুপারি কাটা জাঁতি, পানীয়ের বোতল খুলিবার চাবি ইত্যাদি ইহার উদাহরণ। দাঁড়ের আলম্ব জলের মধ্যে দাঁড়ের মাথা।

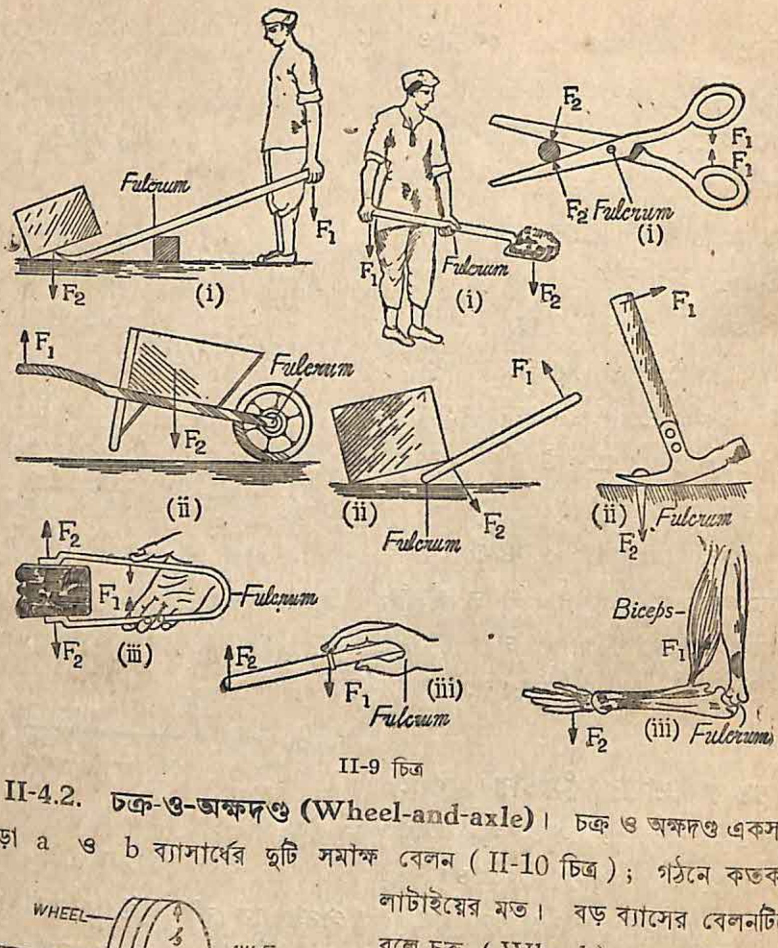


II-6, II-7, II-8 চিত্র

তৃতীয় শ্রেণীর লিভার। ইহাতে আলম্ব এক প্রান্তে ও লোড অন্য প্রান্তে। এফর্ট ইহাদের মাঝখানে কোথাও (II-8 চিত্র)। যান্ত্রিক সুবিধা 1-এর চেয়ে কম, কিন্তু বেগানুপাত বেশী। উদাহরণ মাছ ধরা ছিপ, চিমটা (ডবল লিভার), ছুরি মানুষের হাত (কনুই হইতে সামনের দিক্) ইত্যাদি।

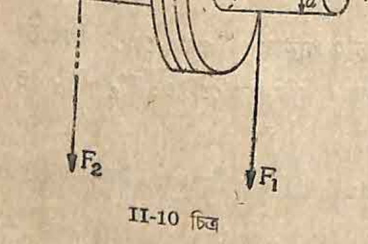
II-9. চিত্রে তিন রকম লিভারের কয়েকটি ছবি পাইবে। প্রথম শ্রেণীর লিভারে আলম্বকে অন্তত $F_1 + F_2$ বল বহন করিতে হইবে। দ্বিতীয় শ্রেণীতে $F_2 - F_1$ ও তৃতীয় শ্রেণীতে $F_1 - F_2$।

প্রশ্ন। তিন রকম লিভারের বৈশিষ্ট্য বুঝাইয়া প্রত্যেকটির দুটি করিয়া উদাহরণ দাও। লিভার ব্যবহার করিয়া আমরা কি কি রকম সুবিধা পাইতে পারি ?



II-9 চিত্র

II-4.2. চক্র-ও-অক্ষদণ্ড (Wheel-and-axle)। চক্র ও অক্ষদণ্ড একসঙ্গে জোড়া a ও b ব্যাসার্ধের দুটি সমাক্ষ বেলন (II-10 চিত্র); গঠনে কতকটা লাটাইয়ের মত। বড় ব্যাসের বেলনটিকে বলে চক্র (Wheel) ও ছোট ব্যাসের বেলনটিকে বলে 'অক্ষদণ্ড' (Axle)। ঘুরাইলে উভয়ে এক সঙ্গে একই অক্ষে ঘোরে। অক্ষদণ্ডে একগাছা দড়ি পেঁচান। উহার একপ্রান্ত অক্ষদণ্ডে আঁটা; অন্য প্রান্ত লোডের (F_2) সঙ্গে লাগাইতে হয়। চক্রেও অনুরূপ একগাছা দড়ি বিপরীত পাকে জড়ান। তাহার মুক্তপ্রান্তে

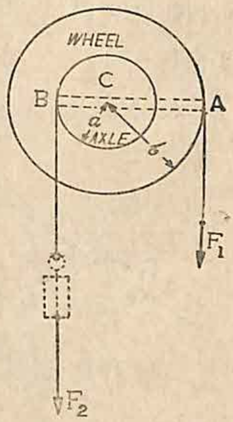


II-10 চিত্র

এফর্ট (F_1) প্রয়োগ করা হয়। এফর্ট প্রয়োগে চক্রের দড়ি খুলিতে থাকে ও অক্ষদণ্ডের দড়ি অক্ষদণ্ডে আরও পেঁচায় এবং লোডকে কাছে টানিয়া আনে। কুয়া হইতে জল তুলিবার এরকম ব্যবস্থা কেহ কেহ হয়ত দেখিয়াছ।

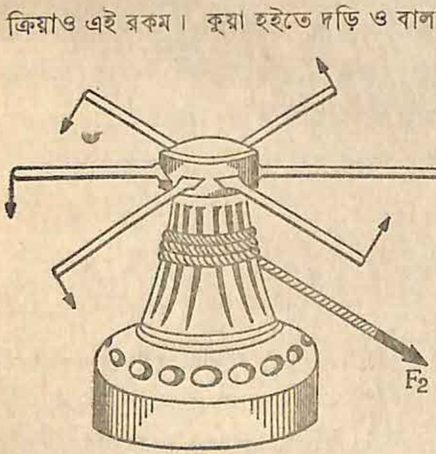
যন্ত্র সুষম বেগে ঘুরিতে থাকিলে $F_1b=F_2a$ হইবে। অতএব আদর্শ যান্ত্রিক সুবিধা $F_2/F_1=b/a$। a-র চেয়ে b পাঁচগুণ বড় হইলে কোন বল প্রয়োগ করিয়া উহার পাঁচগুণ বলের কাজ পাওয়া যায়।

চক্র-ও-অক্ষদণ্ড কার্যত একটি অবিরত ক্রিয়াশীল (continuously acting) প্রথম শ্রেণীর লিভার। পাশ হইতে অক্ষ বরাবর যন্ত্রটির দিকে তাকাইলে উহাকে II-11 চিত্রের মত দেখাইবে। ছবিতে ভাঙা রেখার যে যন্ত্রাংশটুকু দেখা যাইতেছে, মাত্র সেইটুকু মনে রাখিয়া বাকী অংশ ভুলিয়া যাও। লক্ষ্য করিয়া দেখ এই ACB অংশ একটি প্রথম শ্রেণীর লিভার। উহার A প্রান্তে এফর্ট, B প্রান্তে লোড এবং C উহার আলম্ব। যন্ত্র যখন ঘুরিতে থাকে তখন একের পর এক অংশ আসিয়া এই স্থান অধিকার করে। এই কারণে ইহাকে অবিরত ক্রিয়াশীল প্রথম শ্রেণীর লিভার মনে করা যায়।



II-11 চিত্র

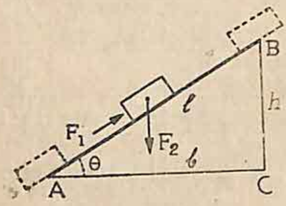
মোটরগাড়ি বা ষ্টিমারে গতিমুখ ঘুরাইবার চাকার (Steering wheel-এর) ক্রিয়া চক্র-ও-অক্ষদণ্ডের ক্রিয়া। দরজায় আঁটা তালা খুলিবার হাতলের (Knob-এর) ক্রিয়াও এই রকম। কুয়া হইতে দড়ি ও বালতি দিয়া জল তুলিতে চাকার কথা আগেই বলিয়াছি। ঘাটে ষ্টীমার বাঁধিতে বা উহার নোঙ্গর উঠাইতে ক্যাপস্টান (Capstan) (II-12 চিত্র) ব্যবহার হয়। ইহাতে চক্রের বদলে অক্ষদণ্ডের সঙ্গে লম্বা কয়েকটি দণ্ড লাগান থাকে। উহাদের প্রান্তে এফর্ট প্রয়োগ করা হয়। ইহার সাহায্যে মাটিতেও ভারী জিনিস টানিয়া কাছে আনা যায়। যন্ত্রের অক্ষ হইতে এফর্ট প্রয়োগের স্থানের দূরত্ব, অর্থাৎ b-র মান ইহাতে অনেক বেশী হওয়ায় যান্ত্রিক সুবিধা খুব বাড়ে। তা ছাড়া যতটি দণ্ড আছে b/a অনুপাত ততগুণ বাড়ে ও খুব কম বল প্রয়োগে অনেক বেশী বল কাজে লাগান যায়।



II-12 চিত্র

II-4.3. নত-তল (Inclined plane)। নত-তল যথাসম্ভব মসৃণ একটি আনত সমতল। উহা কাঠের, লোহার, সিমেণ্টের বা যে কোন শক্ত জিনিসে তৈয়ারী হইতে পারে। ইহার সাহায্যে ভারী জিনিস তলের নিচ হইতে তল বরাবর উপরে তোলা যায়। অনেকে গুদামের দরজার সামনে সিমেণ্টে তৈয়ারী এ রকম স্থায়ী ব্যবস্থা দেখিয়া থাকিবে। মালগাড়ি, লরি প্রভৃতিতে মাল তুলিতেও কাঠের নত-তলের ব্যবহার হয়।

নত-তলের ক্রিয়া II-13 চিত্রের সাহায্যে বোঝা যাইবে। তলের দৈর্ঘ্য $AB=l$, নিচ হইতে উপর পর্যন্ত উচ্চতা $BC=h$ ও ভূমির দৈর্ঘ্য $AC=b$ ধরা যাক। তলের সমান্তরালে F_1 এফর্ট প্রয়োগ F_2 লোড যেন A হইতে B-তে নিয়া যাওয়া গেল। F_2 হইলে বস্তুটির ওজন। এখানে এফর্ট কার্য করিয়াছে $F_1 l$ ও লোড অভিকর্ষের বিরুদ্ধে কার্য করিয়াছে $F_2 h$।



II-13 চিত্র

আদর্শ যন্ত্রে $F_1 l = F_2 h$, এবং যান্ত্রিক সুবিধা $F_2/F_1 = l/h$ হইবে h/l-কে তলের নতি (slope) বলে। তল বরাবর l পথ গেলে অভিকর্ষের বিরুদ্ধে h উচ্চতায় ওঠা হয়।

মনে কর একটি ছেলে 20 কেজি ওজনের চেয়ে বেশী বল প্রয়োগ করিতে পারে না। তাহাকে যেন নত-তলের সাহায্যে 100 কেজি ওজনের এক চাপ বরফ 1 মিটার উঁচু লরিতে তুলিতে বলা হইল। এ ক্ষেত্রে তলের নতি অন্তত কত হওয়া দরকার ? দেখ ত 5 মিটারে 1 মিটার নয় কি? নতি কম বা বেশী হইলে কি সুবিধা বা অসুবিধা হইত ?

প্রশ্ন। (১) চক্র-ও-অক্ষদণ্ডের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও। উহাকে কি কারণে অবিরত ক্রিয়াশীল প্রথম শ্রেণীর লিভার মনে করা যায় ?

(২) সরল যন্ত্রগুলির সাহায্যে আমরা কি কি সুবিধা পাইবার ব্যবস্থা করিতে পারি। নত-তলের সাহায্যে কম বল প্রয়োগে ভারী বস্তু কি ভাবে অভিকর্ষের বিরুদ্ধে তোলা যায় বুঝাইয়া বল।

II-5. তাপের কথা : তাপ ও উষ্ণতা (Heat and Temperature)। স্পর্শেন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা বস্তুকে ঠাণ্ডা বা গরম বলিয়া বোধ করি। এক পাত্র ঠাণ্ডা জল উনানে বসাইলে উহা ক্রমশ গরম হইয়া শেষে ফুটিতে আরম্ভ করে। যে বাহ্য কারণ শীতল বস্তুকে উষ্ণ করে তাহাকে আমরা **'তাপ'** (**Heat**) বলি। কোন বস্তু আগের চেয়ে উষ্ণ হইলে আমরা মনে করি উহাতে তাপ প্রবেশ করিয়াছে।

যত শীতলই হউক, সকল বস্তুতেই তাপ আছে, একথা আমরা বলি। নদী, কুয়া, পুকুর বা কলের জল ফুটন্ত জলের চেয়ে ঠাণ্ডা। বরফ উহাদের যে কোনটির জলের চেয়ে ঠাণ্ডা। এক গেলাস জলে এক টুকরা বরফ ফেলিলে উহা গলে। ফলে জল কিছু ঠাণ্ডা হয়, কিন্তু বরফের চেয়ে উষ্ণ থাকে। ইহার ব্যাখ্যায় আমরা বলি জল হইতে কিছু তাপ বরফে প্রবেশ করিয়া প্রথমে উহাকে গলায় ও পরে বরফ গলা সেই জলকে কিছু উষ্ণ করে। ইহাতে গেলাসের জল নিজেও কিছু ঠাণ্ডা হয়, কারণ সে কিছু তাপ ছাড়িয়াছে। উপরের উদাহরণে আমরা দেখিলাম গেলাসের জল ফুটন্ত জলের চেয়ে ঠাণ্ডা ; কিন্তু তাহাতে তাপ অবশ্যই ছিল। সেই তাপেই বরফ গলিল এবং বরফ গলা জল একটু উষ্ণ হইল।

বরফেও তাপ আছে। তরল বায়ু (Liquid air) বরফের চেয়ে অনেক ঠাণ্ডা। কিন্তু এক পাত্র তরল বায়ুকে এক চাপ বরফের ভিতর বসাইয়া রাখিলে উনানে বসান জলের মত তরল বায়ু ফুটিতে থাকিবে। বরফ হইতে তাপ তরল বায়ুতে প্রবেশ করিয়া উহাকে ফুটায়। বরফ খানিকটা তাপ ছাড়ে বলিয়া আরও শীতল হয়।

উষ্ণতা। সব বস্তুতে তাপ থাকিলেও মনে রাখিও আমাদের গরম বা ঠাণ্ডা বোধ ঐ বস্তুর তাপের পরিমাণের উপর নির্ভর করে না। এক পাত্র গরম জলে খানিকটা ঠাণ্ডা জল ঢালিলে পাত্রের জলে তাপের পরিমাণ আগের চেয়ে বাড়ে, কিন্তু জল আগের চেয়ে ঠাণ্ডা হয়। গরম কি ঠাণ্ডা—এই বোধটা যদি তাপের পরিমাণের উপর নির্ভর করিত তাহা হইলে ঠাণ্ডা জল মিশাইবার পর মিশান জলকে আগের চেয়ে ঠাণ্ডা মনে হইত না।

গরম-ঠাণ্ডা বোধ যদি তাপের পরিমাণের উপর নির্ভর না করে তাহা হইলে নিশ্চয়ই উহা অন্য কিছুর উপর নির্ভর করিবে। এই অন্য কিছু—যাহার উপর আমাদের গরম-ঠাণ্ডা বোধ নির্ভর করে তাহাকে আমরা 'উষ্ণতা' (Temperature) বলি। সমান গরম নয় এমন দুটি বস্তু পরস্পরের সংস্পর্শে থাকিলে আমরা দেখি উহারা খানিক পরে সমান গরম হইয়া যায়। গরমটি একটু ঠাণ্ডা হয় ও ঠাণ্ডাটি একটু গরম হয়। ঠাণ্ডা ও গরম জল মিশাইলে ইহাই আমরা দেখিতে পাই। এই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে উষ্ণতার প্রাথমিক একটা স্থূল সংজ্ঞা আমরা ঠিক করিতে পারি।

দুইটি বস্তু পরস্পর সংস্পর্শে থাকিলে কোন্‌টি হইতে তাপ অন্যটিতে যাইবে তাহা বস্তুর যে ধর্মের বা অবস্থার উপর নির্ভর করে তাহাকে বস্তুর উষ্ণতা বলে। উষ্ণতা বস্তুর তাপসংক্রান্ত একপ্রকার অবস্থা—বেশী উষ্ণতার বস্তু হইতে কম উষ্ণতার বস্তুতে তাপ যায়। উষ্ণতা সমান হইলে এক বস্তু হইতে অন্য বস্তুতে তাপ যায় না। কোন বস্তুকে ছুঁইলে যদি উহা গরম বোধ হয় তাহা হইলে উহা

হইতে তাপ আমাদের দেহে প্রবেশ করিতেছে; ঠাণ্ডা বোধ হইলে আমাদের দেহ হইতে তাপ উহাতে যাইতেছে—ইহাই আমাদের গরম বা ঠাণ্ডা বোধের ব্যাখ্যা।

তাপ ও উষ্ণতার প্রভেদ। দুইএর প্রভেদ লক্ষণীয়:

(১) তাপযোগে উষ্ণতা বাড়ে; তাপ যোগকে কারণ (cause) এবং উষ্ণতা বৃদ্ধিকে ফল (effect) মনে করা যায়।

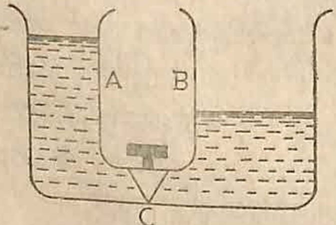
(২) বস্তুর উষ্ণতা ও উহাতে তাপের পরিমাণে কোন সম্পর্ক নাই। এক বালতি জল হইতে এক গেলাস জল আলাদা করিয়া নিলে দেখা যায় উভয়ের উষ্ণতা একই। কিন্তু বালতির জলে তাপের পরিমাণ গেলাসের জলের চেয়ে অবশ্যই অনেক বেশী।

(৩) একই পরিমাণ তাপ যোগে বিভিন্ন বস্তুর উষ্ণতা বিভিন্ন পরিমাণ বাড়িতে পারে। এক বাটি ফুটন্ত জল এক বালতি জলে ঢালিলে উষ্ণতা একটু বাড়ে। কিন্তু ঐ ফুটন্ত জল এক গেলাস জলে ঢালিলে উষ্ণতা বাড়ে আরও বেশী।

(৪) সংস্পর্শে অবস্থিত দুইটি বস্তুর কোন্‌টি হইতে তাপ অন্যটিতে যাইবে তাহা উহাদের উষ্ণতা দিয়া ঠিক হয়। কোনটির তাপের পরিমাণ দিয়া নয়।

(৫) বেশী উষ্ণ বস্তু হইতে তাপ কম উষ্ণ বস্তুতে প্রবাহিত হয়—এ হিসাবে তাপ ও উষ্ণতার সম্পর্ক জলের পরিমাণ ও জলতলের (water level-এর) মত। পাত্রে জল ঢালিলে জলতল উপরে ওঠে, অর্থাৎ বাড়ে। তেমনই বস্তুতে তাপ যোগ করিলে উহার উষ্ণতা বাড়ে। উষ্ণতা যেন তাপসংক্রান্ত তল (level)।

জলতল অসমান উচ্চতায় এমন দুইটি পাত্র যোগ করিয়া, একটি হইতে অন্যটিতে জল যাইতে দিলে (II-14 চিত্র) দেখা যাইবে নিচু জলতলের পাত্রে অনেক বেশী জল থাকিলেও, উঁচু জলতলের পাত্র হইতে জল নিচু জলতলের পাত্রে যাইবে এবং উভয় পাত্রে জলতল সমান হইলে জলপ্রবাহ বন্ধ হইবে। বিভিন্ন উষ্ণতার দুইটি বস্তুকে সংস্পর্শে রাখিলে ঠিক এই রকম ক্রিয়াই হয়। কম উষ্ণতার বস্তুটিতে অনেক বেশী তাপ থাকিলেও, বেশী উষ্ণতার বস্তু হইতে কম উষ্ণতার বস্তুটিতে তাপ প্রবাহিত হইবে। জলের প্রবাহ আমরা দেখিতে পাই; কিন্তু তাপের প্রবাহ আমরা দেখিতে পাই না। তবে কোন বস্তু উষ্ণ হইলে আমরা মনে করি উহাতে তাপ প্রবেশ করিয়াছে।



II-14 চিত্র

প্রশ্ন। তাপ ও উষ্ণতার প্রভেদ বুঝাইয়া বল।

II-5.1. তাপের পরিমাণ কিসের উপর নির্ভর করে। কোন বস্তুতে তাপের পরিমাণ উহার (১) ভর, (২) উষ্ণতা ও (৩) উহার প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। একই উষ্ণতায় একই পদার্থের বেশী ভরের বস্তুতে বেশী তাপ থাকে। আবার একই পদার্থের একই ভরের বস্তুতে যেটির উষ্ণতা বেশী তাহাতে তাপও বেশী। ভর ও উষ্ণতা একই, কিন্তু পদার্থ বিভিন্ন হইলে তাপও বিভিন্ন হয়।

কোন বস্তুতে 'মোট' তাপের পরিমাণ মাপা যায় না। উষ্ণতার প্রভেদে এক বস্তু হইতে অন্য বস্তুতে যে পরিমাণ তাপ যায়—একে দেয়, অন্যে নেয়—তাহার সঠিক মান নির্ণয় করা সম্ভব, এবং এই বর্জিত ও গৃহীত তাপের আলোচনাই বেশী ফলপ্রসূ। আমরা ইহাই করিব।

ধরিলাম কোন পাত্রে দুইটি অসমান উষ্ণতার বস্তু রাখা আছে এবং পাত্রটি এমন যেন উহার সহিত বস্তু দুটির তাপের কোন লেনদেন হইতে পারে না, বা পাত্রটির মধ্য দিয়া বাহির হইতে কোন তাপ ভিতরে আসিতে বা ভিতর হইতে বাহিরে যাইতে পারে না। তাপ একপ্রকার শক্তি ইহা আমরা আগেও বলিয়াছি, পরেও (II-5.2 ও II-5.3 উপবিভাগে) আবার বলিব। শক্তির নিত্যতার জন্য উষ্ণতর বস্তুটি যে তাপ বর্জন করিবে ও শীতলতর বস্তুটি যে তাপ গ্রহণ করিবে, তাহার সমান হইবে।

উষ্ণতার পরিবর্তনে বর্জিত বা গৃহীত তাপ তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে—(১) ভর, (২) উষ্ণতা পরিবর্তন ও (৩) বস্তুটি যে পদার্থে গঠিত তাহার প্রকৃতি। পদার্থের প্রকৃতির ক্রিয়া বুঝাইতে আমরা তাপ সংক্রান্ত নূতন একটি রাশির অবতারণা করিব ; ইহার নাম 'আপেক্ষিক তাপ' (Specific heat)। একক ভরের পদার্থকে এক ডিগ্রী উষ্ণ করিতে যে পরিমাণ তাপের দরকার হয় তাহাকে ঐ পদার্থের আপেক্ষিক তাপ বলে। s আপেক্ষিক তাপের কোন পদার্থের m ভরের বস্তুর উষ্ণতা পরিবর্তন t ডিগ্রী হইলে, উহা উষ্ণতা কমিলে mst পরিমাণ তাপ বর্জন করিবে। উষ্ণতর হইলে উহা mst পরিমাণ তাপ গ্রহণ করিবে। তাপ বা উষ্ণতার এককের কোন কথা তোমাদের বলা হয় নাই। তবু জানিয়া রাখ এক গ্রাম জলকে এক ডিগ্রী সেলসিয়াস উত্তপ্ত করিতে যে তাপ দরকার, সিজিএস্ পদ্ধতিতে তাহাই তাপের একক এবং ইহার নাম 'ক্যালরি' (calorie)। ভর m-কে গ্রামে, উষ্ণতা পরিবর্তন t-কে সেলসিয়াস (বা সেন্টিগ্রেড) ডিগ্রীতে প্রকাশ করিলে বর্জিত বা গৃহীত তাপের পরিমাণ $H = mst$ ক্যালরি হইবে।

প্রশ্ন। উষ্ণতার প্রভেদে এক বস্তু হইতে অন্য বস্তুতে তাপ সঞ্চালন কি কি বিষয়ের উপর এবং কিভাবে নির্ভর করে ?

II-5.2. তাপের প্রকৃতি (Nature of heat)। I-4.1 উপরিভাগে শক্তি আলোচনায় আমরা তাপকে শক্তি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি। তাপ কোন প্রকার পদার্থ নয়। তাপ পদার্থ হইলে একই বস্তুর উষ্ণ ও শীতল অবস্থায় ওজনের প্রভেদ হইত। একই বস্তুকে উষ্ণ ও শীতল অবস্থায় ওজন করিয়া খুব সূক্ষ্ম মাপনেও উহার ওজনের কোন প্রভেদ পাওয়া যায় না।

তাপ পদার্থ নয় ইহা প্রমাণ করা যত সোজা, তাপ এক প্রকার শক্তি তাহা প্রমাণ করা তত সোজা নয়। নানা রকম পরীক্ষা ও নিরীক্ষার সাহায্যে তাপকে শক্তি বলিয়া আমরা বুঝিতে পারিয়াছি। দুই হাত ঘষিতে থাকিলে হাত গরম হয়। এক টুকরা লোহাকে হাতুড়ি দিয়া ঘা মারিতে থাকিলে, বা এক খণ্ড তারকে বার বার বাঁকাইতে থাকিলে দেখা যায় উহা ক্রমে গরম হইতেছে। শান-পালিশের কলের ঘুরন্ত চাকায় ছুরি চাপিয়া ধরিলে উহা হইতে আগুনের ফুলকি ছুটিতে থাকে। চকমকি ঠুকিয়া আগুন ধরান মানবসভ্যতার প্রথম যুগের কথা এবং সভ্যতার অগ্রগতির খুব বড় এক ঘটনা। গতির সাহায্যে তাপ উৎপাদনের এরূপ অগণিত উদাহরণ দেখা যায়। জেম্‌স্‌ ওয়াট্‌ আগুনে জলকে বাষ্প করিয়া বাষ্পের সাহায্যে ইনজিন চালাইয়াছিলেন। বাষ্পীয়, পেট্রল বা ডিজেল ইনজিন তোমাদের কাছে এখন খুব পরিচিত জিনিস। এগুলি তাপ হইতে গতি পাইবার এক একটি উদাহরণ।

এই সকল উদাহরণ হইতে দেখা যায় গতিশক্তি ও তাপে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ এবং উহাদের একটি হইতে অন্যটি পাওয়া যায়। ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করা যায় তাপ এক প্রকার শক্তি। ক্রমে আমরা তাপকে পদার্থের অণুর গতি- ও স্থিতিশক্তির সহিত সম্পর্কিত করিতে পারিয়াছি। বস্তু কঠিন, তরল বা বায়বীয়, যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন উষ্ণতা বাড়িলে (এতএব তাপযোগে) উহার অণুর গতিশক্তি বাড়ে। পদার্থের অবস্থা পরিবর্তনের সময় লীনতাপ যোগে প্রধানত উহার অণুর স্থিতিশক্তি বাড়ে। উষ্ণতা বৃদ্ধিতে গ্যাসের চাপ বৃদ্ধি, হঠাৎ চাপনে গ্যাসের উষ্ণতা বৃদ্ধি বা হঠাৎ চাপ কমানয় গ্যাস ঠাণ্ডা হওয়া, উদ্বায়ী তরলের বাষ্পনে তরল ঠাণ্ডা হওয়া—এগুলি অণুর গতিশক্তির সঙ্গে তাপের সম্পর্কের উদাহরণ।

তাপশক্তি সংজ্ঞা দিতে আধুনিক বিজ্ঞানীরা বলেন **'উষ্ণতার প্রভেদ থাকিলে উষ্ণতর বস্তু হইতে যে শক্তি শীতলতর বস্তুতে সঞ্চালিত হয়, তাহাই হইল তাপশক্তি'**। শীতলতর বস্তুতে এইভাবে যে তাপশক্তি প্রবেশ করিল তাহাকে তার তাপ বলা হয় না। তাহা সাধারণত বস্তুর অণুগুলির গতি- ও স্থিতিশক্তিতে পরিণত হয়। এই কথাগুলি বুঝাইবার জন্য সহজ একটি উদাহরণ দেওয়া হয়। ধর মেঘ হইতে নদীতে বৃষ্টি পড়িতেছে। জলবিন্দুগুলিকে ততক্ষণই আমরা বৃষ্টি বলি

যতক্ষণ উহারা পড়িতে থাকে। নদীতে পড়িয়া উহারা নদীর জলে মিশিয়া যায়। তখন আর আমরা উহাদের নদীর জল হইতে পৃথক করিতে পারি না এবং উহাদের বৃষ্টিও বলি না।

আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে "উষ্ণতার প্রভেদ চলন্ত শক্তিই হইল তাপশক্তি।" চলা, অর্থাৎ তাপ সঞ্চালন, শেষ হইলে উহা আর তাপ নয়; উহা অন্য কোন প্রকার শক্তিতে পরিণত হইয়াছে।

প্রশ্ন। তাপকে আমরা শক্তি বলিয়া মনে করি কেন? আধুনিক বিজ্ঞান তাপ শক্তিকে কি প্রকার শক্তি মনে করে

II-5.3. কার্যের (Work-এর) সহিত তাপের সম্পর্ক। কার্যের সঙ্গে তাপের সম্পর্ক আছে একথা আগে অনেক মনীষীর মনে আসিয়া থাকিলেও, 1798 খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীর ব্যাভেরিয়া প্রদেশের যুদ্ধমন্ত্রী কাউন্ট রামফোর্ড (Count Rumford) প্রথম স্পষ্টভাবে ইহা দেখান। তিনি তখন লোহার বিঁধ (drill)-এর সাহায্যে পিতলের কামান ছেঁদা করার কাজ তদারক করিতেছিলেন। তিনি দেখিতে পান বিঁধ চলা কালে কামান ক্রমশ গরম হয়। বিঁধে চাঁছা পিতলের সরু ফালিগুলি ফুটন্ত জলের চেয়েও বেশী গরম হয়। কামানের ছেঁদা করার অংশ এবং বিঁধ জলে ডুবাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া বিঁধ চালাইতে থাকিলে তিনি দেখেন জল ক্রমশ উষ্ণ হইতেছে; আড়াই ঘণ্টা পরে সে জল ফুটিয়া ওঠে; বিঁধ চালান হইতেছিল ঘোড়ার সাহায্যে।

তাঁহার মনে প্রশ্ন জাগে 'জল গরম হইবার এত তাপ আসে কোথা হইতে'? সে সময়ে প্রচলিত ধারণা ছিল তাপ এক প্রকার অদৃশ্য ও প্রায় ভারহীন কিছু; ইহার নাম দেওয়া হইয়াছিল ক্যালরিক (Caloric)। বস্তুতে ক্যালরিক প্রবেশ করিলে উহা উষ্ণ হয়, এবং বাহির হইয়া গেলে উহা শীতল হয়।

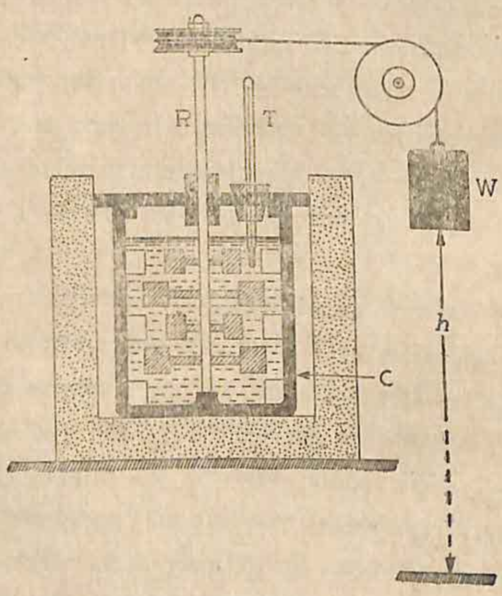
রামফোর্ডের মনে হইল কামানের পিতল হইতে যদি ক্যালরিক বাহির হইয়া আসে তাহা হইলে সমান ভর কামানের পিতলে ও ছেঁদার ভিতরের পিতলের গুঁড়া বা চাঁছা পিতলের সরু ফালিতে ক্যালরিকের মান সমান হইবে না। পরীক্ষা করিয়া পিতলের এই দুই অংশের তাপধারণ ক্ষমতায় (অর্থাৎ আপেক্ষিক তাপের) তিনি কোন প্রভেদ পান না। তাহা হইলে একমাত্র সম্ভাবনা হইল বিঁধ ঘোরায় তাপের উৎপত্তি। অতএব তাপ গতির সঙ্গে সম্পর্কিত, ইহাই তাঁহার সিদ্ধান্ত। আধুনিক ভাষায় আমরা বলিতে পারি বিঁধ ঘোরায় কার্য হয়, এবং এই কার্যই তাপে পরিণত হয়।

পরের বৎসর ইংলণ্ডে বৈজ্ঞানিক স্যার হামফ্রে ডেভি (Sir Humphrey Davy) বরফের চেয়ে ঠাণ্ডা বায়ুশূন্য আধারের ভিতরে দুই খণ্ড বরফ ঘষিয়া গলাইয়া প্রমাণ করেন

বরফের ঘর্ষণ হইতেই বরফ গলার লীন তাপ আসিয়াছে। এ ক্ষেত্রে তাপ আসিল ঘষার কার্য হইতে।

পরে ইংরেজ বৈজ্ঞানিক জেম্‌স্ প্রেস্‌কট্ জুল (James Prescott Joule, 1818-1889) কতটা কার্য করিলে কতটা তাপ পাওয়া যায় তাহা তখনকার দিনের যন্ত্রে যথা সম্ভব সূক্ষ্মভাবে মাপেন। তিনি দেখেন যে নির্দিষ্ট পরিমাণ কার্যকে সম্পূর্ণভাবে তাপে পরিণত হইতে দিলে সব সময়ই নির্দিষ্ট পরিমাণ তাপ পাওয়া যায়।

এখানে একটা কথা বলিয়া নেওয়া ভাল। জুলের আগে রামফোর্ড, ডেভি প্রমুখ মনীষীরা কার্য ও তাপের সম্পর্ক লইয়া যে সকল পরীক্ষা করিয়াছেন সেগুলি ছিল গুণগত (qualitative)। কার্য ও তাপে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে—ইহাই ছিল তাঁহাদের প্রতিপাদ্য বিষয়। সংখ্যাগত (quantitative) কোন মাপনে কার্যে ও তাপে সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা তাঁহারা করেন নাই। সে চেষ্টা প্রথম করেন জুল।



II-15 চিত্র

দশ বৎসর ধরিয়া নানাপ্রকার মাপনের ফল তিনি 1843 সালে প্রকাশ করেন। তাঁহার পরীক্ষাগুলির মধ্যে যান্ত্রিক কার্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করিয়া বিদ্যুৎশক্তিকে তাপে পরিণত করা, ঘর্ষণে করা কার্যকে তাপে পরিণত করা প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের কার্য ছিল। স্থিতি-শক্তিকে কার্যে পরিণত করিয়া তাহাতে উৎপন্ন তাপ মাপনের ব্যবস্থা জুল যে ভাবে করিয়াছিলেন তাহার আভাস II-15 চিত্রে দেখান হইল। W ভার h উচ্চতা হইতে

মাটিতে পড়িতে Wh পরিমাণ কার্য করে। তাহাতে R দণ্ডে আবদ্ধ পাতগুলি ঘোরে ও C পাত্রস্থ জলের সঙ্গে ঘর্ষণে তাপ উৎপন্ন করে। পাত্রস্থ জলের ভর ও উষ্ণতা মাপিয়া উৎপন্ন তাপের পরিমাণ পাওয়া যায়। তাপ যাহাতে C পাত্র হইতে বাহির হইয়া যাইতে না পারে তাহার যথাসম্ভব ব্যবস্থা করা হয়। যথেষ্ট তাপ পাইতে W-কে বার বার উপরে তুলিয়া ছাড়িতে হইয়াছিল। ইহাতে জলের উষ্ণতা আস্তে আস্তে বাড়ে। T থার্মমিটার উষ্ণতা মাপে।

জুলের পরেও বহু বৈজ্ঞানিক নানা উপায়ে ও অনেক সূক্ষ্মভাবে কার্য ও তাপের সংখ্যাগত সম্পর্ক মাপিয়াছেন। যে পরিমাণ কার্যে এক একক তাপ পাওয়া যায় তাহাকে তাপের 'যান্ত্রিক তুল্যাঙ্ক' (Mechanical equivalent of heat) বা জুলের নামানুসারে 'জুলের তুল্যাঙ্ক' (Joule's equivalent) বলে। ইহার মান প্রতি ক্যালরি তাপে 4·185 বা মোটামুটি 4·2 জুল। এই তুল্যাঙ্ককে J অক্ষর দিয়া নির্দেশ করা হয়, এবং লেখা হয় তাপের যান্ত্রিক তুল্যাঙ্ক বা জুলের তুল্যাঙ্ক J=4·2 জুল/ক্যালরি। এককের বিভিন্ন পদ্ধতিতে কার্যের ও তাপের একাধিক একক প্রচলিত আছে। সেইসব এককে J-কে প্রকাশ করিলে J-র সংখ্যাগত মান আলাদা হয়, কিন্তু সবক্ষেত্রে কার্য ও তাপের অনুপাত একই থাকে।

ইনজিনে তাপ কার্যে পরিণত হয় ; তখন এক ক্যালরি তাপ হইতে 4·2 জুল কার্য পাওয়া যায়।

কার্যকে সম্পূর্ণভাবে তাপে পরিণত করা অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু প্রদত্ত খানিকটা তাপকে সম্পূর্ণভাবে কার্যে পরিণত করা যায় না, মাত্র উহার খানিকটাকে পারা যায়। ইহা প্রকৃতির নিয়ম, আমাদের যান্ত্রিক ব্যবস্থার ত্রুটি নয়। তাপকে কার্যে পরিণত করিতে একটি উষ্ণ ও একটি শীতল বস্তু দরকার। উষ্ণ বস্তু হইতে শীতল বস্তুতে যাইতে, উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকিলে তাপ অংশত কার্যে পরিণত হয়। বাষ্পীয়, পেট্রল বা ডিজেল ইনজিন এইরূপ ব্যবস্থা।

প্রশ্ন। তাপের সঙ্গে কার্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে ইহা কি ভাবে বুঝাইতে পার ? জুলের তুল্যাঙ্ক বলিতে কি বুঝায় ?

II-6. আলোর কথা ঃ দীপক (Sources of light)। এই বিভাগে আমরা আলো সম্বন্ধে কিছু বলিব। বাহিরের জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান আমরা প্রধানত চক্ষুর সাহায্যে পাই। আলো কি, উহা কি ভাবে এবং কত দ্রুত চলে উহার কি কি ধর্ম আছে।—এরকম অনেক প্রশ্ন মানুষের মনে বহুকাল হইতেই জাগিয়াছে। ইহাদের মধ্যে যেগুলির উত্তর সোজা সেগুলির কয়েকটি আমাদের আলোচ্য বিষয় হইবে।

দীপক (Source of light)। প্রথমেই ধর আলো আসে কোথা হইতে ?

যে সকল বস্তু হইতে আলো বাহির হয় তাহাদের আমরা 'দীপক' বা 'আলোর উৎস' বলি। সূর্য, তারা, প্রদীপ, জোনাকি—ইহারা সকলেই আলো দেয়, ইহাদের প্রত্যেকটিই দীপক। গাছপালা, বাড়িঘর, বইয়ের এই পাতা, দেওয়াল—এগুলি আলো দেয় না। কোন দীপক হইতে উহাদের উপর আলো পড়িলে উহাদের আমরা দেখিতে পাই।

কোন বস্তুকে দীপক বলা হইবে কি হইবে না তাহা উহার উষ্ণতা এবং উহার উপাদানের উপর নির্ভর করে। দীপকগুলিকে আমরা প্রধানত তিন শ্রেণীতে ভাগ করিতে পারি।

(১) ভাস্বর দীপক (Incandescent sources)। যথেষ্ট উষ্ণ করিতে পারিলে সকল বস্তু হইতেই আলো বাহির হইতে পারে। বিজলীবাতির তার দিয়া যতক্ষণ বিদ্যুৎ-ধারা প্রবাহিত হইয়া উহাকে উষ্ণ না করে ততক্ষণ উহা দীপক নয়। লোহার সিক জ্বলন্ত উনানে ঢুকাইলে কিছুক্ষণের মধ্যেই উহা উত্তপ্ত হইয়া লালচে আলো দেয়। তাপে অন্তত প্রায় 800°C পর্যন্ত উষ্ণ হইলে যে কোন কঠিন বস্তু বা তরলধাতু আলো দেয়। তখন ইহাদের দীপক বলিতে পারি। কেবল উষ্ণতার জন্য যে সকল বস্তু হইতে আলো বাহির হয় তাহাদের 'ভাস্বর বস্তু' (Incandescent bodies) বলে। উষ্ণতা বাড়িলে আলোর রং বদলায়। রং প্রথমে লাল, পরে কমলা, হলদে ও ক্রমে আরও বেশী উষ্ণতায় সাদা হয়। সূর্য ও তাহার আলো আসে অত্যন্ত উষ্ণ গ্যাস হইতে। প্রদীপের আলো আসে দীপশিখার ভিতরে জ্বলন্ত ভাস্বর অতি ছোট অঙ্গার কণা হইতে। প্রদীপের ধোঁয়া হইল যে অঙ্গার কণাগুলি জ্বলে নাই তাহারা। ভাস্বর দীপক দীপকের এক শ্রেণী।

(২) নিম্নচাপ গ্যাসে বিদ্যুৎ ক্ষরণজনিত দীপক (Electric discharge lamps)। সব দীপকই ভাস্বর নয়, অর্থাৎ উষ্ণতার জন্য আলো দেয়, তাহা নয়। শহরে রাত্রে রঙ-বেরঙের নানারকম উজ্জ্বল বিজ্ঞাপন দেখা যায়। সিনেমার বাহিরে এগুলি প্রায় সকলেই দেখিয়াছ। সাধারণ ভাষায় এগুলিকে নিয়ন (Neon) আলো বলে। রেলস্টেশনে, রাস্তায়, দোকানে, অনেক বাড়িতে প্রায় দু ইঞ্চি মোটা লম্বা নলে বৈদ্যুত আলোও অনেকে দেখিয়া থাকিবে। ইহাদের টিউব-লাইট (Tube light) বা ফ্লুওরেসেন্ট লাইট (Fluorescent light) বলে। গায় হাত দিলে নিয়ন আলো বা টিউব লাইটের উষ্ণতা যে কম তাহা বুঝিতে পারিবে। ইহাদের আলো উষ্ণতার জন্য নয়। ঐ সকল নলে অল্পচাপে নিয়ন বা অন্যান্য গ্যাস থাকে। ঐ গ্যাসের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ-ধারা যাওয়ায় গ্যাস হইতে আলো বাহির হয়, গ্যাস বিশেষ উষ্ণ হয় না। বিদ্যুৎ-ধারার জোর বাড়াইলে আলোর ঔজ্জ্বল্য বাড়ে,

কিন্তু রং বদলায় না। বিভিন্ন গ্যাসে বিভিন্ন রং হয়। ইহারা আর এক শ্রেণীর দীপক। **ভাস্বরতায় ঔজ্জ্বল্য ও রং উষ্ণতার সঙ্গে সম্পর্কিত; কিন্তু শেষোক্ত শ্রেণীর দীপকে রং পদার্থের উপাদানের উপর অর্থাৎ গ্যাসের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে।**

(৩) রাসায়নিক ক্রিয়ায় সৃষ্ট দীপক। জোনাকি আলো, সামুদ্রিক নানা প্রকার জীবের দেহ হইতে নির্গত আলো রাসায়নিক ক্রিয়ার ফল বলিয়া আমরা মনে করি। এ সব ক্ষেত্রেও কম উষ্ণতায় আলো বাহির হয়। কোন কোন অজৈব রাসায়নিক ক্রিয়ায়ও এরকম হয়। বিশেষ প্রকার রাসায়নিক পদার্থ থাকায় এই আলো বাহির হয়। ইহারা আর এক শ্রেণীর দীপক এবং উপাদানের উপর নির্ভরশীল। আলো দিলেও এ জাতীয় দীপক আমরা ব্যবহার করি না।

*[বর্তমানে **'লেজার'** (**Laser**) নামে বিশেষ প্রকৃতির একপ্রকার দীপক উদ্ভাবিত হইয়াছে। ইহার প্রকৃতি আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। তবে জানিয়া রাখিতে পার লেজার হইতে অতি তীব্র আলো পাওয়া যায়, এবং সে আলো কেবল একদিকেই যায়, ছড়াইয়া পড়ে না। ইহার নানারকম আশ্চর্যজনক প্রয়োগ হইতেছে।]*

দীপক হইতে দীপ্তিহীন কোন বস্তুতে আলো পড়িয়া প্রতিফলিত হইয়া আমাদের চোখে প্রবেশ করিলে, তবেই বস্তুটিকে আমরা দেখিতে পাই। চাঁদের আলো সূর্য হইতে পড়া প্রতিফলিত আলো; চাঁদ আমাদের অর্থে দীপক নয়। শক্তিরূপী আলোকে দেখা যায় না।

আলোকরশ্মি (Ray of light)। দুটি কল্পনের সাহায্য নিলে আলোর ধর্মগুলি আলোচনা করিতে সুবিধা হয়। ইহাদের একটি হইল 'বিন্দু দীপক' (Point source) ও অন্যটি 'আলোকরশ্মি' (Ray)। গতিবিদ্যায় বস্তু ও কণার যে রকম সম্পর্ক (II-1 বিভাগ দেখ) বাস্তব ও বিন্দু দীপকেও সেই সম্পর্ক ; দীপকটি এত ছোট মনে করা হইতেছে যে উহা একটি বিন্দু দিয়া নির্দেশ করা যায়। তারাগুলি আমাদের কাছে বিন্দু দীপক ; অথচ উহারা পৃথিবীর চেয়ে আকারে লক্ষ লক্ষ গুণ বড়। কোন বাস্তব দীপকের সমানে অনচ্ছ (=অস্বচ্ছ) পর্দায় ছোট একটি ছেঁদা করিলে, সেই ছেঁদা দিয়া আলো বাহির হয়। এই ছেঁদাকে কার্যত বিন্দু দীপক মনে করা যায়।

আমাদের দ্বিতীয় কল্পন 'আলোকরশ্মি' (Ray)। বিন্দু দীপক হইতে আর একটি অনচ্ছ পর্দার ছোট একটি ছিদ্র দিয়া আলো আসিতে দাও। ইহা কতকটা দরজা বা জানালার সূক্ষ্ম কোন ছেঁদা দিয়া সূর্যের আলো ঘরে ঢোকার মত। ঘর অন্ধকার থাকিলে এবং ঘরের বায়ুতে যথেষ্ট ধূলিকণা থাকিলে ছেঁদা দিয়া আসা আলো কোন্ পথে যাইতেছে তাহা দেখা যায়। ঘরের বায়ুতে ধোঁয়া বা যথেষ্ট ধূলিকণা

থাকিলে বাস্তব ক্ষেত্রে এই পথ সোজা, সরু, উজ্জ্বল তারের মত দেখাইবে। কল্পনায় ছেঁদাটি এত ছোট মনে কর যে আলোর তার কার্যত যেন একটি রেখায় পরিণত হইয়াছে। কল্পিত এই রেখাটিকেই আমরা আলোকরশ্মি বলি; উহা আলোর গতিপথ নির্দেশ করে।

যে পদার্থের ভিতর দিয়া আলো যায়, তাহাকে আলোর 'মাধ্যম' (medium) বলে। রশ্মি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আমরা বলি 'কোন মাধ্যমে যে পথ ধরিয়া আলো এক বিন্দু হইতে অন্য বিন্দুতে যায় তাহাই আলোর রশ্মি'।

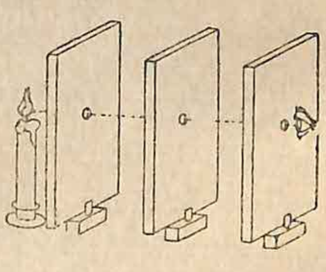
বাস্তব দীপক হইতে সবদিকেই আলো ছড়াইয়া পড়ে। কোন আলোচ্য ক্ষেত্রে দীপক হইতে বিশেষ কোন দিকে নির্গত রশ্মিগুচ্ছ আলোচনায় আমাদের সাহায্য করিতে পারে। এরূপ রশ্মিগুচ্ছকে আমরা আলোর 'কিরণ' (Beam of light) বলি।

প্রশ্ন (1) দীপকগুলিকে কয় শ্রেণীতে ভাগ করিতে পার? প্রত্যেক শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য দেখাইয়া উদাহরণ দাও।

(2) আলোক রশ্মি কাহাকে বলে? বিন্দু দীপক বলিতে কি বুঝায়?

II-6.1. আলোর প্রসারণ ও বেগ (Propagation and velocity of light)। যে মাধ্যমের উপাদান সব জায়গায় একরকম তাহাকে সমসত্ত্ব (homogeneous) মাধ্যম বলে। বায়ু, জল, কাঁচ প্রভৃতি সমসত্ত্ব। সমসত্ত্ব মাধ্যমে আলো সরলরেখায় চলে।

ইহার জন্য সহজ একটি পরীক্ষা করা যায়। একরকম তিনখানা টিনের পাতলা পাতের মাঝখানে পিনের সাহায্যে একটি করিয়া ছোট ছেঁদা কর। একগাছা সরু তার ছেঁদা তিনটির মধ্য দিয়া চালাইয়া তারগাছা টান করিয়া দুদিকে বাঁধ। ইহাতে ছেঁদা তিনটি এক সরলরেখায় থাকিবে। তারপর টিনের পাত তিনখানা তাহাদের নিজ নিজ জায়গায় আঁট করিয়া রাখ, এবং তারগাছা কাটিয়া আস্তে সরাইয়া লও। দেখিও এ সময়ে টিনের পাত কোনটি যেন না সরে। এখন ছেঁদা তিনটি এক সরল রেখায় আছে। প্রথম ছেঁদার বাহিরে মোমবাতি রাখিয়া (II-16 চিত্র) শেষ ছেঁদার মধ্য দিয়া বাতির দিকে তাকাইলে আলো দেখিতে পাইবে। কিন্তু টিনের পাতের একখানাও পাশের দিকে একটু সরাইলে আলো আর দেখিতে পাইবে না। পাত



II-16 চিত্র

পাশের দিকে সরাইলে ছেঁদা তিনটি এক সরলরেখায় থাকে না। ইহাতে বোঝা যায় আলো সরলরেখায় চলে। এখানে যে মাধ্যমে আলোর গতি দেখিলাম তাহা বায়ু; বায়ু সমসত্ত্ব মাধ্যম।

উপরের পরীক্ষা ছাড়া বিন্দু দীপকে স্পষ্ট ছায়া পড়া, পিন্-হোল্ (Pin-hole) ক্যামেরার ক্রিয়া (সপ্তম শ্রেণীর পাঠ্য) প্রভৃতি ঘটনা হইতেও আমরা সিদ্ধান্ত করি সমসত্ত্ব মাধ্যমে আলো সরলরেখায় চলে কারণ আলোর ঋজুগতি দিয়াই এই সকল ঘটনা ব্যাখ্যা করা যায়।

আলো সমসত্ত্ব মাধ্যমে সরলরেখায় চলে ও উহার গতিপথ রশ্মি আঁকিয়া দেখান হয়। রশ্মি নির্দেশক রেখায় দরকার হইলে একটি তীর চিহ্ন দিয়া গতির দিক্ বুঝান হয়।

আলোর বেগ। আলো কি বেগে দীপক হইতে ছড়ায় তাহা কল্পনা করাও শক্ত। আমরা জানিয়াছি শূন্যস্থানে, কার্যত বায়ুতেও, আলোর বেগ সেকেণ্ডে 3×10^8 মিটার $=3\times10^{10}$ সেমি/সে = প্রায় 186,000 মাইল/সে। আলো যদি পৃথিবীর গা ঘেঁষিয়া চলিতে পারিত তাহা হইলে এক সেকেণ্ডে উহা পৃথিবীর চারদিকে সাত পাকের বেশী ঘুরিত (পৃথিবীর পরিধি 4×10^7 মিটার)। সূর্য হইতে পৃথিবীতে আলো আসিতে সময় লাগে প্রায় আট মিনিট ; চাঁদ হইতে আসিতে লাগে এক সেকেণ্ডের একটু বেশী। পৃথিবী হইতে চাঁদের গড় দূরত্ব প্রায় $3{\cdot}84\times10^8$ মিটার। বিজ্ঞানী বর্তমানে আলোর বেগ অতি সূক্ষ্মভাবে মাপিয়াছেন। মাপনে ত্রুটি 3×10^6 ভাগে 1 ভাগেরও কম। পৃথিবী হইতে চাঁদে পাঠান 'লেজার' আলো চাঁদের পিঠে প্রতিফলিত হইয়া পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিতে যে সময় নেয়, তাহা মাপিয়া তিনি চাঁদের দূরত্ব এত সূক্ষ্মভাবে বলিতে পারেন যে সে মানে কয়েক মিটারের বেশী ত্রুটি থাকে না।

আলো এক বৎসরে যতদূর যাইতে পারে তাহাকে এক 'আলোকবর্ষ' (Light-year) বলে। এক আলোকবর্ষ = প্রায় $9{\cdot}4\times10^{15}$ মিটার। এ দূরত্ব কল্পনা করিতে পার ? আমাদের নিকটতম নক্ষত্র প্রায় চার আলোকবর্ষ দূরে। সৌরমণ্ডল ও এই নক্ষত্রের মধ্যে মহাশূন্য। আলো মহাশূন্যে চলিতে পারে, উহার জন্য বায়ু বা অন্য কোন বাস্তব মাধ্যম দরকার হয় না। বাস্তব মাধ্যমে আলোর বেগ কম। সে কথা পরে বলিব।

প্রশ্ন। সমসত্ত্ব মাধ্যমে আলো সরলরেখায় চলে ইহার সমর্থনে কি প্রমাণ দিতে পার ?
শূন্যস্থানে আলোর বেগ কত ? আলোকবর্ষ বলিতে কি বুঝায় ?

II-6.2. আলোর প্রতিফলন (Reflection of Light)। আলোর কিরণ কোন কঠিন বা তরল সমতল পৃষ্ঠে আপতিত হইলে উহার এক অংশ তল হইতে ফিরিয়া আসে। এই ফিরিয়া আসাকে 'প্রতিফলন' (Reflection) বলে। আয়না, জলতল, কাচের পাত হইতে প্রতিফলনের সঙ্গে তোমরা পরিচিত। পালিশ করা ধাতুপাত হইতে জোরাল প্রতিফলন হয়। কাচ বা জল হইতে প্রতিফলন কম। আয়নার পিছনে রূপার প্রলেপ দেওয়া থাকে; আয়নার জোরাল প্রতিফলন ঐ প্রলেপের জন্য।

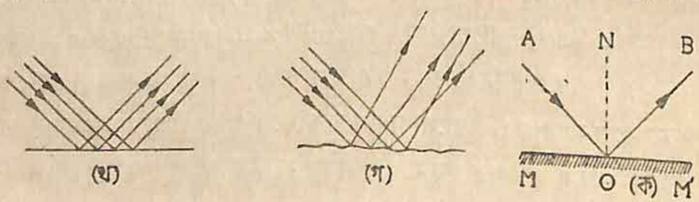
প্রতিফলন সংক্রান্ত ব্যাপার বর্ণনা করিতে কয়েকটি কথার সঙ্গে পরিচয় থাকা দরকার। II-17 (ক) চিত্রের সাহায্যে এগুলি আমরা বুঝিব। চিত্রে AO রশ্মি MOM' সমতলের O বিন্দুতে আপতিত হইয়া ধর যেন OB পথে ফিরিয়া গেল। AO রশ্মিকে 'আপতিত রশ্মি' (Incident ray), O বিন্দুকে 'আপতন বিন্দু' (Point of incidence) এবং OB রশ্মিকে 'প্রতিফলিত রশ্মি' (Reflected ray) বলে। O বিন্দুতে ON রেখা MOM' তলের অভিলম্বে টানা হইয়া থাকিলে ON-কে বলে 'আপতন বিন্দুতে টানা লম্ব' (Normal at the point of incidence)। AON কোণকে 'আপতন কোণ' (Angle of incidence) ও BON কোণকে 'প্রতিফলন কোণ' (Angle of reflection) বলে।

প্রতিফলনে আলোক রশ্মি দুইটি নির্দিষ্ট নিয়ম মানিয়া চলে; ইহাদের 'প্রতিফলনের সূত্র' (Laws of reflection) বলে। সূত্র দুইটি হইল—

(১) আপতিত রশ্মি, প্রতিফলিত রশ্মি ও আপতন বিন্দুতে টানা অভিলম্ব, এই তিনটি একই সমতলে থাকে। [এই তলকে 'আপতন তল' (Plane of incidence) বলে। II-17 (ক) চিত্রে কাগজের তলই আপতন তল।]

(২) প্রতিফলন কোণ আপতন কোণের সমান। ($\angle AON = \angle BON$)

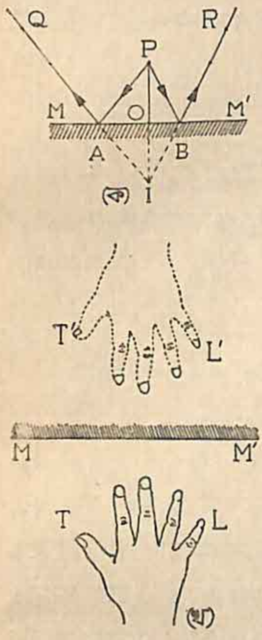
MOM' তল যদি আয়নার মত ভাল সমতল হয়, তাহা হইলে আপতিত কিরণের রশ্মিগুলি আপতনের আগে সমান্তরাল থাকিলে প্রতিফলনের পরেও সমান্তরাল থাকিবে



II-17 চিত্র

(II-17খ চিত্র)। MOM' তল তেমন মসৃণ না হইলে, ধর ঘরের দেওয়াল বা বইয়ের কাগজের মত হইলে, বিভিন্ন রশ্মিগুলি তাহাদের নিজ নিজ আপতন বিন্দুতে প্রতিফলনের

সূত্র মানিয়া বিভিন্ন দিকে ছড়াইয়া পড়িবে (II-17গ চিত্র)। প্রথম ক্ষেত্রে প্রতিফলনকে 'সুষম' (Regular) ও দ্বিতীয় ক্ষেত্রে উহাকে 'বিক্ষিপ্ত' (Diffuse) প্রতিফলন বলে। সুষম প্রতিফলনের জন্য দরকার মত পালিশ করিয়া সমতলকে মসৃণ করিতে হয়।



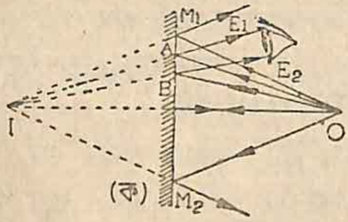
II-18 (ক) ও (খ) চিত্র

সাধারণ বস্তুর পিঠ কখনই যথেষ্ট মসৃণ হয় না বলিয়া উহাদের গা হইতে বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন হয় এবং সেই কারণেই উহাদের আমরা দেখিতে পাই। সিনেমার পর্দা হইতে বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন হয় বলিয়াই সিনেমা হলের যে কোন জায়গা হইতে ছবি দেখিতে পাওয়া যায়। আয়নায় যাহা দেখ তাহা সুষম প্রতিফলনে গঠিত বিম্ব। সিনেমার পর্দার বদলে আয়না রাখিলে হলের খুব কম লোকই পূর্ণ ছবি দেখিতে পাইতেন।

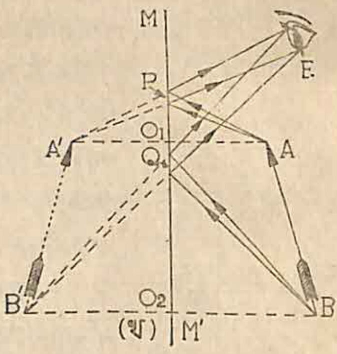
প্রতিফলনে বিম্ব কিভাবে গঠিত হয় তাহা বুঝিবার চেষ্টা করা যাক। II-18 (ক) চিত্রে P যেন একটি বিন্দু দীপক। MOM' সমতল দর্পণে আপতিত PAQ ও PBR রশ্মি দুটি দেখ। প্রতিফলিত রশ্মি দুটি পিছন দিকে বাড়াইয়া দিলে উহারা I বিন্দুতে ছেদ করে। এই I বিন্দুই P বিন্দুর বিম্ব (Image)। প্রতিফলিত সব রশ্মিই I হইতে আসিতেছে বলিয়া মনে হইবে। PI যোগ করিলে উহা MOM'-কে যদি O বিন্দুতে ছেদ করে তবে, আপতন কোণ ও প্রতিফলন কোণ সমান বলিয়া, জ্যামিতির সাহায্যে সহজেই দেখান যায় PI MOM'-তলের লম্ব এবং PO=PI। শেষের সম্পর্কটি হইতে বলা যায় দর্পণ হইতে লক্ষ্য বস্তু ও বিম্বের দূরত্ব সমান। **লক্ষ্যবস্তু সমতল দর্পণের যতটা সম্মুখে থাকে, উহার বিম্ব দর্পণের ঠিক ততটা পিছনে গঠিত হয়।** প্রতিফলন সংক্রান্ত ব্যাপারে এই ফলটি গুরুত্বপূর্ণ।

আয়নার সামনে দাঁড়াইলে ডান-বাঁ উলটাইয়া গিয়াছে মনে হয়, অর্থাৎ তোমার ডান দিককে বিম্বের বাঁদিক বলিয়া মনে হইবে। ইহার কারণ আয়না হইতে লক্ষ্যবস্তু ও বিম্বের দূরত্বের সমতা। II-18 (খ) চিত্রে MM' আয়না ও TL ডান হাতের পাঁচ আঙুল। বিম্ব সমান দূরত্বে গঠিত হয় বলিয়া TL-এর বিম্ব T'L' কেমন দেখাইবে তাহা ছবি হইতেই বুঝিতে পারিবে। $T'L^1$কে বাঁ হাতের পাঁচ আঙুল বলিয়া মনে হইবে। সমতল দর্পণে ডান বাঁ উলটাইয়া যাওয়াকে 'পার্শ্ব-পরিবর্তন' (Lateral inversion) বলে।

লক্ষ্য কোন বিন্দু হইতে প্রতিফলিত সরু, অপসারী (divergent) কিরণের সাহায্যে ঐ বিন্দুকে আমরা দেখিতে পাই। কিরণের রশ্মিগুলি বিম্ব হইতে আসিতেছে বলিয়া মনে হয় (II-19ক চিত্র) এবং উহাদের যেগুলি (E_1E_2) আমাদের চোখে প্রবেশ করে তাহাদের সাহায্যেই আমরা ঐ বিন্দু দেখি। লক্ষ্য বস্তুটি বড় হইলে উহার বিভিন্ন



II-19 (ক) চিত্র



II-19 (খ) চিত্র

অংশ কিভাবে দেখিতে পাই তাহা II-19 (খ) চিত্র হইতে বুঝিতে পারিবে। লক্ষ্য কর, বস্তুর বিভিন্ন অংশ হইতে আলো চোখে আসিতে আয়নার বিভিন্ন স্থান (PQ) হইতে উহা প্রতিফলিত হয়। এই কারণে ছোট আয়নায় নিজের সম্পূর্ণ চেহারা কখনও দেখিতে পাইবে না। সম্পূর্ণ দেখিতে হইলে আয়না লম্বায় অন্তত তোমার অর্ধেক হইতে হইবে।

আয়নায় প্রতিফলনে তুমি যদি কাহারও চোখ দেখিতে পাও তাহা হইলে, সে যেখানেই থাকুক না কেন, সেও তোমার চোখ দেখিতে পাইবে। ইহা কি ভাবে হইতে পারে ছবি আঁকিয়া বুঝিবার চেষ্টা কর। চোখের বদলে দুইটি বিন্দু ধরিয়া ছবি আঁক ; আপতন ও প্রতিফলন কোণ সমান হইবে মনে রাখিও।

প্রতিফলনে আপতিত রশ্মির দিক্ পরিবর্তিত হয় সহজেই বুঝিতে পার। রশ্মি লম্বভাবে আপতিত হইলে সেই পথেই ফিরিয়া আসিবে। এক্ষেত্রে আপতন ও প্রতিফলন কোণ কত ? তিনখানা সমতল আয়না পরস্পর সমকোণে (ঘরের মেঝে ও দুই পাশাপাশি দেওয়ালের মত করিয়া) রাখিলে, উহাদের যে কোন আয়নায় যে কোন দিক্ হইতে রশ্মি আপতিত হইয়া পর পর তিন আয়নায়ই যদি প্রতিফলিত হয় তবে রশ্মি যে পথে আসিয়াছে তাহার সমান্তরালেই ফিরিয়া যাইবে। বিশেষ কাজে এ রকম আয়নার ব্যবহার আছে। রাস্তায় কোথাও বাঁক থাকিলে বা পাহাড়ে রাস্তার পাশে কোথাও খাদ থাকিলে যদি রাস্তার পাশে এ রকম আয়না রাখা যায়

তাহা হইলে রাত্রে মোটর চালাইতে ঐ সব জায়গায় দুর্ঘটনা ঘটিবার সম্ভাবনা কমে কারণ গাড়ির আলো আয়নায় প্রতিফলিত হইয়া চালকের চোখে আসিয়া পড়ে বলিয়া তিনি সতর্ক হইতে পারেন। চাঁদে এই রকম কতকগুলি আয়না একসঙ্গে খানিকটা জায়গা জুড়িয়া রাখা হইয়াছে। পৃথিবী হইতে লেজার (Laser) রশ্মি উহাতে পড়িলে রশ্মি বিশেষ না ছড়াইয়া আবার পৃথিবীতেই ফিরিয়া আসিবে। আলোর যাতায়াতের সময় মাপিয়া চাঁদের দূরত্ব সূক্ষ্মভাবে জানা যায় তাহা একটু আগেই বলিযাছি।

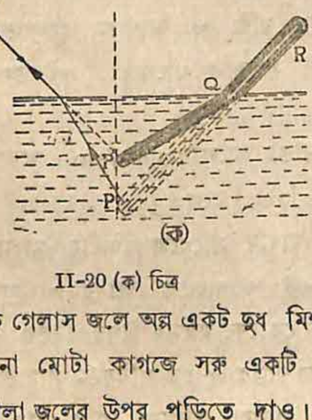
প্রশ্ন। আলোর প্রতিফলনের সূত্র দুটি বল, ও উহাতে ব্যবহৃত বিশেষ কথাগুলির অর্থ বুঝাও।

ছবি আঁকিয়া প্রতিফলনে গঠিত বিন্দুদীপকের বিম্বের অবস্থান দেখাও। উহা কোথায় গঠিত হয়? আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া ডান হাত তুলিলে বিম্ব বাঁ হাত তুলিয়াছে মনে হয় কেন?

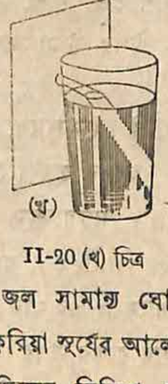
প্রতিফলনে কোন বিস্তৃত লক্ষ্য বস্তুর দুইটি বিভিন্ন বিন্দুকে যে যে আলোক কিরণে দেখিতে পাইবে, ছবি আঁকিয়া সেই কিরণের গতিপথ নির্দেশ কর।

আয়নায় লম্বভাবে আপতিত রশ্মি প্রতিফলনের পর কোন্ পথে যাইবে?

II-6.3. আলোর প্রতিসরণ (Refraction of light)। এক মাধ্যম হইতে অন্য মাধ্যমে প্রবেশ করিলে আলোর গতির দিক্ পরিবর্তন হয়। ইহাকে আলোর প্রতিসরণ (Refraction) বলে। প্রতিসরণের খুব সোজা পরীক্ষা নিজেই করিয়া দেখিতে পার। এক বালতি জলে একটু কাত করিয়া একটা সোজা কাঠি ঢুকাইয়া দিয়া পাশ হইতে কাঠির দিকে তাকাও। জল যেন স্থির থাকে। দেখিবে জলের বাহিরে ও জলের ভিতরে কাঠির অংশ এক সরলরেখায় নাই; জলে ঢুকিয়া কাঠি যেন হঠাৎ বাঁকিয়া গিয়াছে (II-20 (ক) চিত্র)। জল হইতে বায়ুতে প্রতিসরণের জন্য এরকম দেখায়।



II-20 (ক) চিত্র

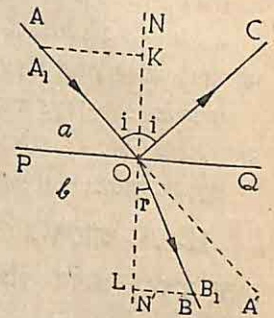


II-20 (খ) চিত্র

কাচের এক গেলাস জলে অল্প একটু দুধ মিশাইয়া জল সামান্য ঘোলাটে করিয়া নাও। একখানা মোটা কাগজে সরু একটি ছেঁদা করিয়া সূর্যের আলো সেই ছেঁদার ভিতর দিয়া ঘোলা জলের উপর পড়িতে দাও। চারদিকের বিক্ষিপ্ত আলো হইতে

গেলাসকে একটু আড়ালে রাখিতে পারিলে জলের ভিতরে সূর্য রশ্মির পথ দেখিতে পাইবে (II-20 খ চিত্র)। কাগজের ছেঁদা এই পথের সঙ্গে এক সরলরেখায় থাকে না। ছেঁদা উপর নিচ করিয়া দেখিতে পার ঘোলা জলে রশ্মির পথ কেমন বদলায়।

II-21 চিত্রের সাহায্যে আমরা প্রতিসরণ বর্ণনা করিতে পারি। চিত্রে a ও b দুই মাধ্যম। a মাধ্যমে চলিয়া AO রশ্মি দুই মাধ্যমের বিভেদ তল PQ-র O বিন্দুতে আপতিত হইয়াছে। ইহা আপতিত রশ্মি। NON′ রেখা O বিন্দুতে টানা PQ-র লম্ব। মনে কর b মাধ্যমে রশ্মির পথ হইল OB। b মাধ্যম না থাকিলে রশ্মি OA′ পথে যাইত। AON কোণ আপতন কোণ; ইহাকে আমরা i অক্ষর দিয়া নির্দেশ করিব। BON′ কোণ প্রতিসরণ কোণ; ইহাকে আমরা r অক্ষর দিয়া নির্দেশ করিব। OA রশ্মির উপর A_1 যে কোন একটি বিন্দু এবং A_1K ON-এর উপর লম্ব। অনুরূপে B_1 বিন্দু OB রশ্মির উপরস্থ যে কোন বিন্দু এবং B_1L ON′-এর উপর লম্ব। A_1K/OA_1 অনুপাতকে আপতন কোণের 'সাইন' (sine) বলে;



II-21 চিত্র

লেখা হয় $\sin i$। B_1L/OB_1 অনুপাতকে প্রতিসরণ কোণ r-এর 'সাইন' বলে; লেখা হয় $\sin r$। $OA_1 = OB_1$ করিয়া আঁকিলে $\sin i/\sin r = A_1K/B_1L$ হইবে।

প্রতিসরণ দুইটি নিয়ম মানিয়া চলে; উহাদের 'প্রতিসরণের সূত্র' বলে। সূত্র দুটি এই :

(১) আপতিত রশ্মি, প্রতিসৃত রশ্মি ও আপতন বিন্দুতে দুই মাধ্যমের বিভেদতলের উপর টানা লম্ব একই সমতলে থাকে। (এই তলকে 'আপতনতল' বলে।)

(২) নির্দিষ্ট দুই মাধ্যমে, নির্দিষ্ট রঙের আলোয় $\sin i/\sin r$ অনুপাত স্থির থাকে। [এই সূত্রকে 'স্নেলের সূত্র' (Snell's law) বলে।]

$\sin i/\sin r$ অনুপাতকে প্রথম মাধ্যম সাপেক্ষে দ্বিতীয় মাধ্যমের 'প্রতিসরাঙ্ক' (Refractive index) বলে। এই অনুপাতকে আমরা n অক্ষর দিয়া বুঝাইব। নির্দিষ্ট দুই মাধ্যমে n-এর মান আপতন কোণের মানের উপর নির্ভর করে না; করে কেবল আলোর রঙের উপর। বিভিন্ন রঙের n-এর পরিবর্তন সামান্যই। কাজেই স্থূল আলোচনায় এই পরিবর্তন উপেক্ষা করিয়া বলিতে পারি বায়ু সাপেক্ষে জলের

প্রতিসরাঙ্ক 1·33 এবং কাচের প্রতিসরাঙ্ক 1·5। জল সাপেক্ষে কাচের প্রতিসরাঙ্ক 1·5/1·33=প্রায় 9/8। মাধ্যমে পরিবর্তনে প্রতিসরাঙ্ক আলাদা হয়। জল হইতে বায়ুতে আলো প্রতিসৃত হইলে প্রতিসরাঙ্ক হইবে 1/1·33=0·75।

যখন প্রথম মাধ্যমের উল্লেখ থাকে না, তখন বুঝিবে উহা বায়ু বা বায়ুশূন্য স্থান সাপেক্ষে দ্বিতীয় মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্ক। বায়ুশূন্য স্থান সাপেক্ষে বায়ুর প্রতিসরাঙ্ক 1-এর চেয়ে অতি সামান্য বেশী। ইহা উপেক্ষা করিলে সাধারণ ক্ষেত্রে কোন ত্রুটি ঘটে না। পরে জানিবে প্রতিসরাঙ্ক $n=\frac{\text{প্রথম মাধ্যমে আলোর বেগ}}{\text{দ্বিতীয় মাধ্যমে আলোর বেগ}}$

কাচে $n=1·5$ হইলে বায়ুশূন্য স্থানে আলোর বেগ 3×10^8 মি/সে বলিয়া কাচে আলোর বেগ 2×10^8 মি/সে। জলে আলোর বেগ হিসাব কর।

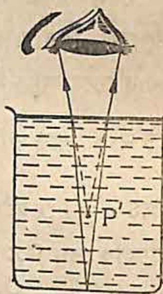
দুই মাধ্যমের যেটির প্রতিসরাঙ্ক বড় তাহাকে 'ঘনতর' আলোক মাধ্যম (optically denser medium) ও অন্যটিকে 'লঘুতর' আলোক মাধ্যম (optically lighter medium) বলে। বায়ু সাপেক্ষে জল ঘনতর আলোক মাধ্যম ; জল সাপেক্ষে কাচ ঘনতর আলোক মাধ্যম। এই ঘনত্বের সঙ্গে ভর সম্বন্ধীয় ঘনত্বের (একক আয়তন ভরের) কোন সম্পর্ক নাই। প্যারাফিন তেল জলের চেয়ে হালকা ; কিন্তু উহার $n=1·47$ হওয়ায় উহা জলের চেয়ে ঘনতর আলোক মাধ্যম।

II.21 চিত্র হইতে আমরা আরও দু-একটি বিষয় দেখিতে পারি। দুই মাধ্যমের বিভেদতলে আপতিত আলোর এক অংশ প্রথম মাধ্যমে আপতন কোণের সমান কোণে প্রতিফলিত হয় ; বাকী অংশ দ্বিতীয় মাধ্যমে প্রবেশ করে। আপতন কোণ বাড়িলে প্রতিফলিত অংশ বাড়ে। আপতন কোণ প্রায় 90°-র কাছাকাছি হইলে জোরাল প্রতিফলন হয়। পরিষ্কার একখানা কাচের পাতে প্রায় পাতের তলে চোখ রাখিয়া তাকাইলে দেখিবে প্রায় আয়নায় প্রতিফলনের মতই উজ্জল বিম্ব দেখা যাইতেছে।

দ্বিতীয়ত, n 1 অপেক্ষা বড় হইলে প্রতিসৃত রশ্মি আপতিত রশ্মির চেয়ে আপতন বিন্দুস্থ লম্বের বেশী কাছে আসিবে। II-21 চিত্রে $OA_1=OB_1$ হইলে $n=A_1K/B_1L$ হইবে ; ইহা হইতে কোন্ রশ্মি লম্বের কাছে কোন্‌টি দূরে বোঝা যায়। n 1-এর চেয়ে ছোট হইলে ইহার বিপরীত ক্রিয়া হয়। নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে n স্থির রাশি হওয়ায় $n=A_1K/B_1L$ হইতে আরও বোঝা যায় যে i বড় হইলে r-এর মানও বাড়িবে। $i=0°$ হইলে r-এর মানও 0° হয়। তা ছাড়া, রশ্মির বিচ্যুতি কোণ (angle of deviation) $i-r=\delta$ (গ্রীক অক্ষর, উচ্চারণ 'ডেলটা') i বাড়িলে বাড়ে। II-21 চিত্রে $\delta=i-r=\angle A'OB$।

প্রতিসরণের সাহায্যে কয়েকটি প্রাকৃতিক ঘটনার ব্যাখ্যা।

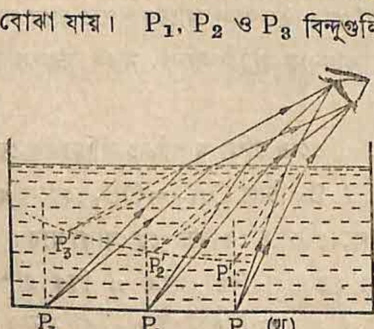
(১) জলভরা পাত্রের বা চৌবাচ্চার পাশে দাঁড়াইয়া খাড়াভাবে জলের নিচের দিকে তাকাও (II-21 (ক) চিত্র)। তলার P বিন্দু হইতে যে সরু আলোকে কিরণ উপরে জলের পিঠে আপতিত হইয়া বায়ুতে প্রতিসরণের পর তোমার চোখে ঢুকিবে তাহা P-র খানিকটা উপরে P বিন্দু হইতে আসিতেছে বলিয়া মনে হইবে। ইহার কারণ ঘনমাধ্যম জল হইতে লঘুমাধ্যম বায়ুতে প্রতিসরণে রশ্মি আপতন বিন্দুস্থ লম্ব হইতে দূরের দিকে সরে, অর্থাৎ আপতন কোণ হইতে প্রতিসরণ কোণ বড় হয়। চোখে প্রবিষ্ট রশ্মিগুলিকে পিছন দিকে বাড়াইরা দিলে উহা যেখানে পরস্পর ছেদ করে তাহাই লক্ষ্যবস্তুর অবস্থান বলিয়া মনে হয়। এই কারণে জলের গভীরতা আসলের চেয়ে কম দেখায়। হিসাবে পাওয়া যায় জলের ক্ষেত্রে আপাত গভীরতা আসল গভীরতার তিন চতুর্থাংশ।



II-22 (ক) চিত্র

ভিতরে বা নিচে ছবি-ওয়ালা কাচের কাগজ-চাপা দেখিয়া থাকিবে। উহার ছবি আসলে দৃষ্টিপথে কাচের পিঠ হইতে যত দূরত্বে আছে, ছবিতে দেখায় তাহার মাত্র দুই-তৃতীয়াংশ দূরত্বে। জল যে কারণে কম গভীর বলিয়া মনে হয়, এখানেও কারণ তাহাই। ছবি যেখানে আছে বলিয়া মনে হয় আসলে উহা আছে তাহার দেড়গুণ দূরত্বে।

(২) উপরে আলোচিত জলের চৌবাচ্চার দূরের দিকে তাকাইলে চৌবাচ্চার তলা দূরের দিকে ক্রমশ উচু বলিয়া মনে হইবে। ইহার কারণ II-22 (খ) চিত্রের সাহায্যে বোঝা যায়। P_1, P_2 ও P_3 বিন্দুগুলি হইতে যে আলোক রশ্মি প্রতিসৃত



II-22 (খ) চিত্র

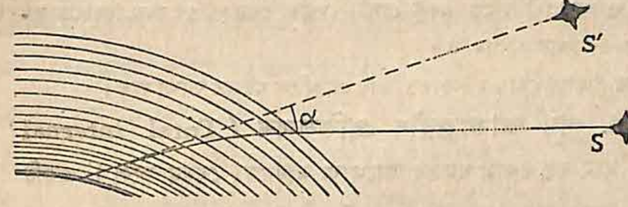
(P_1' P_2' ও P_3' যথাক্রমে P_1, P_2 ও P_3-র আপাত অবস্থান।)

হইয়া চোখে আসে, তাহারা যেখান হইতে আসিতেছে বলিয়া মনে হয় তাহাই বিন্দু-গুলির আপাত অবস্থান। বেশী দূরের বিন্দু হইতে আসা রশ্মির আপতন কোণ বড়

হওয়ায় উহারা বেশী বাঁকে বলিয়া উহাদের ছেদবিন্দু বেশী উপরে ওঠে ; এই কারণে চৌবাচ্চার তলা ক্রমে উঁচু ও একটু অবতল (Concave) বলিয়া মনে হয়।

উপরোক্ত (১) ও (২)-এ বর্ণিত কারণে, সমান গভীর জলে দাঁড়াইয়া থাকিলে পায়ের কাছের জল সব চেয়ে গভীর এবং দূরের জল অগভীর মনে হইবে। সম্পূর্ণ ঘটনাটি আপতন কোণ i-এর সঙ্গে বিচ্যুতি কোণ δ বাড়িবার ফল।

(৩) **বায়ুমণ্ডলে প্রতিসরণ (Atmospheric refraction)**। বায়ুমণ্ডলের নিচের দিকে বায়ুস্তর বেশী ঘন, এবং উপরের দিকে ক্রমশ লঘু। লঘুতর বায়ুর প্রতিসরাঙ্ক ঘনতর বায়ুর তুলনায় কম। কোন তারা হইতে যে আলো আমাদের



II-23 চিত্র

চোখে আসে তাহা বায়ুমণ্ডলে লঘুতর স্তর হইতে ঘনতর স্তরে প্রতিসৃত হইতে হইতে আসে (II-23 চিত্র)। ইহাতে রশ্মি ক্রমশ আপতন বিন্দুর লম্বের কাছে আসে এবং একটু বাঁকা পথে চলিয়া আমদের চোখে পৌঁছায়। এজন্য তারাটির আপাত অবস্থান S' আসল অবস্থান S-এর একটু উপরে থাকে, অর্থাৎ তারাটিকে যেখানে দেখা যায় আসলে তারাটি আছে তার চেয়ে একটু নিচে।

জ্যোতিষ্কের এরূপ কৌণিক সরণ (চিত্রের α কোণ) দিক্‌চক্রের (horizon-এর) কাছে সব চেয়ে বেশী। অস্তগামী সূর্য যখন দিক্‌চক্রকে স্পর্শ করিয়াছে দেখি, তখন সূর্য আসলে দিক্‌চক্রের একটু নিচে চলিয়া গিয়াছে। উদীয়মান সূর্যের নিচের দিক্ যখন দিক্‌চক্র রেখায় তখন সূর্য আসলে দিক্‌চক্রের একটু নিচেই আছে। এই কারণে সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আপাত সময় আসল সময়ের চেয়ে একটু বেশী হয়। তাছাড়া দিক্‌চক্রের কাছে সূর্যের উপরের প্রান্তের কৌণিক সরণ নিচের প্রান্তের কৌণিক সরণের চেয়ে একটু কম হয় বলিয়া উদয়ে ও অস্তে সূর্যকে একটু চেপটা দেখায় ; পূর্ণিমার চাঁদকেও।

(৪) উষ্ণ বায়ুর প্রতিসরাঙ্ক শীতল বায়ুর চেয়ে কম। টিনের চালের উপরের বায়ু দুপুরের রৌদ্রে উষ্ণ হইয়া উপরে ওঠে। এই বায়ুর ভিতর দিয়া আসিতে রশ্মির প্রতিসরণ হয়। উষ্ণ বায়ুপ্রবাহের আকার ও গতিপথ সম্পূর্ণ স্থির থাকে না। ফলে যে সকল বস্তু হইতে আলোর রশ্মি উহার মধ্য দিয়া আসে তাহাদের একটু কাঁপিতে

দেখা যায়। পিচ ঢালা রাস্তা, কংক্রীটের ছাদ প্রভৃতির উপরের বায়ুতেও প্রতিসরণের এরকম ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রশ্ন। প্রতিসরণ কাহাকে বলে? প্রতিসরণের সময় প্রতিফলনও হয় কি? প্রতিসরণের সূত্র দুটি বল, ও উহাতে ব্যবহৃত বিশেষ কথাগুলির অর্থ বুঝাইয়া বল।

প্রতিসরাঙ্ক কাহাকে বলে? 'কাচের প্রতিসরাঙ্ক 1·5'—এই উক্তিটি কি কি অর্থ বহন করে?

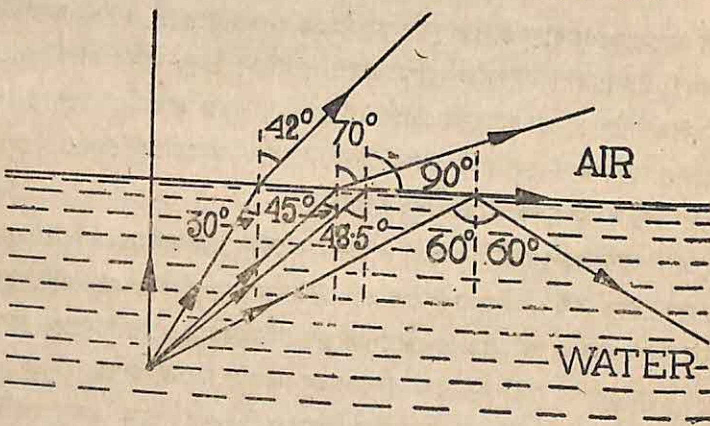
ঘনতর ও লঘুতর আলোক মাধ্যম বলিতে কি বুঝায়? প্রতিসরণের দুই মাধ্যমের কোন্‌টিতে রশ্মি আপতন বিন্দুস্থ লম্বের বেশী কাছে থাকে?

সমতল চৌবাচ্চায় জল থাকিলে দূরের দিকে চৌবাচ্চার তল ক্রমশ উঁচু ও একটু বাঁকা বলিয়া মনে হয় কেন? সমান গভীর জলে দাঁড়াইলে পায়ের কাছেই জল সব চেয়ে গভীর মনে হয় কেন?

উদীয়মান ও অস্তগামী সূর্যকে একটু চেপটা দেখায় কেন? সূর্য যখন দিক্‌চক্রে তখন উহা আসলে দিক্‌চক্রের নিচে—একথার তাৎপর্য কি?

প্রতিসরণের সাহায্যে তোমার ইচ্ছামত কোন প্রাকৃতিক ঘটনার ব্যাখ্যা দাও।

II-6. 4. পূর্ণ আভ্যন্তরীণ প্রতিফলন (Total internal reflection)। মনে কর কোন ঘনতর আলোক মাধ্যমে (যেমন জলে) একটি বিন্দুদীপক আছে এবং উহা হইতে আলোকরশ্মি বাহির হইয়া উপরস্থ লঘুতর আলোক মাধ্যম



II-24 চিত্র

[চিত্রে জল হইতে বায়ুতে প্রতিসরণ দেখান হইয়াছে। বায়ু সাপেক্ষে জলের প্রতিসরাঙ্ক 1·33। জলে 30° আপতন কোণে বায়ুতে প্রতিসরণ কোণ 42°, 45° আপতনে প্রতিসরণ 70°-তে, 48·5° আপতনে প্রতিসরণ 90°-তে। তাহার চেয়ে বড় কোণে, যেমন 60°-তে, আপতন হইলে সে রশ্মি পূর্ণ প্রতিফলিত হইয়া জলের ভিতরেই ফিরিয়া আসিবে।]

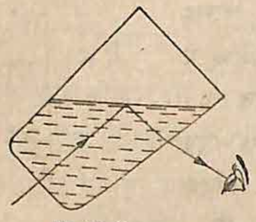
বায়ুতে প্রতিসৃত হইতেছে (II-24 চিত্র)। বায়ুতে প্রতিসরণ কোণ জলে আপতন কোণের চেয়ে বড়। আপতন কোণ যত বাড়িতে থাকে $\sin i/\sin r=$ স্থির রাশি বলিয়া r-ও বাড়িতে থাকে। r-এর মান 90°-র চেয়ে বড় হইতে পারে না।

ঘন মাধ্যমে যে আপতন কোণে লঘু মাধ্যমে প্রতিসরণ কোণ $r=90^\circ$ হয় তাহাকে 'সংকট কোণ' (Critical angle) বলে। এই কোণ আমরা θ_c (θ গ্রীক অক্ষর, উচ্চারণ 'থিটা') দিয়া বুঝাইব।

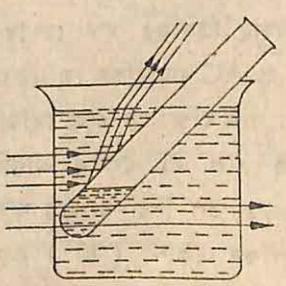
সংকটকোণে ঘনতর মাধ্যমে আপতন হইলে প্রতিসরণ কোণ 90° হইবে বলিয়া প্রতিসৃত রশ্মি দুই মাধ্যমের বিভেদ তল ঘেঁষিয়া বাহির হইবে। আপতন কোণ সংকট কোণের চেয়েও বড় হইলে কি হইবে? তখন আর প্রতিসরণ সম্ভব হয় না, কারণ r 90°-চেয়ে বড় হইতে পারে না। এরূপ আপতিত রশ্মি বিভেদতলে সম্পূর্ণভাবে প্রতিফলিত হইয়া ঘন মাধ্যমেই ফিরিয়া আসে; ইহার কোন অংশ লঘুমাধ্যমে প্রবেশ করে না। এই ঘটনাকে **পূর্ণ আভ্যন্তরীণ প্রতিফলন** বা সংক্ষেপে **'পূর্ণ প্রতিফলন' (Total reflection)** বলে।

লঘুমাধ্যম সাপেক্ষে ঘন মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্ক n হইলে $\sin 90^\circ/\sin \theta_c = n$ বা $\sin \theta_c = {}^1/n$ হইবে। দেখা যায় সংকটকোণ θ_c-র মান n-এর উপর নির্ভর করে। n নির্ভর করে মাধ্যম দুটির প্রকৃতি ও আপতিত আলোর রঙের উপর। সংকটকোণও এগুলির উপর নির্ভর করে। রঙের ক্রিয়া এখন আমরা উপেক্ষা করিব বলিয়াছি। অতএব θ_c মাধ্যমের প্রকৃতি দিয়া নির্ধারিত হইবে। জল হইতে বায়ুতে প্রতিসরণে সংকটকোণ প্রায় $48{\cdot}5^\circ$। কাচ হইতে বায়ুতে $\theta_c=$ প্রায় 42°। কাচ হইতে জলে, প্রতিসরণে θ_c প্রায় 63°।

কয়েকটি উদাহরণ। (1) একটি ধাতব বলের গায়ে কেরোসিন শিখা হইতে মোটা করিয়া ভুসা জমিতে দাও। বলটি জলে ডুবাইয়া উজ্জ্বল, বিক্ষিপ্ত আলোয় রাখিলে বলের গা রূপার মত ঝকঝক করিতে দেখা যাইবে। বলের গায়ে জমা ভুসার ফাঁকে ফাঁকে বায়ুকণাও বদ্ধ হইয়াছে। জল হইতে এই বায়ুকণাগুলিতে পূর্ণ প্রতিফলন ঘটায় বল ঝকমক করে।



II-25 চিত্র



II-26 চিত্র

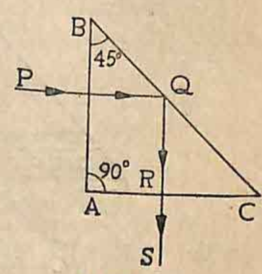
(2) তলা সমতল এমন একটি কাচের গেলাসে খানিকটা জল নিয়া গেলাসটি চোখের কিছু উপরে তুলিয়া আস্তে আস্তে কাত করিলে (II-25 চিত্র) এক সময়ে

জলতল উজ্জ্বল দেখাইবে। তলা দিয়া আসা আলো জলতলে পূর্ণ প্রতিফলিত হওয়ায় জলতল উজ্জ্বল দেখায়। গেলাসের তলায় অবস্থিত বস্তু জলতলে প্রতিফলিত হয়। গেলাসে একখানা চামচ ডুবান থাকিলে পূর্ণ প্রতিফলনের সময় চামচের যে অংশ জলের বাহিরে থাকে তাহা দেখা যায় না।

(3) ঘরের ভিতরে একটি কাচের পাত্রে জল ভরিয়া এক মুখ বন্ধ ফাঁপা একটি কাচের নল তেরছা করিয়া জলে ডুবাও (II-26 চিত্র)। বাহির হইতে আয়নার সাহায্যে সূর্যের আলো পাত্রে ফেল। এখন উপর হইতে নলের ডুবান অংশের দিকে তাকাইলে নলের গায়ে লম্বালম্বি একটা অংশ রূপালি রেখার মত ঝকঝক করিতেছে দেখিতে পাইবে। নল যথেষ্ট তেরছা থাকিলে জলের ভিতর নলের গায়ে সূর্যের আলোর আপতন কোণ সংকট কোণ 48·5°-র চেয়ে বড় হইবে, এবং সে আলো নলের ভিতরের বায়ুতে প্রতিসৃত না হইয়া পূর্ণ প্রতিফলিত হইয়া উপরের দিক্ দিয়া বাহির হইবে। এই কারণে নলের গায়ে লম্বা রূপালি রেখা দেখা যাইবে। নলে জল ভরিলে জল হইতে নলের বায়ুতে প্রতিসরণের কোন প্রশ্ন থাকিবে না, এবং সূর্যের আলো পাত্র ও নল ভেদ করিয়া বাহির হইয়া যাইবে। রূপালি রেখা পাইতে নলটি একটু নাড়াচাড়া করিয়া ঠিক অবস্থায় আনিতে হইবে এবং রেখাটি খুঁজিতে তোমার চোখও একটু এদিক ওদিক সরাইতে হইতে পারে।

(4) তেশিরা কাচ বা প্রিজ্‌ম্ (Prism) কেহ কেহ দেখিয়া থাকিবে। ইহা তে-কোনা একখণ্ড কাচ এবং ইহার তিনটি শির বা ধার তিনটি সমতলের ছেদরেখা। সাধারণ প্রিজ্‌মে সমতলগুলি পরস্পরের সঙ্গে 60° কোণে থাকে। উপর হইতে প্রিজ্‌মের দিকে তাকাইলে উহার উপরটা সমবাহু ত্রিভুজের মত দেখায়। ইহাকে 60° প্রিজ্‌ম্ বলে।

কিন্তু এরকম প্রিজ্‌ম্ বানান হয় যাহার সমতলগুলির মধ্যে এক কোণ সমকোণ ও অন্য কোণ দুইটি 45°। উপর দিক হইতে তাকাইলে ইহাকে দেখিতে সমকোণী সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের মত দেখায় (II-27 চিত্র)। AB বা AC বাহুবিশিষ্ট যে কোন তলের অভিলম্বে যে আলোক রশ্মি পড়ে তাহা সোজা প্রিজ্‌মে ঢুকিয়া অতিভুজ তলে 45° কোণে আপতিত হয়। এই রশ্মি অতিভুজ তল দিয়া বাহিরে যাইতে পারে না, কারণ আপতন কোণ (45°) কাচ হইতে বায়ুতে প্রতিসরণের সংকট কোণের (প্রায় 42°) চেয়ে বড়। এজন্য রশ্মি সম্পূর্ণ প্রতিফলিত হইয়া অন্য বাহুর তলে লম্বভাবে আপতিত হইয়া সোজা বাহির হইয়া যায়। অতিভুজ-তল



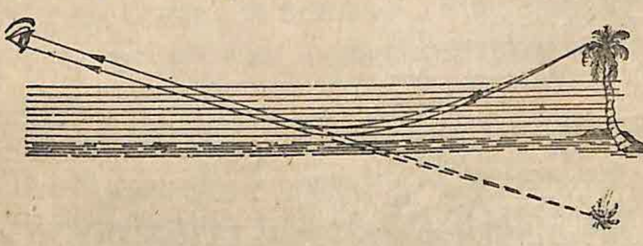
II-27 চিত্র

আয়নার মত কাজ করে। সাধারণ আয়নায় যতটা প্রতিফলন হয় এই প্রিজ্‌মের অতিভূজ-তলে প্রতিফলন হয় তাহার চেয়ে বেশী। তাই প্রতিবিম্বও বেশী উজ্জ্বল হয়।

এই প্রিজ্‌ম্‌কে পূর্ণ প্রতিফলক প্রিজ্‌ম্ (Total reflection prism) বলে। নানা আলোক যন্ত্রে ইহা ব্যবহৃত হয়।

পূর্ণ আভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের সাহায্যে কয়েকটি প্রাকৃতিক ঘটনার ব্যাখ্যা। (1) বায়ুসাপেক্ষে হীরার (diamond) প্রতিসরাঙ্ক 2·4। এজন্য হীরা হইতে বায়ুতে প্রতিসরণের সংকট কোণ হয় প্রায় 24·5°। হীরার পল (face)-গুলি এমনভাবে কাটা হয় যে বিভিন্ন পল দিয়া প্রবিষ্ট আলো অত ছোট সংকট কোণের জন্য হীরার ভিতরেই বার বার পূর্ণ প্রতিফলিত হইয়া শেষ পর্যন্ত মাত্র দু-একটি পল দিয়া বাহির হয়। ইহাতে ঐ পলগুলি হইতে আলো ঠিকরাইয়া বাহির হইতেছে মনে হয় এবং হীরাকে খুব উজ্জ্বল দেখায়। বাহিরের আলো অল্প হইলেও এই ঘটনা ঘটে। নানা দিক দিয়া প্রবিষ্ট আলো পূর্ণ প্রতিফলনে ভিতরেই থাকে, এবং বাহির হইবার সময় অল্প জায়গা দিয়া বাহির হওয়ায় ঔজ্জ্বল্য বেশী মনে হয়।

(2) মরীচিকা (Mirage)। মরীচিকা একরকম দৃষ্টি-বিভ্রম। ভূপৃষ্ঠ সংলগ্ন বায়ু উষ্ণ ও উহার উপরে বায়ুর উষ্ণতা উচ্চতার সঙ্গে দ্রুত হারে কমিতে থাকিলে মরীচিকা সৃষ্টির অনুকূল অবস্থা হয়। মরুভূমিতে দিনের বেলা বালুরাশি সূর্যকিরণে উত্তপ্ত হয়। হাওয়া না থাকিলে ইহাতে বায়ুর বিভিন্ন স্তর উপরের দিকের চেয়ে নিচের দিকে উষ্ণ থাকে বেশী। বায়ুর প্রতিসরাঙ্ক উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে কমে। এ অবস্থায়



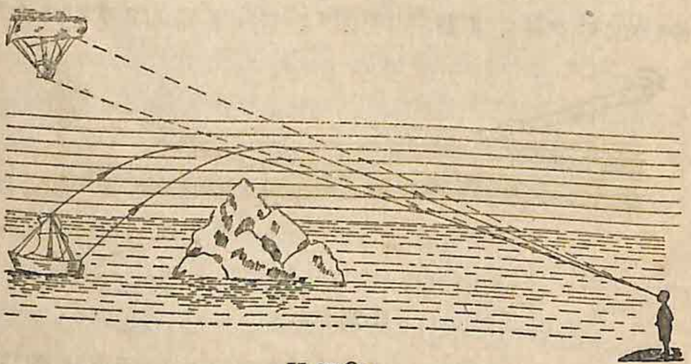
II-28 চিত্র

প্রতিসরাঙ্ক উপরের স্তরে বেশী ও তাহার নিচের স্তরে কম। ব্যাখ্যার সুবিধার জন্য ধরা যাক সমান উষ্ণ স্তরগুলি অনুভূমিক (II-28 চিত্র)। মেঘ বা গাছের মাথার মত দূরস্থ কোন বস্তু হইতে যে রশ্মি নিচের দিকে যায় তাহারা ঘনতর মাধ্যম হইতে লঘুতর মাধ্যমে প্রবেশ করে। ইহাতে রশ্মির প্রতিসরণ কোণ একটু একটু করিয়া বাড়িতে থাকে এবং রশ্মি ক্রমশ অনুভূমিক হইতে থাকে। তাহার কোন এক স্তরে রশ্মির পূর্ণ প্রতিফলন ঘটিয়া উহা আবার উপরের দিকে বাঁকিতে থাকে। এই রশ্মি

কোন দর্শকের চোখে পড়িলে তিনি রশ্মি সোজা পথে আসিতেছে মনে করিয়া মেঘ বা গাছের মাথা নিচের দিকে দেখিতে পাইবেন। তাঁহার মনে হইবে তিনি যাহা দেখিতেছেন তাহা জলতলে প্রতিফলিত বিম্ব। যেখানে জল নাই, সেখানে জল আছে তাঁহার এই বিভ্রম হইবে; ইহাই মরীচিকা। খোলা জায়গায় জলতল বায়ুতে একটু কাঁপে; ইহাতে জলে প্রতিফলিত বিম্বও কাঁপে। বালির সংস্পর্শে থাকা উষ্ণবায়ু একটু কাঁপিয়া কাঁপিয়া উপরে ওঠে বলিয়া ঐ বায়ুর ভিতর দিয়া আসা রশ্মিতে গঠিত বিম্বও একটু কাঁপে। ইহাতে দর্শকের বিভ্রম আরও বাস্তব বলিয়া মনে হয়।

পিচ ঢালা চওড়া রাস্তায় বৃষ্টির পর হঠাৎ গরমে কখন কখন এরকম মরীচিকা দেখা যায়।

বরফের রাজ্যে আর একরকম মরীচিকা হইতে পারে। এক্ষেত্রে ভূপৃষ্ঠের বায়ু খুব ঠাণ্ডা ও উপরের বায়ু ক্রমে বেশী উষ্ণ হইবে। নিচের বায়ুর প্রতিসরাঙ্ক বেশী, উপরে কম। খুব ঠাণ্ডা সমুদ্রে জাহাজ হইতে যে রশ্মি উপরের দিকে যায় তাহা ঘনতর মাধ্যম হইতে লঘুতর মাধ্যমে প্রবেশ করে। আগের মত এই রশ্মিও বাঁকে, (II-29 চিত্র), কিন্তু বিপরীত দিকে, এবং কোথাও ইহার পূর্ণ প্রতিফলন ঘটিতে পারে। এরূপ রশ্মি কোন দর্শকের চোখে পড়িলে তিনি জাহাজের প্রতিবিম্ব আকাশে দেখিতে পাইবেন।



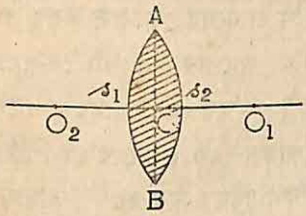
II-29 চিত্র

মরুভূমির মরীচিকাকে আমরা নিম্ন মরীচিকা (Inferior mirage) এবং পরে বর্ণিত মরীচিকাকে ঊর্ধ্ব মরীচিকা (Superior mirage) বলি।

প্রশ্ন। পূর্ণ আভ্যন্তরীণ প্রতিফলন কাহাকে বলে? উহা ব্যাখ্যা কর। সংকট কোণ কি? সংকট কোণের সঙ্গে ঘনতর মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্কের কি সম্পর্ক?

পূর্ণ প্রতিফলনের একটি উদাহরণ দাও। মরুভূমিতে মরীচিকা সৃষ্টি কি ভাবে হয়?

II-6.5. লেন্স্ (Lens)। ক্যামেরার লেন্সের সঙ্গে তোমাদের অনেকের পরিচয় আছে। লেন্স্ কি রকম বস্তু? একখণ্ড কাচের দুপাশকে যদি গোলক-তলের (spherical surface) আকার দাও তাহা হইলে উহাকেই লেন্স্ বলিব। II-30 চিত্র দেখ। ছবির s_1 ও s_2 বক্ররেখা দুইটি বৃত্তচাপ। s_1 চাপের কেন্দ্র O_1 এবং s_2 চাপের কেন্দ্র O_2। O_1O_1 রেখাকে অক্ষ করিয়া ছবিটি যদি এক পাক ঘুরাইয়া দাও তাহা হইলে s_1, s_2 রেখা দুইটি খানিকটা জায়গা ঘেরিয়া রাখিবে। এই রকম বদ্ধ আয়তনের রূপই হইল লেন্সের রূপ। ছবির ছায়া করা অংশ যেন কাচ, অর্থাৎ বদ্ধ আয়তন কাচের।

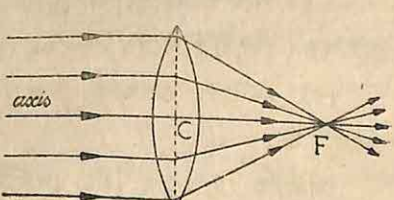


II-30 চিত্র

লেন্স্ নানারকমের হইতে পারে; চশমার লেন্সে ইহার পরিচয় পাও। কাচ ছাড়া অন্য স্বচ্ছ পদার্থ দিয়াও লেন্স্ গঠিত হইতে পারে। কিন্তু আমরা কেবল পেট মোটা, পাশ সরু লেন্সের কথাই আলোচনা করিব; ইহাকে 'উত্তল' (convex) বা 'অভিসারী' (convergent) লেন্স্ বলে। II-30 চিত্রে এই রকম লেন্স্ই বুঝান হইয়াছে। চিত্র লেন্সের মধ্যচ্ছেদ (principal section)। লেন্স্ বুঝাইতে সাধারণত উহার মধ্যচ্ছেদই আঁকা হয়। O_1 O_2 রেখা লেন্সের অক্ষ (axis)। লেন্সের কিনারা বৃত্তাকার এবং AB উহার ব্যাস। ABকে লেন্সের 'উন্মেষ' (aperture) বলে। সুবিধার জন্য আমরা লেন্সের উভয় পিঠের ব্যাস সমান ধরিব এবং ব্যাসের তুলনায় লেন্সের বেধ (thickness) উপেক্ষা করিব। AB রেখা O_1 O_2 অক্ষকে C বিন্দুতে ছেদ করে। C বিন্দুকে আমরা লেন্সের 'আলোক কেন্দ্র' (optical centre) বলিব।

এখানে আমরা লেন্সেই দুই রকম ক্রিয়া আলোচনা করিব—(ক) আলো ঘনীভূত-করণ ও (খ) বিম্বগঠন।

(ক) আলো ঘনীভূতকরণ (Focusing action of a lens)। মনে কর লেন্সের অক্ষের সমান্তরালে আলোর কিরণ আসিয়া লেন্সে পড়িল। কিরণের প্রত্যেক রশ্মি লেন্সের দুই বক্রতলে পর পর প্রতিসৃত হইয়া প্রতিসরণের নিয়ম অনুসারে অক্ষের দিকে বাঁকিবে এবং কিরণের সকল রশ্মি কার্যত অক্ষের একই বিন্দুতে সংহত হইবে (II-31 চিত্র)।



II-31 চিত্র

লেন্সে প্রতিসরণের পর অক্ষের যে বিন্দুতে অক্ষের সমান্তরাল কিরণের সব রশ্মিগুলি কার্যত সংহত হয়, তাহাকে লেন্সের **ফোকস** (Focus) বলে (II-31 চিত্রের F)। লেন্সের আলোক কেন্দ্র C হইতে ফোকসের দূরত্বকে লেন্সের **ফোকস-দূরত্ব** বা **ফোকস-দৈর্ঘ্য** (Focal length ; চিত্রের CF) বলে। আলোর আপতন লেন্সের যে পিঠেই হউক না কেন, উহার ফোকস-দূরত্ব একই। অতএব লেন্সের দু পাশে লেন্স্ হইতে সমান দূরে দুটি ফোকস থাকে। ফোকস-দূরত্ব লেন্সের দুই পিঠের ব্যাসার্ধের উপর নির্ভর করে। ব্যাসার্ধ কম হইলে ফোকস-দূরত্বও কম হয়। তাছাড়া ফোকস-দূরত্ব লেন্স্ পদার্থের প্রতিসরাঙ্কের উপর নির্ভর করে। প্রতিসরাঙ্ক বড় হইলে ফোকস দূরত্ব কম হয়।

এ ক্ষেত্রে দেখিতে পাইলাম উত্তল লেন্সের ক্রিয়া হইল আপতিত কিরণকে ঘনীভূত করা। ফোকসের চেয়ে আরও দূরে অবস্থিত যে কোন বিন্দু দীপক হইতে আপতিত আলোকেও লেন্স্ এক বিন্দুতে সংহত করিতে পারে। আতসী কাচ উত্তল লেন্স্। সূর্যকিরণকে ঘনীভূত করিয়া কাচ আলোকে অল্প জায়গায় আবদ্ধ করায় সেখানে উষ্ণতা বাড়ে বলিয়াই আতসী কাচ দিয়া আগুন ধরান যায়। লেন্সের উন্মেষ বড় হইলে আতসী লেন্সে বেশী আলো ধরা পড়ে এবং ফোকসে ঔজ্জ্বল্য ও উষ্ণতা বাড়ে।

(খ) বিম্ব গঠন (Formation of image by a lens)। ক্যামেরার কাজ সকলেই জান ; উহা দৃশ্য বস্তুর বিম্ব গঠন করে। ইহা লেন্সেরই ক্রিয়া। এই ক্রিয়া বুঝিতে হইলে কোন লক্ষ্য বিন্দু (Object point) হইতে আপতিত বিশেষ তিনটি রশ্মির আচরণ জানিলেই চলে। এই তিনটি রশ্মির যে কোন দুইটির সাহায্যে লেন্সে গঠিত বিম্বের অবস্থান ও আকার জানা যায়। রশ্মি তিনটির ধর্ম নিচে বলা হইল।

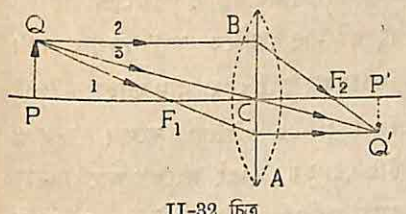
(১) এক ফোকস (F_1) হইতে আগত বা আসিতেছে বলিয়া মনে হইতেছে এমন কোন রশ্মির লেন্সে পড়িলে প্রতিসরণের পর উহা অক্ষের সমান্তরালে যায়।

(২) অক্ষের সমান্তরালে কোন রশ্মি আসিয়া লেন্সে পড়িলে উহা প্রতিসরণের পর অন্য (বিপরীত দিকের) ফোকস (F_2) দিয়া যায়।

(৩) লেন্সের আলোক কেন্দ্র দিয়া যে রশ্মি যায়, প্রতিসরণে তাহার গতিপথ বদলায় না।

লেন্সের যে কোন ক্রিয়া বুঝাইতে আমরা উহার মধ্যচ্ছেদ আঁকি, অক্ষ দেখাই ও দরকার মত রশ্মি টানি। তা ছাড়া, আঁকার সুবিধার জন্য উভয় তলে প্রতিসরণ না দেখাইয়া, দুই প্রতিসরণে রশ্মির মোট বিচ্যুতি (Deviation) লেন্সের মধ্যরেখায়

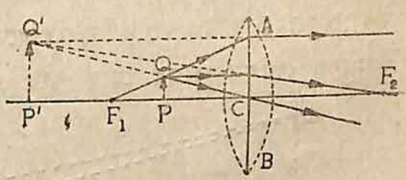
দেখান হয়। মধ্য রেখা বলিতে II.30 বা II-32 চিত্রের AB রেখা, অর্থাৎ আলোক কেন্দ্র অক্ষের অভিলম্ব রেখা বুঝিবে। লেন্সের আকার ও অবস্থান বুঝাইতে আমরা উহার দু পাশ ভাঙা রেখায় দেখাইব।



II-32 চিত্র

এই নিয়ম মানিয়া উপরে বলা (১), (২), (৩) রশ্মি তিনটির পথ II-32 চিত্রে দেখান হইয়াছে। চিত্রে F_1, F_2 দুটি ফোকস, C আলোক কেন্দ্র AB মধ্যরেখা এবং 1, 2, 3 যথাক্রমে (১), (২) ও (৩)-এ বর্ণিত রশ্মি।

লক্ষ্যবস্তুর বিম্বের অবস্থান পাইতে উহার এক প্রান্ত আমরা লেন্সের অক্ষে ও অন্যপ্রান্ত অক্ষের অভিলম্বে আছে বলিয়া ধরিব (II-32 চিত্র)। লক্ষ্যের মাথা (Q) হইতে উপরে বর্ণিত যে কোন দুটি রশ্মি টানিলে উহারা প্রতিসরণের পর যেখানে (Q) ছেদ করিবে তাহাই লক্ষের মাথার বিম্ব। এরূপ বিম্বকে 'বাস্তব' বা 'সৎ' বিম্ব (Real image) বলে (II-32 চিত্র)। কখনও এমন হয় যে রশ্মি দুটি প্রতিসরণের পর ছেদ করে না। তখন প্রতিসৃত রশ্মি দুটিকে পিছনে বর্ধিত করিলে উহারা যে বিন্দুতে ছেদ করে, তাহাকেই লক্ষ্যবস্তুর মাথার বিম্ব বলিয়া মনে হইবে। এরূপ বিম্বকে 'অলীক' বা 'অসৎ' বিম্ব (Virtual image) বলে (II-33 চিত্র)। **লক্ষ্যবস্তু লেন্স্ ও উহার ফোকসের মধ্যে থাকিলে অসদ্-বিম্ব গঠিত হয় এবং লক্ষ্যবস্তু লেন্সের যে পাশে থাকে অসদ্-বিম্ব সেই পাশেই গঠিত হয়।**



II-33 চিত্র

প্রশ্ন। (১) উত্তল লেন্স্ কাহাকে বলে? উহা কিভাবে আলো ঘনীভূত করে বুঝাইয়া বল। লেন্সের ফোকস ও ফোকস-দূরত্ব বলিতে কি বুঝায়?

(২) লেন্সের সাহায্যে লক্ষ্যবস্তুর বিম্ব কিভাবে গঠিত হয় ছবি আঁকিয়া দেখাও। বিম্বের অবস্থান পাইতে যে রশ্মি টানিলে তাহার ধর্ম কি বল।

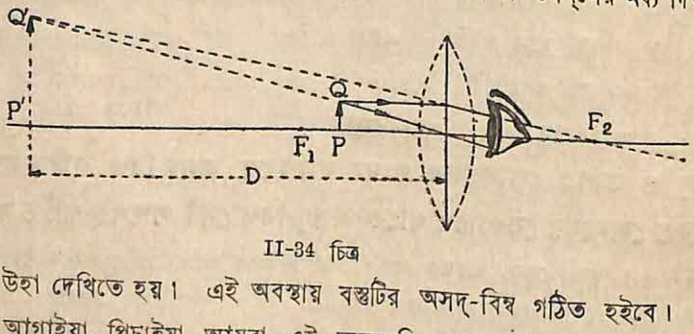
সৎ ও অসৎ বিম্ব কাহাদের বলে?

II-6.6. উত্তল লেন্সকে বিবর্ধক কাচ রূপে ব্যবহার (Convex lens as a magnifying glass)। কোন বস্তু আমাদের চোখে যে কোণ উৎপন্ন করে তাহার মান অনুসারে বস্তুটিকে আমরা আকারে ছোট বা বড় বলিয়া মনে করি। কোণ বড় হইলে আকারও বড় মনে হয়। একই বস্তু দূরে থাকিলে ছোট দেখায়, কাছে আসিলে

বড় দেখায়। দূরে থাকিলে চোখে উৎপন্ন কোণ ছোট ; কাছে আসিলে কোণ বড়। আকারে ছোট কোন বস্তুকে ভাল করিয়া দেখিতে উহাকে আমরা চোখের কাছে আনি, কারণ কাছে আনিলে উৎপন্ন কোণ বড় হয়, এবং বস্তুটি বড় ও স্পষ্ট দেখায়।

চোখের বেশী কাছে আনিলে উৎপন্ন কোণ বড় হইলেও বস্তুটিকে স্পষ্ট দেখায় না। চোখ হইতে যে দূরত্বে থাকিলে ছোট জিনিস যথাসম্ভব স্পষ্ট দেখা যায় তাহাকে 'স্পষ্ট দর্শনের অবম দূরত্ব' (Least distance of distinct vision) বলে। সুস্থ ও স্বাভাবিক চোখের ক্ষেত্রে এই দূরত্ব 25 সেন্টিমিটার ধরা হয়। এই অংশের আলোচনায় এই দূরত্বকে আমরা D অক্ষর দিয়া বুঝাইব। লক্ষ্য করিয়া দেখিও বই পড়ার সময় বই সাধারণত তোমার চোখ হইতে প্রায় এই রকম দূরত্বেই থাকে। বিভিন্ন লোকের ক্ষেত্রে D কিছু বিভিন্ন হয়, এবং বেশী বয়সে ইহার মান বাড়ে। কিন্তু আমরা এই বিভিন্নতা হিসাবে না লইয়া D = 25 সেমি ধরিব।

অনেক সময় খুব ছোট লেখা বা কোন বস্তুর ছোট অংশ (যেমন উদ্ভিদ্ বিদ্যায় ছোট ফুলের বিভিন্ন অংশ বা প্রাণীবিদ্যায় কোন কোন পোকার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ) আমাদের যথাসম্ভব স্পষ্ট করিয়া দেখা দরকার হয়। স্পষ্ট দর্শনের অবম দূরত্বে আনিয়াও প্রয়োজনীয় কাজ না হইতে পারে। তখন **হ্রস্ব ফোকস উত্তল লেন্সের সাহায্যে** উহাকে আমরা আরও বড় করিয়া দেখিতে পারি। ইহার জন্য বস্তুটিকে লেন্স্ হইতে লেন্সের ফোকস-দূরত্বের চেয়ে আর একটু কাছে রাখিয়া লেন্সের মধ্য দিয়া অক্ষ



II-34 চিত্র

বরাবর উহা দেখিতে হয়। এই অবস্থায় বস্তুটির অসদ্-বিম্ব গঠিত হইবে। লেন্স্ একটু আগাইয়া পিচাইয়া আমরা এই অসদ্-বিম্ব লেন্স্ হইতে স্পষ্ট দর্শনের অবম দূরত্বে গঠন করিতে পারি (II-34 চিত্র)। ইহাতে বস্তুটি সবচেয়ে স্পষ্ট দেখায়। ছবি আঁকার উপায় আগেই বলা হইয়াছে। বিম্ব বস্তুটির চেয়ে আকারে বড় হয়। এবং D দূরত্বে থাকিলে বস্তুটি চোখে যে কোণ (α) উৎপন্ন করিত, বিম্ব তাহার চেয়ে বড় কোণ (β) উৎপন্ন করে। এই কারণে বস্তুটিকে বড় এবং স্পষ্ট দেখায়। লেন্সের ফোকস-দূরত্ব f হইলে, β-কোণের সহিত α-কোণের অনুপাত $= \beta/\alpha = 1 + D/f$ হয়। এইভাবে ব্যবহৃত লেন্স্‌কে 'বিবর্ধক লেন্স্' (Magnifying glass বা Magnifying

lens) বলে ; $1+D/f$ উহার 'বিবর্ধন' (Magnification)। দেখা যায় f যত ছোট হইবে বিবর্ধন তত বাড়িবে। কম ফোকস-দূরত্বের লেন্সে বেশী বিবর্ধন হয়। লেন্স্ বুঝিয়া বিবর্ধন 8 – 10 হইতে পারে।

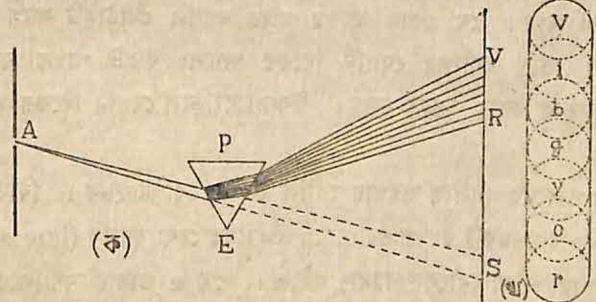
লক্ষ্যবস্তু লেন্সের ফোকসে রাখিয়াও বিবর্ধন পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে বিম্ব আরও দূরে গঠিত হয়, কিন্তু চোখে উৎপন্ন দুই কোণের অনুপাত হয় D/f ; ইহাই বিবর্ধন।

প্রশ্ন। উত্তল লেন্সের সাহায্যে ছোট জিনিস কিভাবে বড় করিয়া দেখা যায় ছবি আঁকিয়া দেখাও। অঙ্কন ব্যাখ্যা কর।

বিম্ব সৎ কি অসৎ ? এইভাবে ব্যবহৃত লেন্সের বিবর্ধন বলিতে কি বুঝায় ? বিবর্ধনের সঙ্গে লেন্সের ফোকস-দূরত্বের কিরূপ সম্পর্ক ?

স্পষ্ট দর্শনের অবম দূরত্ব কাহাকে বলে ? উহা কত ধরা হয় ?

II-6.7. আলোর বিচ্ছুরণ: বর্ণালি (Dispersion of light—Spectrum)। সূর্যের আলো বিভিন্ন রঙের সমষ্টি তাহা 1676 খ্রীষ্টাব্দে নিউটনই প্রথম দেখান। এ সংক্রান্ত মূল বিষয়টি আমরা তাঁহার পরীক্ষার সাহায্যেই বর্ণনা করিব। জানালার অনচ্ছ পর্দার ছোট একটি ছেঁদা (II-35 (ক) চিত্রের A) দিয়া অন্ধকার ঘরে সরু সূর্যকিরণ আসিতে দিয়া তিনি তাহাকে একটা সাদা পর্দার উপর পড়িতে দেন। ইহাতে পর্দার উপর পিন্-হোল্ (Pin-hole) ক্যামেরার মত ক্রিয়ায় সূর্যের গোলমত একটি বিম্ব গঠিত হয় (II-35 (ক) চিত্রের S)। একটু ধোঁয়ার সাহায্য নিলে AS কিরণের পথ স্পষ্ট এবং সাদা দেখায়। একমাত্র 60° কোণের



II-35 চিত্র

তেশিরা কাচ (Prism) P-র এক শির E নিচের দিকে রাখিয়া উহা AS কিরণের পথে ধরিলে আলোক কিরণ প্রিজ্মের দুই পিঠে পর পর প্রতিসৃত হইয়া S-এ না গিয়া পর্দায় S-এর অবস্থানের কিছু উপরে রঙীন আলোর পটি RV গঠন করিবে। ইহা লম্বায় S-এর চেয়ে বেশ বড়, কিন্তু চওড়ায় প্রায় সমান। নিউটন মনে করেন সূর্যের আলো নানা রঙের সমষ্টি এবং রঙীন RV পটি এই সকল বিভিন্ন রঙে গঠিত সূর্যের

বিম্ব বিভিন্ন রঙের বিম্বগুলি সম্পূর্ণ আলাদা না হইয়া আংশিক মিশিয়া গিয়া RV পটির সৃষ্টি করিয়াছে। II-35 (খ) চিত্রে ইহা বড় করিয়া দেখান হইয়াছে।

পর্দার RV অংশের কোথাও আর একটি ছেঁদা করিলে সেই ছেঁদা দিয়া যে রঙীন কিরণ বাহির হইয়া যায়, দ্বিতীয় কোন প্রিজ্‌মে তাহাকে প্রতিসৃত করিলে ছেঁদা যেখানে ছিল সেখানকার রং ছাড়া আর কোন রং পাওয়া যায় না।

এখানে প্রতিসরণের সাহায্যে সাদা আলোকে বিভিন্ন রঙে বিশ্লিষ্ট করা গেল। এরূপ ঘটনাকে আলোর 'বিচ্ছুরণ' (Dispersion) বলে। বিচ্ছুরণে রঙীন আলোর যে পটি গঠিত হয় তাহাকে আপতিত আলোর **বর্ণালি (Spectrum)** বলে। সূর্যের আলোর বর্ণালিতে আমরা সাধারণত সাতটি রং আছে বলিয়া ধরি। উহারা হইল বেগনি (Violet), নীল (Indigo), আসমানি (Blue), সবুজ (Green) হলদে (Yellow), কমলা (Orange) ও লাল (Red)। ইহাদের মধ্যে বেগনি আলো প্রতিসরণে বাঁকে সব চেয়ে বেশী, ও অন্যগুলি ক্রমান্বয়ে কম। বেগনির প্রতিসরাঙ্ক বেশী, অন্যগুলির ক্রমান্বয়ে কম। বেগনি থাকে প্রিজ্‌মের ভূমির দিকে ও লাল থাকে প্রিজ্‌মের শীর্ষের দিকে। II-35 চিত্রের VR-কে আমরা সূর্যের আলোর বিভিন্ন রঙে গঠিত A ছিদ্রের বিম্বও মনে করিতে পারি। সংক্ষেপে এই বর্ণালিকে 'বেনীআসহকলা' বা VIBGYOR বলে। সাতরঙের আদ্যক্ষর লইয়া কথা দুইটি গঠিত।

সকল দীপকেরই বর্ণালি আছে। বর্ণালির সাহায্যে দীপক সম্বন্ধে প্রচুর তথ্য জানিতে পারা যায়। যে কোন ভাস্বর বস্তুর বর্ণালি মোটামুটি আগে বলা সূর্যের বর্ণালির মত। তবে বর্ণালির বেগনি দিকের আলো কতটা পাওয়া যাইবে তাহা দীপকের উষ্ণতার উপর নির্ভর করে। উষ্ণতা বাড়িলে বেগনি দিকের আলো বেশী পাওয়া যায়।

মৌলিক পদার্থের গ্যাসীয় অবস্থার বর্ণালি উহার বৈশিষ্ট্যসূচক। বিভিন্ন মৌলের বর্ণালিতে বিশেষ কয়েকটি রং পাওয়া যায় ; উহাদের রেখা বর্ণালি (line spectrum) বলে এবং উহারা আসে মৌলের পরমাণু হইতে। সূর্য ও তারার বর্ণালিতে অবিচ্ছিন্ন বর্ণালির (continuous spectrum-এর) সঙ্গে এই রেখা বর্ণালিগুলিও পাওয়া যায়। ইহাতে সূর্য বা তারায় কি কি মৌল আছে তাহা জানা যায় সূর্যে আমাদের চেনা মৌলের পঞ্চাশটির বেশীর অস্তিত্ব আমরা সূর্যের বর্ণালি পরীক্ষা করিয়া জানিয়াছি। ইহা ছাড়া আরও অনেক তথ্য রেখা-বর্ণালির সাহায্যে জানা যায়।

বিচ্ছুরণ ও বর্ণালি সম্বন্ধে খানিকটা ধারণা পাইলে। এবার উহাদের মোটামুটি একটা সংজ্ঞা আমরা দিতে পারি। প্রতিসরণে (বা অন্য কোন উপায়ে) কোন

দীপকের আলোকে ঐ আলোর উপাদানভূত বিভিন্ন রঙে বিশ্লিষ্ট করিয়া বিভিন্ন দিকে বিক্ষিপ্ত করাকে বিচ্ছুরণ (Dispersion) বলে। দীপকের বিভিন্ন রঙের বিচ্ছুরিত আলো দিয়া গঠিত বিম্বসমষ্টিকে ঐ দীপকের বর্ণালি (Spectrum) বলে।

প্রশ্ন। সূর্যের বর্ণালি দেখাইবার একটি উপায় বর্ণনা কর। বর্ণালি ও বিচ্ছুরণের সংজ্ঞা দাও। VIBGYOR বলিতে কি বুঝায়?

বর্ণালি হইতে দীপক সম্বন্ধে আমরা কি তথ্য জানিতে পারি তাহার দু-একটি উদাহরণ দাও। কোন্ রঙের প্রতিসরাঙ্ক সবচেয়ে বেশী?

তৃতীয় অংশ

রসায়ন

III-1. ভূমিকা (Introduction)। বইয়ের প্রথম অংশে তোমরা পদার্থ ও শক্তি সম্বন্ধে অনেক কথা পড়িয়াছ। পদার্থ বহুপ্রকারের হইলেও রসায়ন পড়িয়া ক্রমশ জানিতে পারিবে পদার্থ যে রকমেরই হউক, উহা মাত্র অল্প কয়েকটি মৌলিক পদার্থে গঠিত। (মৌলিক পদার্থ কাহাকে বলে সে সম্বন্ধে কিছু ধারণা তোমাদের সপ্তম এবং অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্যেই দেওয়া হইয়াছে।)

পদার্থবিদ্যা ও রসায়নে আমরা পদার্থের গঠন, ধর্ম ও পরিবর্তনের কথা আলোচনা করি। দুই-এ প্রভেদ কি? যে পরিবর্তনে পদার্থের উপাদানের পরিবর্তন ঘটে সাধারণত তাহাকেই রসায়নের অন্তর্গত মনে করা হয়। এরকম পরিবর্তনকে **রাসায়নিক পরিবর্তন** (chemical change) বলে। যে পরিবর্তনে পদার্থের উপাদানের কোন পরিবর্তন ঘটে না সাধারণত তাহাই পদার্থবিদ্যার আলোচ্য। পদার্থ-বিদ্যার আর এক নাম 'ভৌতিকী'। এজন্য এরূপ পরিবর্তনকে আমরা **ভৌত পরিবর্তন** (physical change) বলিব। ভৌতধর্ম, রাসায়নিক ধর্ম কথাগুলি ঐ দুই প্রকার পরিবর্তন সংক্রান্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়।

বিশুদ্ধ পদার্থ (Pure substance)। রসায়নে আমরা প্রধানত 'বিশুদ্ধ' পদার্থ লইয়া আলোচনা করি। **যে পদার্থে একটি মাত্র মৌলিক বা যৌগিক উপাদান আছে তাহাই রাসায়নিক অর্থে বিশুদ্ধ পদার্থ।** উপাদানটি মৌলিক, যেমন গন্ধক, লোহা, অক্সিজেন ইত্যাদি, বা যৌগিক, যেমন জল, কোহল (alcohol), সোডিয়াম ক্লোরাইড হইতে পারে। (যৌগিক পদার্থ সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা তোমাদের অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্যে দেওয়া হইয়াছে।)

সর্বাংশ দেখিতে একরকম হইলেই সে পদার্থ বিশুদ্ধ তাহা বলা যায় না। চিনি বা নুনের দ্রবণের সর্বাংশ দেখিতে একরকম। কিন্তু এরূপ দ্রবণে দুইটি উপাদান আছে—জল ও চিনি, অথবা জল ও নুন। যে পদার্থের সর্বাংশ দেখিতে একরকম তাহাকে **সমসত্ত্ব** (Homogeneous) বলে। ভাল করিয়া তৈয়ারী সকল দ্রবণই সমসত্ত্ব; কিন্তু রাসায়নিক অর্থে উহাদের বিশুদ্ধ পদার্থ বলা চলে না। বায়ু সমসত্ত্ব; কিন্তু উহা প্রধানত নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন এই দুটি মৌলিক গ্যাসের মিশ্রণ। গয়না বানাইবার সোনা সমসত্ত্ব; কিন্তু উহা সোনা ও তামার মিশ্রণ।

যে পদার্থের বিভিন্ন অংশ একরকম নয় তাহাকে আমরা **অসমসত্ত্ব** (Heterogeneous) বলি। মাটি অসমসত্ত্ব; উহাতে বালি, কাঁকর প্রভৃতি বিভিন্ন পদার্থ আছে। দুধও অসমসত্ত্ব; উহাতে ননী, জল এবং জলে দ্রাবিত অনেক পদার্থ আছে।

পদার্থের বিশুদ্ধতা যাচাই করার একমাত্র উপায় উহার রাসায়নিক পরীক্ষা। রসায়ন সংক্রান্ত এই অংশে আমরা 'পদার্থ' বলিতে একমাত্র 'বিশুদ্ধ' পদার্থ ই বুঝিব।

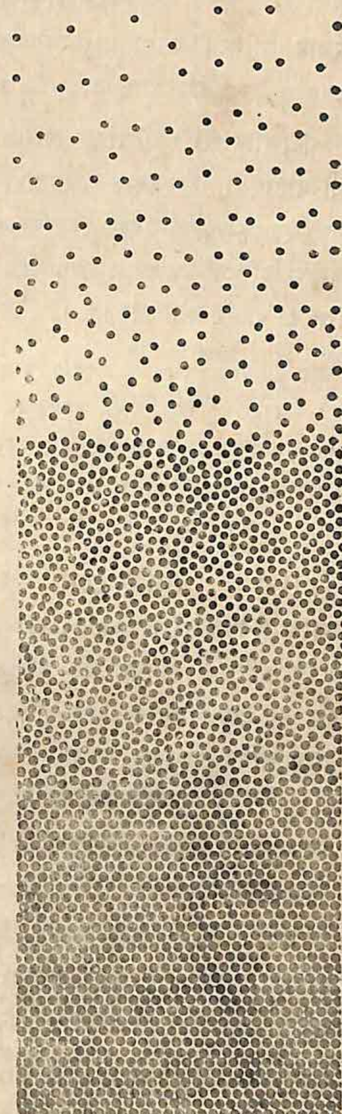
III-1.1. পদার্থের বিভিন্ন ভৌত অবস্থা—পদার্থ তিন অবস্থায় থাকিতে পারার কারণ (Physical states of matter—reasons for existence of the three states)। পদার্থ কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় (বায়বীয়) এই তিন অবস্থায় থাকিতে পারে। কোন্ পদার্থ ইহার কোন্ অবস্থায় থাকিবে তাহা উহার উষ্ণতা ও উপরস্থ চাপের উপর নির্ভর করে। একথা এই বইয়ের প্রথম অংশের 1-5 বিভাগে ও উহার উপবিভাগগুলিতে বলা হইয়াছে। কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় অবস্থা পদার্থের তিনটি ভৌত অবস্থা।

পদার্থ তিন অবস্থায় থাকিতে পারার কারণ।

(১) কঠিন অবস্থা। পদার্থের উপাদানভূত অণুগুলি পদার্থের কঠিন অবস্থায় দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ, সকল দিকেই একটি জ্যামিতিক সজ্জায় সাজান থাকে (III.1 ক চিত্র)। এই সজ্জা নানারকমের হইতে পারে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই অণুগুলির মধ্যে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ উভয়প্রকার বল ক্রিয়া করে। দুই বলের ক্রিয়ায় অণুগুলি নির্দিষ্ট উষ্ণতায় পরস্পর হইতে নির্দিষ্ট একটা দূরত্বে থাকে। কিন্তু স্বস্থানে উহারা স্থির না থাকিয়া অতিদ্রুত কাঁপিতে থাকে। কম্পনের জন্য অণুগুলির গতিশক্তি থাকে। একটা অবস্থা আসে যখন কম্পনের জোর বেশী হওয়ায় অণুগুলি স্বস্থানে থাকিতে পারে না এবং উহাদের জ্যামিতিক সজ্জা ভাঙিয়া যায়। ইহাই গলন এবং ইহাতে কঠিন অবস্থা হইতে পদার্থ তরলে পরিণত হয়।

(২) তরল অবস্থা। তরল অবস্থায় অণুগুলির কোন জ্যামিতিক সজ্জা থাকে না (III.1 খ চিত্র), কিন্তু উহাদের পারস্পরিক দূরত্ব গড়ে কঠিনের অণুগুলির দূরত্বের চেয়ে সামান্য বদলায়। বেশী পরিবর্তন যেটা হয় সেটা হইল অণুগুলির পারস্পরিক আকর্ষণ কমিয়া যাওয়া। ফলে তরলে অণুগুলি স্থান ছাড়িয়া যথেচ্ছ চলিতে পারে, এবং তরলের নির্দিষ্ট কোন আকার থাকে না। যে পাত্রে তরল থাকে, তরল সেই পাত্রেরই আকার নেয়। কিন্তু উষ্ণতা আরও না বাড়াইলে আয়তন বদলায় না।

(৩) বাষ্পীয় অবস্থা। উষ্ণতা আরও বাড়াইলে আয়তন একটু বাড়ে এবং অণুগুলির গতিশক্তি বাড়িতে থাকে। সব অণুগুলির গতিশক্তি সমান হয় না, কাহারও কিছু বেশী, কাহারও কিছু কম। বেশী গতিশক্তির অণু অন্যান্য অণুর আকর্ষণে আটক না থাকিয়া তরল হইতে বাহির হইয়া যাইতে পারে। ইহা বাষ্পন (Evaporation)। পরে একটা বিশেষ উষ্ণতায় (স্ফুটনাঙ্কে) গতিশক্তি এত বেশী হয় যে পারস্পরিক আকর্ষণ আর অণুগুলিকে ধরিয়া রাখিতে পারে না। তখন তরল অবস্থার সমাপ্তি ঘটে এবং পদার্থ বাষ্পে পরিণত হয়। আকর্ষণ উপেক্ষণীয় হয় বলিয়া বাষ্পের অণুগুলি গতি-শক্তির জন্য ছড়াইয়া পড়ে (III.1 গ চিত্র) এবং যতটা স্থান পায় তাহার সর্বত্র ছড়ায়।



III.1 ক, খ, গ চিত্র
পদার্থের তিন অবস্থা : (ক) কঠিন অবস্থা; অণুগুলির নির্দিষ্ট জ্যামিতিক সজ্জা আছে। (খ) তরল অবস্থা ; সজ্জা ভাঙিয়া গিয়াছে। (গ) গ্যাসীয় অবস্থা ; অণুগুলি ছড়াইয়া পড়ে।

প্রত্যেক গ্যাসই তাহার পক্ষে নির্দিষ্ট একটা উষ্ণতার নিচে থাকিলে কেবল চাপের সাহায্যেই তাহাকে তরল করা যায়। জলের উপর চাপ বাড়াইয়া উহাকে 0°C-র

নিচেও তরল রাখা যায় ; জল বরফে পরিণত হয় না। কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসের উষ্ণতা 31·1°C-র কম হইলে চাপ বাড়াইয়া উহাকে তরল করা যায়। পদার্থ কোন্ অবস্থায় থাকিবে তাহা প্রধানত উহার উষ্ণতার উপর নির্ভর করিলেও এ বিষয়ে চাপেরও কিছু ক্রিয়া আছে তাহা উপরের উদাহরণ দুটি হইতে দেখা যায়।

গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক (Melting and boiling points)। ইহাদের কথা পাঠ্যসূচী (সিলেবাস) অনুযায়ী বইয়ের প্রথম অংশের I-5. 1 ও I-5. 2 বিভাগে বলা হইয়াছে বলিয়া উহার পুনরুক্তি করা হইল না। মনে রাখা দরকার বিশুদ্ধ পদার্থের গলনাঙ্ক বা স্ফুটনাঙ্ক প্রদত্ত চাপে স্থির। অতএব গলনাঙ্ক বা স্ফুটনাঙ্ক দেখিয়া পদার্থের বিশুদ্ধতা যাচাই করা যায়।

প্রশ্ন। বিশুদ্ধ পদার্থ তিনপ্রকার অবস্থায় থাকিতে পারে কেন? গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক কাহাকে বলে? উহারা কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে? (I.-5.I ও I-5.2 বিভাগ দেখ।) কোন্ পদার্থ কি অবস্থায় থাকিবে তাহা কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে, জলের উদাহরণের সাহায্যে বুঝাও। (সংকেত—এক বায়ুমণ্ডল চাপে 0°C হইতে 100°C পর্যন্ত জল তরল, 0°C-র নিচে উহা কঠিন ; 100°C-র উপরে উহা বায়বীয়। চাপ বাড়াইলে 0°C-র নিচে বা 100°C-র উপরেও উহা তরল থাকে।)

III-1.2. পদার্থ চেনা (Identification of matter)—ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম (Physical and chemical properties)। পদার্থ অগণিত রকমের হইলেও পদার্থমাত্রেই হয় কঠিন, না হয় তরল বা গ্যাসীয়। কে কঠিন, কে তরল বা কে গ্যাসীয় তাহা বুঝিতে সাধারণত অসুবিধা হয় না। কঠিনের কাঠিন্য, তরলের বহিয়া যাওয়ার ক্ষমতা, গ্যাসের ছড়াইয়া পড়ার ক্ষমতা উহাদের বৈশিষ্ট্যসূচক ধর্ম। কিন্তু পদার্থ কঠিন হইলেই সব কঠিন পদার্থ এক নয়। তাহাদের মধ্যেও পার্থক্য আছে। সেই রকম সব তরল বা গ্যাসীয় পদার্থও এক নয়।

প্রত্যেক পদার্থেরই নিজস্ব কতকগুলি বৈশিষ্ট্য থাকে। এইসকল বৈশিষ্ট্যের সাহায্যেই উহাকে চেনা যায়। পদার্থের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকেই **পদার্থের ধর্ম** বলে। পদার্থের বিভিন্ন ধর্ম দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়—(ক) ভৌত ধর্ম (Physical properties) ও (খ) রাসায়নিক ধর্ম (Chemical properties)।

(ক) ভৌত ধর্মঃ বিভিন্ন পদার্থের ভৌত ধর্মে প্রভেদ (How matter differs in physical properties)।

পদার্থের যে ধর্ম উহার ভৌত অবস্থার সহিত জড়িত বা উহার উপর নির্ভরশীল এবং বাহ্যিক প্রকারের তাহাই ভৌত ধর্ম। পদার্থের ভৌত অবস্থা তিন রকম—কঠিন, তরল ও গ্যাসীয়—তাহা তোমরা জান। রং, গন্ধ, দ্রাব্যতা,

চৌম্বক ধর্ম, গলন, স্ফুটন ইত্যাদি ভৌত ধর্ম। কোন পদার্থের ভৌত ধর্মের বর্ণনা দিতে আমরা উহার এই সকল বৈশিষ্ট্যের অনেকগুলিরই উল্লেখ করি।

বিভিন্ন পদার্থের ভৌত ধর্মে পার্থক্য থাকে। এমনকি উহারা কঠিন, তরল বা গ্যাসীয় একই অবস্থায় থাকিলেও এবং দেখিতে একরকম হইলেও উহাদের ভৌত ধর্মে প্রভেদ থাকে। সুতরাং পদার্থের ভৌত ধর্মের পার্থক্যের সাহায্যে উহাদের শনাক্ত করা যায়।

জল ও ইথাইল অ্যালকোহল দুইই বর্ণহীন তরল পদার্থ। কিন্তু ইহাদের বিভিন্ন ভৌত ধর্মে প্রভেদ আছে। জল বর্ণহীন, স্বাদহীন ও গন্ধহীন তরল পদার্থ; সাধারণ উষ্ণতায় তরল অবস্থায় থাকে, 100°C উষ্ণতায় বাষ্পে পরিণত হয়, ইত্যাদি। অ্যালকোহল বর্ণহীন হইলেও ইহার বিশেষ স্বাদ ও গন্ধ আছে। সাধারণ উষ্ণতায় ইহা তরল হইলেও 78·5°C উষ্ণতায় ইহা বাষ্পে পরিণত হয়। সুতরাং জল ও অ্যালকোহলের **স্বাদ, গন্ধ, স্ফুটনাঙ্ক** ইত্যাদি বিভিন্ন ভৌত ধর্মের সাহায্যে উহাদের চেনা সহজ।

কোন তরল পদার্থে অন্য কোন পদার্থ দ্রবীভূত আছে কি না তাহা রাসায়নিক পরীক্ষা ছাড়া সাধারণত সহজে বোঝা যায় না। কিন্তু, দ্রবণের রং, গন্ধ ও স্বাদের সাহায্যে বা দ্রবণ **স্পর্শ** করিয়া দ্রবীভূত পদার্থ সম্বন্ধে ক্ষেত্র বিশেষে আন্দাজ করা যায়। কাপড় কাচা সোডা জলে গুলিয়া উহাতে হাত ডুবাইলে পিছল মনে হয়, কিন্তু চিনি, চুন ইত্যাদির দ্রবণে হাত দিলে আমাদের এরকম মনে হয় না।

নুন, চিনি ও ফটকিরির (alum-এর) কেলাস (crystal) বর্ণহীন, কিন্তু তুঁতের কেলাস নীল। এই পদার্থ কয়টি আলাদা আলাদা থাকিলে **রঙের** পার্থক্যের জন্য সহজেই তুঁতে চেনা যায়।

সকল পদার্থ জলে দ্রবীভূত হয় না। আবার-সমপরিমাণ জলে সকল পদার্থ সমান পরিমাণে দ্রবীভূত হয় না। সুতরাং **দ্রাব্যতার** প্রভেদেও পদার্থ চেনা যায়। কাপড় কাচা সোডা ও ফেনলথেলিন (phenolphthalein) দেখিতে একরকম। কিন্তু দুটির মধ্যে কেবল সোডাই জলে দ্রবীভূত হয়।

সোনা, রূপা ও লোহার বর্ণ আলাদা। এই তিনটির মধ্যে একমাত্র লোহাকেই চুম্বক দিয়া আকর্ষণ করা যায়। সুতরাং পদার্থের **চৌম্বক ধর্মও** কখন কখন পদার্থ চিনিতে সাহায্য করে।

ন্যাফথেলিন (naphthalene) সাদা রংয়ের ও আয়োডিন (iodine) গাঢ় বাদামী রংয়ের কঠিন কেলাসিত (crystalline) পদার্থ। উহাদের গন্ধও আলাদা। বিশুদ্ধ কেলাসিত (crystalline) পদার্থের নির্দিষ্ট গলনাঙ্ক থাকে। ন্যাফথেলিনের গলনাঙ্ক 80·2°C ও আয়োডিনের গলনাঙ্ক 113·6°C।

সমান আয়তনের লোহা ও রবারের টুকরা হাতে নিলে দেখিবে লোহার টুকরা রবারের তুলনায় অনেকগুণ ভারী। লোহা শক্ত, রবার নরম ও টানিলে সহজে লম্বা হয়। সুতরাং পদার্থের **আপেক্ষিক গুরুত্ব, কাঠিন্য, সম্প্রসারণ ক্ষমতা** ইত্যাদি ভৌত ধর্মের সাহায্যেও অনেক সময় পদার্থ চেনা যায়।

(খ) রাসায়নিক ধর্ম ঃ বিভিন্ন পদার্থের রাসায়নিক ধর্মে প্রভেদ (How matter differs in chemical properties)। সাধারণ অনেক প্রক্রিয়ায় পদার্থের পরিবর্তন হইতে দেখা যায়। উষ্ণতার পরিবর্তনে জলের হিমন, গলন ও বাষ্পন আপাতদৃষ্টিতে পদার্থের গুরু পরিবর্তন। কিন্তু আদি উষ্ণতায় ফিরিয়া গেলে জল আদি অবস্থায় ফিরিয়া যায়। তবে লোহায় মরিচা পড়া, কয়লার দহন, লাল কঠিন মারকিউরিক অক্সাইড উষ্ণ করিয়া উহা হইতে তরল মারকারি (পারা) ও অক্সিজেন গ্যাস পাওয়া, জিংক (দস্তা) ধাতু হাইড্রোক্লোরিক এসিডে ফেলায় জিংক দ্রবিত হওয়া ও হাইড্রোজেন গ্যাস উদ্ভব হওয়া, ইত্যাদিতে পদার্থের পরিবর্তন আরও জটিল। কারণ এই সকল পরিবর্তনে এক পদার্থ পরিবর্তিত হইয়া সম্পূর্ণ নূতন ধর্মবিশিষ্ট অন্য এক বা একাধিক পদার্থ উৎপন্ন করে। এই সকল পরিবর্তন রাসায়নিক পরিবর্তন। **যে ধর্ম পদার্থের রাসায়নিক পরিবর্তন (অর্থাৎ সম্পূর্ণ নূতন ধর্মবিশিষ্ট অন্য পদার্থের উৎপাদন) বুঝায় তাহাকে রাসায়নিক ধর্ম বলে।**

ভৌত ধর্মের মত বিভিন্ন পদার্থের রাসায়নিক ধর্মও আলাদা। চুম্বক লোহাকে আকর্ষণ করে। কিন্তু আর্দ্র বায়ুর ক্রিয়ায় লোহায় যে মরিচা পড়ে চুম্বক তাহাকে আকর্ষণ করে না। লোহা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে দিলে দ্রবীভূত হয় ও হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন করে। লোহার মরিচাও হাইড্রোক্লোরিক এসিডে দ্রবীভূত হয়, কিন্তু মরিচা আলাদা বৈশিষ্ট্যযুক্ত ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ। লোহার উপর আর্দ্রবায়ুর ক্রিয়ায় মরিচা পড়া, বা হাইড্রোক্লোরিক এসিডের ক্রিয়ায় হাইড্রোজেন উৎপাদন লোহার রাসায়নিক ধর্ম।

কয়লা জ্বালাইলে পুড়িয়া ছাই হয় ও নূতন পদার্থের সৃষ্টি হয়। মারকিউরিক অক্সাইড খুব গরম করিলে পারদ ও অক্সিজেন উৎপন্ন হয়। তাপের ক্রিয়ায় কয়লার দহন উহার রাসায়নিক ধর্ম। তাপের ক্রিয়ায় মারকিউরিক অক্সাইডের মারকারি ও অক্সিজেনে পরিণত হওয়া উহার রাসায়নিক ধর্ম।

হয়ত দেখিয়াছ, চুন বা ক্যালসিয়াম অক্সাইড (calcium oxide) জলে দিলে উহা দ্রবীভূত হয় ও জল গরম হইয়া ফুটিতে থাকে। এই ক্রিয়ার ফলে ক্যালসিয়াম অক্সাইড পরিবর্তিত হইয়া ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড উৎপন্ন করে। চুনের এই দ্রবণ

হইতে 100°C উষ্ণতায় জল বাষ্পীভূত করিয়া চুন ফেরত পাওয়া যায় না। জলের ক্রিয়ায় চুনের ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইডে পরিণত হওয়া চুনের রাসায়নিক ধর্ম।

চুনাপাথর (calcium carbonate) ও জিংকে হাইড্রোক্লোরিক এসিড দিলে উহারা দ্রবীভূত হইয়া যথাক্রমে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন করে। এসিডে চুনাপাথর ও জিংকের এরূপ দ্রবীভূত হওয়া উহাদের রাসায়নিক ধর্ম।

উপরের উদাহরণগুলিতে দেখিলে পদার্থের উপর তাপ, জল, এসিড ইত্যাদির ক্রিয়ায় উহাদের বৈশিষ্ট্যসূচক বিভিন্ন রাসায়নিক ধর্ম জানা যায়। পদার্থ শনাক্ত করিতে এই সব ধর্ম খুবই সাহায্য করে। কোন পদার্থ **সঠিকভাবে শনাক্ত করিতে হইলে** সাধারণত উহার কয়েকটি ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম জানা দরকার হয়।

III-8.(1) হইতে III-8.(7) উপবিভাগগুলিতে কয়েকটি মৌল ও যৌগের বিশিষ্ট ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মের উল্লেখ কিভাবে করা হইয়াছে তাহা দেখিলে এরূপ ধর্মের সাহায্যে পদার্থ শনাক্ত করা কিরূপে সম্ভব হয় তাহা আরও ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবে।

III-1.3. ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তন (Physical and chemical changes)। পদার্থের ধর্ম যেমন দুই প্রকারের—উহার পরিবর্তনও তেমনই দুই প্রকারের—ভৌত ও রাসায়নিক।

(ক) ভৌত পরিবর্তন। যে পরিবর্তনে পদার্থের ভৌত ধর্মের পরিবর্তন হয়, কিন্তু উহার রাসায়নিক ধর্মের পরিবর্তন হয় না, তাহাকে ভৌত পরিবর্তন বলে। তাপ, তড়িৎ, চুম্বক, দ্রাবক ইত্যাদির প্রভাবে পদার্থের এরূপ পরিবর্তন ঘটিতে পারে। নিচে উদাহরণ দেওয়া হইল।

(১) তাপে অবস্থান্তর—পদার্থের উষ্ণতা কমাইয়া অথবা বাড়াইয়া পদার্থের অবস্থান্তর ঘটান যায়। সাধারণ উষ্ণতায় জল, পারদ (Mercury) ও অ্যাসেটিক এসিড তরল পদার্থ। কিন্তু যথেষ্ট ঠাণ্ডা করিলে তিনটিই জমিয়া কঠিন হয়, এবং যথেষ্ট গরম করিলে তিনটিই নিজ নিজ বাষ্পীয় অবস্থায় পরিণত হয়। আদি উষ্ণতায় ফিরিয়া আসিলে উহারা সকলেই আদি অবস্থা পায়। এক্ষেত্রে উষ্ণতায় অবস্থার পরিবর্তন ভৌত পরিবর্তন। ইহাতে মূল পদার্থের উপাদানের কোন পরিবর্তন হয় না।

তাপে ভাস্বরতা—গ্যাসবাতির ম্যাণ্ট্‌ল্ (mantle) তাপের প্রভাবে ভাস্বর হইয়া আলো দেয়। তড়িতের প্রভাবে বিজলী বাতির তার ভাস্বর হইয়া আলো বিকিরণ করে। ঠাণ্ডা করিলে উহারা আদি অবস্থা ফিরিয়া পায়। এক্ষেত্রে তাপে ভাস্বর হইয়া আলো বিকিরণ করা ভৌত পরিবর্তন। রূপালী রঙের প্লাটিনাম ধাতুর তার অতিরিক্ত উত্তাপে লাল হয় ও ঠাণ্ডা করিলে আগের অবস্থায় ফিরিয়া আসে।

(২) তড়িতের ক্রিয়া—তড়িতের ক্রিয়ায় একটি ভৌত পরিবর্তন এই মাত্র বলা হইল। নিয়ন আলো ইত্যাদি দীপকে (II-6 বিভাগ দেখ) আলো বিকিরণও ভৌত পরিবর্তন। তড়িৎ প্রবাহ বন্ধ করিলে গ্যাস তাহার প্রাথমিক অবস্থা ফিরিয়া পায়।

রবার বা অনুরূপ বিদ্যুৎ অপরিবাহী পদার্থ দিয়া ঢাকা তামার তার দিয়া লোহার দণ্ড জড়াইয়া তারের মধ্য দিয়া বিদ্যুৎস্রোত প্রবাহিত করিলে লোহার দণ্ড চুম্বকে পরিণত হইবে। ইহাও ভৌত পরিবর্তন কারণ ইহাতে লোহার উপাদানের কোন পরিবর্তন হয় নাই; লোহা লোহাই রহিয়া গিয়াছে যদিও উহাতে চুম্বকত্ব আসিয়াছে। চুম্বকন (magnetization) ভৌত পরিবর্তন।

(৩) চুম্বকন—চুম্বক দিয়া ঘষিয়া ছুঁচ বা লোহার টুকরাকে চুম্বকিত করা যায়। ইহা ভৌত পরিবর্তন।

(৪) দ্রাবণ (Dissolution)—জল, স্পিরিট, কেরোসিন ইত্যাদি বিভিন্ন দ্রাবক আমাদের পরিচিত। নুন, চিনি প্রভৃতি বহু পদার্থ জলে দ্রাবিত হয়। গরম করিয়া জল বাষ্পিত করিলে দ্রাবিত পদার্থটি (নুন, চিনি প্রভৃতি) পড়িয়া থাকে। দ্রাবণ ভৌত পরিবর্তন। স্পিরিট, কেরোসিন প্রভৃতিতে দ্রাবণ সম্বন্ধেও ইহা সত্য। দ্রাবিত মূল পদার্থটি ফেরত পাওয়া গেলে তবেই দ্রাবণ ভৌত পরিবর্তন।

(৫) চাপের ক্রিয়া—গ্যাসীয় পদার্থের উপর চাপ কমাইয়া বা বাড়াইয়া উহার আয়তন বাড়ান বা কমান যায়। চাপ আদি অবস্থায় আসিলে গ্যাসের আয়তনও আদি অবস্থায় ফিরিয়া আসে। ইহা ভৌত পরিবর্তন।

(খ) রাসায়নিক পরিবর্তন। যে পরিবর্তনে পদার্থ পরিবর্তিত হইয়া সম্পূর্ণ নূতন রাসায়নিক ও ভৌত ধর্মবিশিষ্ট এক বা একাধিক নূতন পদার্থ উৎপন্ন করে তাহাকে রাসায়নিক পরিবর্তন বলে। রাসায়নিক পরিবর্তনে নূতন পদার্থের সৃষ্টি হওয়ায় উহাকে **রাসায়নিক বিক্রিয়া (Chemical reaction)** বলা হয়। কোন রাসায়নিক পরিবর্তনে গোড়ায় যে এক বা একাধিক পদার্থ অংশগ্রহণ করে তাহাদের **বিক্রিয়ক** বা **বিকারক (Reactant)** বলে। রাসায়নিক পরিবর্তনের ফলে যে এক বা একাধিক পদার্থ উৎপন্ন হয় তাহাদের বলে **বিক্রিয়জ** বা **বিক্রিয়াজাত পদার্থ (Product)**।

III-1.4. যে সকল বিষয় রাসায়নিক পরিবর্তন প্রণোদিত ও নিয়ন্ত্রিত করে (Factors which induce and regulate chemical changes)।

(১) ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ—একাধিক পদার্থের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটাইতে হইলে উহাদের সংস্পর্শ অতি অবশ্যই ঘনিষ্ঠ হইতে হইবে। ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শের জন্য অনেক সময়ই পদার্থের দ্রবণ তৈয়ারি করিয়া মিশাইতে হয়। সোডিয়াম ক্লোরাইড ($NaCl$) ও

সিলভার নাইট্রেটের ($AgNO_3$) গুঁড়া ঘনিষ্ঠভাবে মিশাইয়া রাখিলেও উহাদের মধ্যে কোন রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটে না। কিন্তু উভয়কে দ্রাবিত করিয়া দ্রবণ দুটি মিশাইলে দেখা যায় রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটিয়া সিলভার ক্লোরাইডের ($AgCl$) সাদা গুঁড়া থিতাইয়া পড়িয়াছে। একাধিক পদার্থ কেবল মিশাইলেই উহাদের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া নাও ঘটিতে পারে।

(২) তাপ—তাপ প্রয়োগে অনেক ক্ষেত্রে রাসায়নিক পরিবর্তনও ঘটে। ম্যাগনেসিয়াম ধাতুর তার খুব গরম করিলে বায়ুর অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়ায় জ্বলিয়া আলো দেয় ও ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইডের সাদা গুঁড়া উৎপন্ন করে। মারকিউরিক অক্সাইড গরম করিলে পারদ (মারকারি) ও অক্সিজেন উৎপন্ন হয়। লোহার গুঁড়া ও গন্ধক মিশাইয়া রাখিলে উহাদের কোন পরিবর্তন হয় না। কিন্তু উহাদের মিশ্রণ গরম করিলে উহাদের বিক্রিয়ায় ফেরাস সালফাইড উৎপন্ন হয়। চিনি বায়ুতে গরম করিলে পুড়িয়া গ্যাস উৎপন্ন করে এবং প্রথমে বাদামী রঙের কঠিন পদার্থে ও পরে কালো রংয়ের কঠিন পদার্থে পরিণত হয়। খুব গরম করিলে উহা সম্পূর্ণ পুড়িয়া গ্যাসে পরিবর্তিত হয় ও অবশিষ্ট কিছুই পড়িয়া থাকে না। উষ্ণতা বাড়াইয়া অনেক রাসায়নিক পরিবর্তনই দ্রুততর করা যায়।

(৩) তড়িৎ—তড়িতের সাহায্যে অনেক ক্ষেত্রে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে। সামান্য সালফিউরিক এসিড মেশান জলের মধ্য দিয়া তড়িৎ প্রবাহ পাঠাইলে জল হইতে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাস উৎপন্ন হয়। কিন্তু গ্যাস দুটি কেবল মিশাইলেই জল ফিরিয়া পাওয়া যায় না। এই গ্যাসীয় মিশ্রণের মধ্য দিয়া তড়িৎ স্ফুলিঙ্গ চালনা করিলে জল পাওয়া যায় ও তাপের উদ্ভব হয়। নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাসের মধ্য দিয়া বিদ্যুৎ-চালনা করিলে নাইট্রিক অক্সাইড তৈয়ারি হয় ও তাপের শোষণ ঘটে।

(৪) আলো—সূর্যকিরণের প্রভাবে গাছের ক্লোরোফিল কার্বোহাইড্রেট তৈয়ারি করে। আলোর অভাবে এই রাসায়নিক ক্রিয়া বন্ধ হয়। আলোর প্রভাবে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটিয়া সাদা রঙের সিলভার ক্লোরাইড, সিলভার নাইট্রেট ইত্যাদি হইতে সূক্ষ্ম কালো সিলভারের (রূপার) কণা আলাদা হয়। ফটোগ্রাফির ফিল্মে সিলভার-ঘটিত রাসায়নিক পদার্থ থাকে বলিয়া আলোর প্রভাবে উহা কালো হয়।

(৫) অনুঘটক (Catalyst)—পদার্থের রাসায়নিক পরিবর্তন আরম্ভ হইলে শেষ হইতে কিছুক্ষণ সময় লাগে। কোথাও এই সময় এক সেকেণ্ডের কম, আবার কোথাও কয়েক ঘন্টা বা তার চেয়েও বেশী। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে খুবই অল্প পরিমাণ আর একটি পদার্থের উপস্থিতির ফলে রাসায়নিক পরিবর্তন দ্রুত ঘটে। এ বিক্রিয়ায় দ্বিতীয় পদার্থটির ওজনের কোন পরিবর্তন হয় না ও উহা পুরাটাই ফেরত

পাওয়া যায়। **যে সমস্ত পদার্থ নিজে অবিকৃত থাকিয়া রাসায়নিক পরিবর্তনের বেগ প্রভাবিত করে তাহাদের অনুঘটক** বা **প্রভাবক বলে।** পটাসিয়াম ক্লোরেট একলা গরম করিলে সামান্য পরিমাণ অক্সিজেন পাওয়া যায়। কিন্তু পটাসিয়াম ক্লোরেটের সঙ্গে সামান্য পরিমাণ ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড মিশাইয়া গরম করিলে কম উষ্ণতায় বেশী পরিমাণ অক্সিজেন পাওয়া যায়। এই বিক্রিয়ায় ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড প্রভাবক। বাদাম তেল হইতে বনস্পতি তৈয়ারীতে নিকেল ধাতু, সালফার ট্রাইঅক্সাইড তৈয়ারীতে ভ্যানাডিয়াম পেন্টক্সাইড ইত্যাদি প্রভাবক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। প্রাণীজগতে বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় বিভিন্ন এনজাইম (Enzyme) প্রভাবক।

(৬) চাপ—গ্যাসীয় পদার্থের রাসায়নিক পরিবর্তনের বেগ বহুল পরিমাণে উহার বা উহাদের উপরস্থ চাপ দিয়া নিয়ন্ত্রিত হয়। নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন গ্যাসের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন অ্যামোনিয়া গ্যাসের উৎপাদনের পরিমাণ এই গ্যাসীয় মিশ্রণের চাপ বাড়িলে বাড়ে, এবং চাপ কমিলে কমে। বর্ধিত চাপ ঘনিষ্ঠ সংযোগ ঘটায়। (অ্যামোনিয়া গ্যাস উৎপাদনে চাপ ছাড়াও অনুঘটক এবং তাপের প্রভাব খুব বেশী)

বিস্ফোরক পদার্থে চাপের ক্রিয়ায় রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে। পটকা, বারুদ ইহার উদাহরণ। এখানে চাপের ক্রিয়ায় ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ এবং উষ্ণতা বাড়ায় বিস্ফোরণ সহজে ঘটিতে পারে।

III-1.5. তাপ-উৎপাদক ও তাপ-শোষক পরিবর্তন (Exothermic and Endothermic changes)। রাসায়নিক পরিবর্তন সকল সময়ই তাপের উদ্ভব বা তাপের শোষণ হয়। যে সকল পরিবর্তনে তাপ উৎপন্ন হয় তাহাকে 'তাপ-উৎপাদক' (Exothermic) পরিবর্তন বলে। উদাহরণ—(১) যে কোন দহন ক্রিয়া তাপ-উৎপাদক। কার্বন ও অক্সিজেনের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় প্রচণ্ড তাপের উৎপত্তি হয়।

(২) সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড ও সালফিউরিক এসিডের বিক্রিয়ায় তাপ উৎপন্ন হয় এবং সোডিয়াম সালফেট ও জল সৃষ্ট হয়।

যে পরিবর্তনে তাপ শোষিত হয় তাহাকে 'তাপ-শোষক' (Endothermic) পরিবর্তন বলে। উদাহরণ—নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের বিক্রিয়ায় নাইট্রিক অক্সাইড উৎপন্ন হওয়ার সময় তাপ শোষিত হয়।

তাপ-উৎপাদক ও তাপ-শোষক কথা দুইটি যে কেবল রাসায়নিক পরিবর্তনে প্রযোজ্য তাহা নয়। ভৌত পরিবর্তনেও উহা প্রযোজ্য। ভৌত পরিবর্তনে কঠিন পদার্থের হিমন, বাষ্পীয় পদার্থের তরলীভবন তাপ-উৎপাদক পরিবর্তন। গলন ও বাষ্পন তাপ-শোষক। চিনি প্রভৃতি অনেক পদার্থ দ্রাবিত হইতে কিছু তাপ শোষণ

করে। তবে রাসায়নিক পরিবর্তনে তাপের উদ্ভব বা শোষণের তুলনায় ভৌত পরিবর্তনে তাপের উদ্ভব বা শোষণ অনেক কম।

ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তনের তুলনা সারণির আকারে নিচে দেওয়া হইল।

ভৌত পরিবর্তন	রাসায়নিক পরিবর্তন
১। কোন নূতন পদার্থ সৃষ্ট হয় না।	১। এক বা একাধিক নূতন পদার্থ সৃষ্ট হয়।
২। পদার্থের ভৌতধর্মের পরিবর্তন হয়, কিন্তু রাসায়নিক ধর্মের পরিবর্তন ঘটে না।	২। আদি পদার্থ (বিক্রিয়ক) ও বিক্রিয়াজাত পদার্থের (বিক্রিয়জের) ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মে প্রভেদ থাকে।
৩। ক্ষেত্রবিশেষে তাপের উদ্‌ভব বা শোষণ হইতে পারে। কিন্তু রাসায়নিক পরিবর্তনে উদ্ভব বা শোষণের তুলনায় ইহা অনেক কম।	৩। তাপের শোষণ বা উদ্ভব হয়।
৪। পদার্থের ওজন বাড়ে না বা কমে না।	৪। অংশগ্রহণকারী পদার্থের ওজন সামগ্রিকভাবে বাড়ে না বা কমে না।
৫। পদার্থের আভ্যন্তরীণ গঠনের পরিবর্তন ঘটে না। আয়তন বদলাইলে অণুগুলির পারস্পরিক দূরত্ব বদলায়।	৫। পদার্থের বা পদার্থগুলির বিভিন্ন পরমাণুর বিন্যাস (আভ্যন্তরীণ গঠন) বদলায়।

প্রশ্ন। ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তন তুলনা কর। প্রত্যেকের তিনটি করিয়া উদাহরণ দাও।

তাপ-উৎপাদক ও তাপ-শোষক পরিবর্তন কাহাকে বলে? উভয়ের একটি করিয়া ভৌত ও রাসায়নিক উদাহরণ দাও।

রাসায়নিক পরিবর্তন প্রণোদিত বা নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে এমন তিনটি বিষয়ের উল্লেখ কর ও উদাহরণ দাও।

III-1.6. মৌলিক ও যৌগিক পদার্থ (Elements and Compounds)।

জলকে বিদ্যুতের সাহায্যে বিশ্লিষ্ট করিয়া নির্দিষ্ট পরিমাণ জল হইতে সর্বদাই নির্দিষ্ট পরিমাণ হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাস পাওয়া যায়।

মারকিউরিক অক্সাইডকে যথেষ্ট উষ্ণ করিলে নির্দিষ্ট পরিমাণ অক্সাইড হইতে সর্বদাই নির্দিষ্ট পরিমাণ মারকারি ও অক্সিজেন পাওয়া যায়। কিন্তু হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, মারকারি ইত্যাদি কতকগুলি পদার্থ আছে যেগুলিকে ভৌত বা রাসায়নিক উপায়ে বিশ্লিষ্ট করা যায় না, অর্থাৎ যাহাদের ভাঙিয়া একাধিক উপাদান পাওয়া যায় না। এরূপ পদার্থকে মৌলিক পদার্থ বলে।

সংজ্ঞা। যে সকল পদার্থ হইতে রাসায়নিক উপায়ে একাধিক পদার্থ পাওয়া যায় না তাহাদের মৌলিক পদার্থ বা মৌল বলে।

যে সকল পদার্থ নির্দিষ্ট পরিমাণ দুই বা ততোধিক মৌলিক পদার্থের রাসায়নিক সংযোগে গঠিত তাহাদের যৌগিক পদার্থ বা যৌগ বলে।

যৌগিক পদার্থের সংখ্যা অগণিত। জল, খাদ্য-লবণ, চিনি, কার্বন ডাই-অক্সাইড, নাইট্রিক এসিড প্রভৃতি যৌগিক পদার্থ। হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, সোনা, রূপা, তামা প্রভৃতি মৌলিক পদার্থ। পৃথিবীর প্রাণীজগৎ এবং জড়জগতের সব কিছুই প্রায় নব্বইটি (90) স্বতন্ত্র ধর্মবিশিষ্ট মৌল বা মৌলিক পদার্থে গঠিত।

মৌল ও যৌগে প্রভেদ

মৌল	যৌগ
১। রাসায়নিক বিশ্লেষণে দ্বিতীয় কোন পদার্থ পাওয়া যায় না।	১। দুই বা ততোধিক মৌলের রাসায়নিক সংযোগে উৎপন্ন।
২। প্রত্যেক মৌলের নিজস্ব ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম আছে।	২। যৌগের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম মৌলিক উপাদানের ধর্ম হইতে ভিন্ন।
৩। সংখ্যায় 104টি মৌলের কথা জানা আছে। স্থায়ী মৌলের সংখ্যা 90-রও কম।	৩। যৌগের সংখ্যা অগণিত। মৌল বা মৌলের মিশ্রণ ছাড়া আর সকল পদার্থই যৌগ, বা যৌগের সমসত্ত্ব বা অসমসত্ত্ব মিশ্রণ।

III-1.7. ধাতু ও অধাতু (Metals and non-metals)। প্রত্যেকটি মৌলিক পদার্থের ধর্ম নিজস্ব ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হইলেও কোন কোন মৌলের ধর্মের সঙ্গে অন্য কোন কোন মৌলের ধর্মের কমবেশী সাদৃশ্য দেখা যায়। এই সাদৃশ্য অনুযায়ী মৌলিক পদার্থগুলিকে সাধারণত **ধাতু (Metal)** ও **অধাতু (Non-metal)** এই দুইটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। নিচে কয়েকটি ধাতু ও অধাতুর নাম দেওয়া গেল।

(ক) ধাতু—সোনা, রূপা, তামা, লোহা, পারদ, ইত্যাদি।

(খ) অধাতু—হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, কার্বন, ক্লোরিন, সালফার (গন্ধক), ইত্যাদি।

*[কিন্তু কয়েকটি মৌল ধাতু ও অধাতু উভয়েরই কিছু ধর্ম দেখা যায়। এ প্রকার মৌলকে, (যেমন জারমেনিয়াম (Germanium), সিলেনিয়াম (Selenium), ইত্যাদিকে আলাদাভাবে **ধাতুকল্প (Metalloid)** বলে।]*

ধাতু ও অধাতু বলিয়া শ্রেণীভেদের সীমা স্পষ্ট নয়। বলা যায় মৌলগুলির একপ্রান্তে ধাতু, অন্য প্রান্তে অধাতু ও মাঝখানে ধাতু হইতে অধাতুতে ক্রমশ পরিবর্তন। মাঝের গুলিই ধাতুকল্প। সমস্ত মৌলের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশই ধাতু।

ধাতু ও অধাতুর প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি সারণির আকারে নিচে দেওয়া হইল।

ধাতু ও অধাতুর প্রধান বৈশিষ্ট্য

ধাতু	অধাতু
১। অধিকাংশ ধাতু উজ্জ্বল, অনচ্ছ, কঠিন পদার্থ। তবে পারদ, গ্যালিয়াম (Gallium) ও সিজিয়াম (Cesium) ধাতুর গলনাঙ্ক 30°C-র কম বলিয়া আমাদের দেশে এগুলি প্রায়ই তরল অবস্থায় পাওয়া যায়।	১। অধাতু সাধারণত অনুজ্জ্বল, স্বচ্ছ বা ঈষদনচ্ছ গ্যাসীয় বা তরল পদার্থ। কিন্তু কার্বন, সালফার ও ফসফরাসের মত কোন কোন অধাতু অনচ্ছ ও কঠিন অবস্থায় পাওয়া যায়।
২। ধাতুগুলির তাপ ও বিদ্যুৎ পরিবহণ করার ক্ষমতা বেশী।	২। গ্রাফাইটরূপী কার্বন বাদে অন্যান্য অধাতুগুলির তাপ ও তড়িৎ পরিবহণ করার ক্ষমতা খুব কম।
৩। বেশীর ভাগ ধাতুর ঘাতসহতা (malleability) ও প্রসার্যতা (tensile strength) থাকায় ইহাদের পিটাইয়া পাতে ও টানিয়া তারে পরিণত করা যায়।	৩। কঠিন অবস্থায় অধাতু ভঙ্গুর এবং উহাদের ঘাতসহতা ও প্রসার্যতা খুব কম।
৪। ধাতুর অক্সাইড সাধারণত ক্ষারক জাতীয়।	৪। অধাতুর অক্সাইড সাধারণত এসিড জাতীয়।
৪। সাধারণত ধাতুর গলনাঙ্ক বেশী, এবং উহাদের গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্কের ব্যবধানও বেশী।	৫। অধাতুর গলনাঙ্ক সাধারণত কম এবং উহাদের গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্কের ব্যবধানও কম। তবে কার্বন, বোরন ও সিলিকনের গলনাঙ্ক খুব বেশী।

প্রশ্ন। মৌল ও যৌগের প্রভেদ উদাহরণ দিয়া বুঝাও।
ধাতু ও অধাতুর প্রভেদ তুলনা কর।

III-2. দ্রবণ (Solution)। **কোন তরলের সহিত কোন কঠিন, অন্য তরল অথবা গ্যাসীয় পদার্থের সমসত্ত্ব মিশ্রণকে দ্রবণ বলে।** নিচে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হইল।

(১) তরলে কঠিন পদার্থের দ্রবণ—জলে চিনি, সোডা, খাদ্য-লবণ প্রভৃতির দ্রবণ, কার্বন ডাইসালফাইডে গন্ধকের দ্রবণ, ইত্যাদি।

(২) তরলে তরলের দ্রবণ—জলে ইথাইল অ্যালকোহলের দ্রবণ (আধুনিক রসায়নের ভাষায় ইথাইল অ্যালকোহলকে ইথানল—Ethanol—বলে); ইথানলে ক্লোরোফর্মের দ্রবণ, ইত্যাদি।

(৩) তরলে গ্যাসীয় পদার্থের দ্রবণ—জলে অ্যামোনিয়া, হাইড্রোজেন ক্লোরাইড, অক্সিজেন ইত্যাদির দ্রবণ।

দ্রবণে উহার বিভিন্ন উপাদানের স্বতন্ত্র সত্তার লোপ হয় না। উহাদের রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ থাকে। কিন্তু গলনাঙ্ক, স্ফুটনাঙ্ক, ঘনত্ব, কাঠিন্য ইত্যাদির ভৌতধর্মের পরিবর্তন ঘটে।

III-2.1. দ্রাবক ও দ্রাব (Solvent and Solute)। দ্রবণ তৈয়ারি করিতে যে উপাদানটি আয়তনে বেশী থাকে তাহাকে দ্রাবক (Solvent) ও অন্যটিকে দ্রাব (Solute) বলা হয়। জলে চিনি, নুন, তুঁতে, ফটকিরি প্রভৃতি দ্রাবিত করিতে জলের আয়তন চিনি ইত্যাদির চেয়ে বেশী থাকে। এ সব ক্ষেত্রে জল দ্রাবক এবং চিনি, নুন ইত্যাদি দ্রাব। জল ও ইথানল যে কোন অনুপাতে মিশিয়া দ্রবণ তৈয়ারি করিতে পারে। এরূপ দ্রবণে জলের আয়তন ইথানলের চেয়ে বেশী থাকিলে বলিব জলে ইথানল দ্রাবিত (দ্রবীভূত) হইয়াছে—জল দ্রাবক, ইথানল দ্রাব। কিন্তু জলের চেয়ে ইথানলের আয়তন বেশী থাকিলে বলিব ইথানল দ্রাবক, জল দ্রাব।

সকল পদার্থ সব দ্রাবকে দ্রাবিত হয় না। কোন পদার্থ দ্রাবিত হইবে কি না তাহা উহার নিজের প্রকৃতি ও দ্রাবকের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। নুন জলে দ্রাবিত হয়, কিন্তু ইথানলে হয় না। গন্ধক জলে দ্রাবিত হয় না, কিন্তু কার্বন ডাই-সালফাইডে হয়।

দ্রবণ তৈয়ারীতে দ্রাব ও দ্রাবকের মধ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিতে পারে। নুন, ইথানল বা অক্সিজেনের জলীয় দ্রবণ তৈয়ারিতে উহাদের সঙ্গে জলের রাসায়নিক বিক্রিয়া হয় না। কিন্তু অ্যামোনিয়া, ক্যালসিয়াম অক্সাইড, ইত্যাদির জলীয় দ্রবণ তৈয়ারীতে উহাদের সঙ্গে জলের রাসায়নিক বিক্রিয়া হয়।

দ্রবণের সাধারণ ধর্ম। দ্রাব ও দ্রাবকের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া না ঘটিলে সকল দ্রবণেরই কয়েকটি সাধারণ ধর্ম লক্ষ্য করা যায়।

(১) দ্রাবক অথবা দ্রাবের যে বর্ণ থাকে সাধারণত দ্রবণেরও সেই বর্ণ হয়।

(২) প্রত্যেক দ্রবণই স্বচ্ছ। ('স্বচ্ছ' অর্থ বর্ণহীন নয়। 'স্বচ্ছ' অর্থ যাহার ভিতর দিয়া দেখা যায়। উহার বর্ণ থাকিতে পারে, যেমন জলে পটাস পারম্যাঙ্গানেটের দ্রবণ।)

(৩) দ্রাবক ও দ্রাবের ওজনের যোগফল দ্রবণের ওজনের সমান।

(৪) নির্দিষ্ট উষ্ণতায় ও চাপে কোন দ্রবণে নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশী দ্রাব দ্রাবিত থাকিতে পারে না (III.2.3 অংশ দেখ)। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে, যেমন জল ও ইথানলের দ্রবণে, একটি অন্যটিতে যে-কোন পরিমাণে দ্রাবিত থাকিতে পারে।

(৫) দ্রাবণে (অর্থাৎ দ্রবণ ক্রিয়ায়) দ্রাবকের স্ফুটনাঙ্ক, হিমাঙ্ক (Freezing point), বাষ্পচাপ (Vapour pressure) প্রভৃতি ভৌতধর্ম পরিবর্তিত হয়। দ্রবণের স্ফুটনাঙ্ক দ্রাবকের স্ফুটনাঙ্কের তুলনায় বেশী, এবং উহার হিমাঙ্ক দ্রাবকের হিমাঙ্কের তুলনায় কম।

প্রশ্ন। দ্রবণ, দ্রাবক ও দ্রাব কাহাদের বলে, একটি করিয়া উদাহরণ দিয়া বুঝাও। কয়েকটি বিভিন্ন রকমের দ্রবণের নাম কর।

জলীয় দ্রবণের সাধারণ ধর্মগুলি বল।

III-2.2. সংপৃক্ত ও অসংপৃক্ত দ্রবণ (Saturated and unsaturated Solution)।

সংপৃক্ত দ্রবণ। নির্দিষ্ট উষ্ণতায় নির্দিষ্ট আয়তনের দ্রাবকে দ্রাবের পরিমাণ ক্রমাগত বাড়াইতে থাকিলে দেখা যায় এক সময় দ্রাব আর দ্রবীভূত হইতেছে না। এরূপ দ্রবণকে সংপৃক্ত দ্রবণ বলে।

অসংপৃক্ত দ্রবণ। নির্দিষ্ট উষ্ণতায় নির্দিষ্ট আয়তনের যে দ্রবণ আরও বেশী দ্রাব দ্রবীভূত করিতে পারে তাহাকে অসংপৃক্ত দ্রবণ বলে।

সাধারণত দ্রবণের উষ্ণতা বাড়াইলে কঠিন দ্রাব জলে বেশী পরিমাণে দ্রাবিত হয়। উষ্ণতা কমাইলে উহার বিপরীত ক্রিয়া ঘটে। সুতরাং সংপৃক্ত দ্রবণের উষ্ণতা বাড়াইলে (উহার সংস্পর্শে আরও দ্রাব না থাকিলে) উহা অসংপৃক্ত দ্রবণে পরিণত হয়। অসংপৃক্ত দ্রবণের উষ্ণতা ক্রমাগত কমাইলে, উহা কোন না কোন নিম্নতর উষ্ণতায় সংপৃক্ত দ্রবণে পরিণত হয়। কোন কেলাসের সংপৃক্ত দ্রবণ ঠাণ্ডা হইতে দিলে সাধারণত অতিরিক্ত দ্রাব কেলাসের আকারে পৃথক হয় ও দ্রবণ নিম্নতর উষ্ণতায় সংপৃক্তই থাকে।

একটি উদাহরণ। 20°C উষ্ণতায় 100 গ্রাম জলে 34·2 গ্রামের বেশী পটাসিয়াম ক্লোরাইড দ্রাবিত করা যায় না। 20°C উষ্ণতায় 100 গ্রাম জলে 34·2 গ্রাম পটাসিয়াম ক্লোরাইড দ্রাবিত থাকিলে ঐ দ্রবণ সংপৃক্ত। 34·2 গ্রামের কম থাকিলে দ্রবণ অসংপৃক্ত।

40°C উষ্ণতায় 100 গ্রাম জলে 40·0 গ্রামের বেশী পটাসিয়াম ক্লোরাইড দ্রাবিত করা যায় না। 40°C-তে 100 গ্রাম জলে 40·0 গ্রাম পটাসিয়াম ক্লোরাইড থাকিলে দ্রবণ সংপৃক্ত ; কম থাকিলে দ্রবণ অসংপৃক্ত।

40°C-তে সংপৃক্ত দ্রবণ ঠাণ্ডা করিয়া 20°C-তে আনিলে বাড়তি 40·0 – 34·2 = 5·8 গ্রাম পটাসিয়াম ক্লোরাইড কেলাসের আকারে নিচে থিতাইয়া পড়িবে, এবং 100 গ্রাম জলে কেবল 34·2 গ্রাম পটাসিয়াম ক্লোরাইড দ্রাবিত থাকিতে পারিবে।

প্রশ্ন। সংপৃক্ত ও অসংপৃক্ত দ্রবণ কাহাদের বলে? সংপৃক্ত দ্রবণ (ক) ঠাণ্ডা করিলে, (খ) উষ্ণ করিলে কি ফল হইবে?

III-2.3. দ্রাব্যতা এবং উহার সহিত উষ্ণতার সম্পর্ক (Solubility and its relation with temperature)।

দ্রাব্যতা (বা দ্রাবণীয়তা ; Solubility)-র সংজ্ঞা। নির্দিষ্ট উষ্ণতায় 100 গ্রাম দ্রাবক সংপৃক্ত করিতে যত গ্রাম পরিমাণ দ্রাব দরকার হয় তাহাকে ঐ উষ্ণতায় ঐ দ্রাবকে ঐ দ্রাবের দ্রাব্যতা (Solubility) বলে। উপরের উদাহরণ হইতে দেখা যায় 40°C-তে জলে পটাসিয়াম ক্লোরাইডের দ্রাব্যতা 40 গ্রাম, এবং 20°C-তে দ্রাব্যতা 34·2 গ্রাম।

পদার্থের দ্রাব্যতা (১) দ্রাবের প্রকৃতি, (২) দ্রাবকের প্রকৃতি ও (৩) উষ্ণতার উপর নির্ভর করে। কোন পদার্থের দ্রাব্যতার উল্লেখে দ্রাবকের নাম ও উষ্ণতা বলিতে হয়। তবে সাধারণত দ্রাবক হিসাবে জল ব্যবহৃত হয় বলিয়া দ্রাব্যতার উল্লেখে দ্রাবকের নাম বলা হয় না। দ্রাব্যতা পদার্থের বৈশিষ্ট্যসূচক ভৌত ধর্ম।

দ্রাব্যতার সহিত উষ্ণতার সম্পর্ক। উষ্ণতা বাড়িলে অধিকাংশ কঠিন পদার্থের দ্রাব্যতা বাড়ে; তবে বৃদ্ধির পরিমাণ কোন ক্ষেত্রে বেশী, কোন ক্ষেত্রে কম। কোন কোন কঠিনের দ্রাব্যতা উষ্ণতা বৃদ্ধিতে প্রায় বদলায় না, কাহারও বা কমে।

দ্রাব্যতার উপরোক্ত রূপ আচরণের কয়েকটি উদাহরণ নিচে সারণির আকারে দেওয়া হইল।

উষ্ণতার সঙ্গে দ্রাব্যতার পরিবর্তনের কয়েকটি উদাহরণ

পদার্থ	(জলে বিভিন্ন উষ্ণতায় দ্রাব্যতা)				মন্তব্য
	0°C	20°C	40°C	60°C	
চিনি (আখের)	179	204	238	287	দ্রাব্যতা বিভিন্ন এবং উষ্ণতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন পরিমাণে বাড়ে।
পটাসিয়াম ক্লোরাইড	28·1	34·2	40·0	45·8	
সোডিয়াম ক্লোরাইড (খাদ্য লবণ)	35·7	36·0	36·6	37·3	উষ্ণতা বৃদ্ধিতে দ্রাব্যতা প্রায় বদলায় না।
ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড	0·185	0·165	0·141	0·116	উষ্ণতা বাড়িলে দ্রাব্যতা কমে।

[প্রসঙ্গত বলা যায় দ্রাব গ্যাসীয় হইলে উষ্ণতা বৃদ্ধিতে দ্রাব্যতা কমে, এবং চাপ বৃদ্ধিতে দ্রাব্যতা বাড়ে। গ্যাসের ক্ষেত্রে দ্রাব্যতা বলিতে 100 মিলিলিটার সংপৃক্ত দ্রাবকে যে আয়তন গ্যাস দ্রাবিত আছে 0°C ও এক বায়ুমণ্ডল চাপে তাহা কত মিলিলিটার তাহাই বুঝায়। সোডা ওয়াটার (Soda water), লেমনেড ইত্যাদি পানীয় দ্রবণে অতিরিক্ত চাপে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস দ্রাবিত থাকে বলিয়া বোতলের ছিপি খুলিলে ঐ উষ্ণতায় কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসের দ্রাব্যতার অতিরিক্ত গ্যাস বাহির হইয়া যায়।]

প্রশ্ন। দ্রাব্যতা কাহাকে বলে? উষ্ণতার সহিত দ্রাব্যতার সম্পর্ক কি প্রকার?

III-3. রাসায়নিক চিহ্ন, সংকেত ও সমীকরণ (Chemical Symbols, Formulas and Equations)।

গণিতে যোগ, বিয়োগ ইত্যাদি কথার বদলে নানারকম চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। আবার কোথাও বিভিন্ন সংকেত ও সমীকরণের সাহায্যে সংক্ষেপে বিভিন্ন বিষয় বুঝান হয়। শর্টহ্যাণ্ড (Shorthand) নামক দ্রুতলিখন পদ্ধতিতে বিভিন্ন সাংকেতিক চিহ্নের সাহায্যে কথা সংক্ষেপে ও তাড়াতাড়ি লেখা যায়। রসায়নেও একই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন চিহ্ন, সংকেত ও সমীকরণ ব্যবহার করা হয়। 'চিহ্ন' কথাটি মৌলের নাম ও উহার পরমাণু এবং 'সংকেত' কথাটি মৌলের অণু ও যৌগের অণু বা যৌগের নামের বদলে ব্যবহৃত হয়। পদার্থের রাসায়নিক পরিবর্তন বুঝাইতে রাসায়নিক সমীকরণ ব্যবহার করা হয়। নিচের তিনটি উপবিভাগে ইহাদের সম্বন্ধে আলাদা করিয়া বলা হইতেছে।

বিভিন্ন দেশে কোথাও কোথাও একই মৌলের দেশীয় ভাষায় বিভিন্ন নাম থাকিলেও সমস্তদেশের রসায়নবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন মৌলের একই নাম ব্যবহার করেন। আমরাও তাহাই করিব। নামগুলি আন্তর্জাতিক।

III-3.1. রাসায়নিক চিহ্ন (Chemical symbols)।

মৌলের চিহ্ন ঠিক করার ব্যাপারে সুইডিস বিজ্ঞানী বার্জেলিয়াসের (Berzelius, 1811 খ্রীঃ) নির্দেশিত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। এই পদ্ধতি অনুযায়ী কোন মৌলের বিশদ ল্যাটিন, গ্রীক বা অন্য নামের বদলে সংক্ষেপে এই মৌলের নামের প্রথম একটি বা দুইটি অক্ষর অথবা প্রথম অক্ষরের সঙ্গে অন্য একটি অক্ষর লেখা হয়। নিচে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হইল।

চলতি বাংলা নাম	ইংরেজী নাম	ল্যাটিন বা গ্রীক নাম	রাসায়নিক চিহ্ন
সোনা	Gold	Aurum	Au
রূপা	Silver	Argentum	Ag

চলতি বাংলা নাম	ইংরেজী নাম	ল্যাটিন বা গ্রীক নাম	রাসায়নিক চিহ্ন
তামা	Copper	Cuprum	Cu
লোহা	Iron	Ferrum	Fe
দস্তা	Zinc	—	Zn
পারদ (পারা)	Mercury	Hydrargyrum	Hg
গন্ধক	Sulphur	—	S
আরগন	Argon	Argos	Ar
ক্লোরিন	Chlorine	Chloros	Cl
ফ্লুওরিন	Fluorine	Fluere	F
পটাসিয়াম	Potassium	Kalium	K
টিন	Tin	Stannum	Sn
এন্টিমনি	Antimony	Stibium	Sb
অক্সিজেন	Oxygen	—	O
হাইড্রোজেন	Hydrogen	—	H
নাইট্রোজেন	Nitrogen	—	N
কার্বন	Carbon	—	C

(পরিশিষ্টে কয়েকটি সুপরিচিত মৌলের নাম ও চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে।)

মৌলের চিহ্নের তাৎপর্য (Significance of symbols)।

কোন মৌলের নামের বদলে চিহ্ন লিখিলে (১) সাধারণত সেই মৌলের একটি পরমাণু বুঝায়। তাছাড়া (২) রাসায়নিক হিসাবের কাজে কোন মৌলের চিহ্ন সেই মৌলের পরমাণু-ভারের (Atomic weight) প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হয়। (Atomic weight দশম শ্রেণীর পাঠ্য)। (৩) মৌলের নামের সংক্ষিপ্ত রূপ হিসাবেও চিহ্নটি ব্যবহার করা হয়। H চিহ্নটি স্থান বিশেষে (১) একটি হাইড্রোজেন পরমাণু, (২) তাহার পরমাণু-ভার বা (৩) হাইড্রোজেন বুঝাইতে পারে। দুইটি হাইড্রোজেন পরমাণু বুঝাইতে 2H লেখা হয়।

প্রশ্ন। রাসায়নিক চিহ্ন (Symbol) বলিতে কি বুঝায়? উহার তাৎপর্য কি?

III-3.2. রাসায়নিক সংকেত (Chemical Formulas)। প্রকৃতিতে মৌলগুলি কখনও আলাদা ভাবে আবার কখনও অন্য মৌলের সঙ্গে রাসায়নিক ভাবে মিলিত হইয়া যৌগ গঠন করিয়া যৌগ রূপে থাকে। উহারা যে যে রূপে থাকে রাসায়নিক সংকেতের সাহায্যে প্রথমত তাহাই বুঝান হয়। তা ছাড়া অন্যান্য

বিশেষ অর্থেও ইহাদের ব্যবহার আছে। নিচে এ বিষয়ে বিশদভাবে বলা হইল। মৌলের রাসায়নিক চিহ্ন দিয়া বিভিন্ন রাসায়নিক সংকেত গঠন করা হয়।

(ক) মৌলের আণবিক সংকেত (Molecular formula)। মৌলের পরমাণু বুঝাইতে আমরা মৌলের চিহ্ন (Symbol) লিখি। কিন্তু মৌলের 'অণু' বুঝাইতে আমরা মৌলের আণবিক সংকেত (Molecular formula) ব্যবহার করি। আণবিক সংকেতে অণু গঠনকারী পরমাণুর সংখ্যা মৌলের চিহ্নের ডানপাশে একটু নিচে লেখা হয়।

হাইড্রোজেন (H), অক্সিজেন (O), ফসফরাস (P) ও সালফারের (S-এর) অণুতে যথাক্রমে ইহাদের দুইটি, দুইটি, চারটি ও আটটি পরমাণু থাকে। সেজন্য ইহাদের আণবিক সংকেত যথাক্রমে H_2, O_2, P_4, ও S_8 লেখা হয়। দুইটি হাইড্রোজেন অণু, তিনটি অক্সিজেন অণু ইত্যাদি বুঝাইতে যথাক্রমে $2H_2$, $3O_2$ ইত্যাদি লিখিতে হয়।

বিভিন্ন অর্থে মৌলের আণবিক সংকেতের ব্যবহার। (১) ইহা মৌলের অণু বুঝাইতে ব্যবহার করা হয়। (২) ইহা হইতে অণু গঠনকারী পরমাণুর সংখ্যা জানা যায়। (৩) এই সংখ্যা ও পরমাণুভারের (Atomic weight-এর) সাহায্যে মৌলের আণবিক-ভার (Molecular weight) হিসাব করা যায়। (H_2 অণুর আণবিক ভার $2 \times 1{\cdot}008 = 2{\cdot}016$)। (৪) গ্যাসীয় মৌলের ক্ষেত্রে উহার আণবিক সংকেত 'এক আয়তন' (One volume) গ্যাসের প্রতীক। বিভিন্ন গ্যাসের ক্ষেত্রে 'এক আয়তন' বলিতে একই উষ্ণতা ও চাপে উহাদের যে-কোন নির্দিষ্ট আয়তন বুঝায়।

(খ) যৌগের সংকেত (Formula of compounds) কোন যৌগে যে সকল মৌল থাকে তাহাদের চিহ্ন দিয়া যৌগের সংকেত লেখা হয়। ইহা প্রধানত দুই রকমে লেখা হয়—

(১) আনুপাতিক সংকেত (Empirical formula) ও (২) আণবিক সংকেত (Molecular formula)।

(১) আনুপাতিক সংকেত। যৌগ গঠনকারী বিভিন্ন মৌলের পরমাণুর সঠিক সংখ্যার তুলনামূলক হিসাব বুঝাইতে যে সংকেত ব্যবহার করা হয় তাহাকে আনুপাতিক সংকেত বলে। সোডিয়াম ক্লোরাইড (Sodium chloride) যৌগে সোডিয়াম ও ক্লোরিনের পরমাণুর সংখ্যা সমান সমান; অর্থাৎ $Na : Cl = 1 : 1$। সুতরাং সোডিয়াম ক্লোরাইডের সংকেত NaCl। কোন যৌগ গঠনকারী বিভিন্ন মৌলের পরমাণুর সংখ্যা একে অপরের সমান না

হইলে তাহাদের সংকেত লেখার সময় তাহাদের চিহ্ন পাশাপাশি লিখিয়া চিহ্নের ডানপাশে নিচে নিচে তাহাদের আনুপাতিক হিসাব অনুযায়ী বিভিন্ন সংখ্যা লেখা হয়। জলে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পরমাণুর অনুপাত, অর্থাৎ H : O=2 : 1। সুতরাং জলের আনুপাতিক সংকেত H_2O। একই কারণে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডের সংকেত NaOH, সালফিউরিক এসিডের সংকেত H_2SO_4।

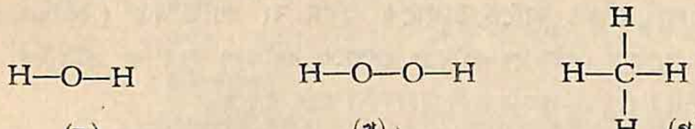
(২). **আণবিক সংকেত। যে-সকল যৌগ উহাদের অণু দিয়া গঠিত বলিয়া জানা গিয়াছে, তাহাদের ক্ষেত্রে অণু গঠনকারী বিভিন্ন মৌলের পরমাণুর সঠিক সংখ্যা যে সংকেতে বুঝান হয় তাহাকে আণবিক সংকেত বলে।** জল অণু দিয়া গঠিত এবং জলের অণুতে দুইটি হাইড্রোজেন পরমাণু ও একটি অক্সিজেন পরমাণু আছে বলিয়া জানা গিয়াছে। সুতরাং জলের আণবিক সংকেত H_2O। লক্ষ্য কর জলের ক্ষেত্রে উহার আণবিক সংকেত ও আনুপাতিক সংকেত একই। কার্বন ডাইঅক্সাইডের অণু একটি কার্বন পরমাণু ও দুইটি অক্সিজেন পরমাণু দিয়া গঠিত। সুতরাং কার্বন ডাইঅক্সাইডের আণবিক সংকেত ও আনুপাতিক সংকেত দুইই CO_2। অণু দিয়া গঠিত যৌগের ক্ষেত্রে, যেমন জল, কার্বন ডাইঅক্সাইড, অ্যামোনিয়া ইত্যাদিতে সংকেত বলিতে আণবিক সংকেতই বুঝায়।

হাইড্রোজেন পেরক্সাইড (Hydrogen peroxide)-এর অণু দুইটি হাইড্রোজেন পরমাণু ও দুইটি অক্সিজেন পরমাণু দিয়া গঠিত। উহার আণবিক সংকেত H_2O_2। হাইড্রোজেন পেরক্সাইডের সংকেত লিখিতে উহার আনুপাতিক সংকেত (অর্থাৎ HO) না লিখিয়া উহার আণবিক সংকেতই লেখা হয়। লক্ষ্য কর, কোন যৌগ অণু দিয়া গঠিত হইলে উহার আনুপাতিক সংকেত ও আণবিক সংকেত একই হইতে পারে, আবার দুইটির মধ্যে পার্থক্যও থাকিতে পারে।

যৌগের সংকেতের তাৎপর্য। (১) যৌগের সংকেত যৌগের নামের সংক্ষিপ্তরূপ হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। (২) ইহা যৌগ গঠনকারী বিভিন্ন পরমাণুর আনুপাতিক হিসাব জানায়। (৩) রাসায়নিক হিসাবের কাজে ইহা যৌগের ভারের প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হয়। (৪) গ্যাসীয় যৌগের ক্ষেত্রে উহার সংকেত 'এক আয়তন' গ্যাসের প্রতীক।

*[আনুষঙ্গিক। আণবিক সংকেত জানা থাকিলেও অণুতে কোন্ পরমাণু অন্য কোন্ পরমাণুর সঙ্গে কিভাবে যুক্ত রহিয়াছে তাহা জানা যায় না। কিন্তু তাহা জানা ও সংকেতে প্রকাশ করা রসায়নের একটি অবশ্য প্রয়োজনীয় অঙ্গ। দুই পরমাণুতে যোগ (সংযুতি) উহাদের মধ্যে ড্যাশ (—) চিহ্ন দিয়া বুঝান হয়। এইভাবে প্রকাশিত আণবিক সংকেতকে **সংযুতি সংকেত (Structural formula)** বলে।

নিচের (ক), (খ) ও (গ) চিত্রে জল (H_2O), হাইড্রোজেন পেরক্সাইড (H_2O_2) ও



(ক) (খ) (গ)

মিথেন (CH_4)-এর সংযুতি সংকেত দেখান হইল। দশম শ্রেণীতে সংযুতি সংকেত ব্যবহার করা তোমাদের দরকার হইবে।]*

প্রশ্ন। যৌগের সংকেত (formula) কয় প্রকার ? উহাদের মধ্যে পার্থক্য কি ?

III-3.3. রাসায়নিক সমীকরণ (Chemical Equations)। রাসায়নিক বিক্রিয়ায় পদার্থের পরিবর্তন ঘটিয়া নূতন পদার্থের সৃষ্টি হয়। সাধারণ ভাষায় বা সংকেতে লিখিয়া রাসায়নিক বিক্রিয়া সম্বন্ধে তথ্য জানান যায়। **বীজগণিতের সমীকরণের মত যৌগের সংকেত এবং ক্ষেত্র বিশেষে মৌলের চিহ্ন অথবা সংকেতের সাহায্যে সমীকরণ লিখিয়া বিভিন্ন পদার্থের রাসায়নিক বিক্রিয়া প্রকাশ করার পদ্ধতিকে রাসায়নিক সমীকরণ বলে।** কোন বিক্রিয়ায় বিক্রিয়ক ও বিক্রিয়জ পদার্থ কি কি তাহা সম্পূর্ণভাবে জানা থাকিলে তবেই ঐ বিক্রিয়াকে রাসায়নিক সমীকরণরূপে প্রকাশ করা সম্ভব।

(ক) রাসায়নিক সমীকরণ লেখার নিয়ম। (১) রাসায়নিক সমীকরণে সাধারণত মৌল বা যৌগের সংকেত ব্যবহার করা হয়; যেমন, হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে H_2, কার্বন ডাইঅক্সাইড অণুর ক্ষেত্রে CO_2 ইত্যাদি। ধাতুর ক্ষেত্রে উহার চিহ্ন ব্যবহার করা হয়, যেমন জিংক ধাতুর ক্ষেত্র Zn।

(২) সমীকরণে দুইটি রাসায়নিক পদার্থের চিহ্ন অথবা সংকেতের মধ্যে যোগ চিহ্ন (+) 'এবং' অর্থে ব্যবহৃত হয়। $Zn+H_2SO_4$ অর্থ জিংক এবং সালফিউরিক এসিড।

(৩) সমীকরণের বাঁদিকে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী পদার্থ (বিক্রিয়ক ; Reactant) ও ডানদিকে রাসায়নিক বিক্রিয়া হইতে জাত পদার্থের (বিক্রিয়জের) সংকেত লেখা হয়।

(৪) সমীকরণ ব্যালেন্স (সুষম বা প্রতিমিত) করা (Balancing of equation)। বিক্রিয়ার ফলে এক বা একাধিক পদার্থ হইতে এক বা একাধিক নূতন রাসায়নিক পদার্থ সৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু **কোন পরমাণুরই বিনাশ ঘটে না।** রাসায়নিক সমীকরণ ব্যালেন্স বা সুষম করা এই তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। রাসায়নিক সমীকরণ লিখিতে অবশ্যই উহাদের সুষম (বা প্রতিমিত) করিতে হইবে। **যে সমীকরণে কোন বিক্রিয়ক বা বিক্রিয়জের চিহ্ন বা সংকেত বাদ পড়ে**

নাই এবং সমীকরণের বাঁদিকে ও ডানদিকে প্রত্যেকটি মৌলের পরমাণুর সংখ্যা অপরিবর্তিত আছে তাহাকে সুষম বা প্রতিমিত (balanced) সমীকরণ বলে। এইভাবে সমীকরণ লেখাকে সমীকরণ সুষম বা প্রতিমিত করা (balancing) বলে। একটু পরেই উহার উদাহরণ পাইবে।

কোন রাসায়নিক বিক্রিয়া বুঝাইতে সাধারণ ভাষায় বাঁদিকে বিক্রিয়কগুলি (মধ্যে যোগ চিহ্ন দিয়া) ও ডানদিকে বিক্রিয়জগুলি লেখা যায়। ভাষায় না লিখিয়া বিক্রিয়ক ও বিক্রিয়জগুলিকে যথাযথ চিহ্ন ও সংকেতের সাহায্যেও বুঝান যায়। বিক্রিয়ক ও বিক্রিয়জগুলির মধ্যে একটি তীরচিহ্ন (→) দেওয়া হয়। উহার মাথা বিক্রিয়জের দিকে থাকে। এরূপ সমীকরণকে 'কাঠামো সমীকরণ' (Skeleton equation) বলে। সুষম সমীকরণে সাধারণত বিক্রিয়ক ও বিক্রিয়জের মধ্যে সমানচিহ্ন (=) দেওয়া হয় ; তবে এখানেও তীরচিহ্ন দেওয়ার প্রথা আছে। নিচে এ সকলের উদাহরণ দেওয়া হইল।

(খ) রাসায়নিক সমীকরণের কয়েকটি সহজ উদাহরণ।

(১) মারকিউরিক অক্সাইড (HgO) উত্তপ্ত করিলে মারকারি (Hg) ও অক্সিজেন তৈয়ারি হয়। এই তথ্যটি—

(i) সংক্ষেপে ভাষায়—মারকিউরিক অক্সাইড→মারকারি+অক্সিজেন (তীরের দিক বিক্রিয়জ নির্দেশ করে),

(ii) কাঠামো সমীকরণে—$HgO \rightarrow Hg + O_2$ এবং

(iii) সুষম (প্রতিমিত) সমীকরণে—$2HgO = 2Hg + O_2$ রূপে লেখা হয়।

উপরের লেখাগুলিতে বাঁদিকে বিক্রিয়ক ও ডানদিকে বিক্রিয়জ। কাঠামো সমীকরণে ভাষায় লেখা বিক্রিয়াটি চিহ্ন ও সংকেতের সাহায্যে বুঝান হইয়াছে। ইহাতে 'তীর'-চিহ্নের দুই পাশে মারকারি পরমাণুর সংখ্যা সমান হইলেও অক্সিজেন পরমাণুর সংখ্যা সমান নয়। অতএব এ সমীকরণ সুষম নয়। সুষম করিতে হইলে উহা যেভাবে লিখিতে হইবে তাহা (iii) সমীকরণে দেখান হইয়াছে।

(২) রাসায়নিক বিক্রিয়ার সাহায্যে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন মিলিত হইয়া জল উৎপন্ন করে। এই তথ্যটি—

(i) সংক্ষেপে ভাষায়—হাইড্রোজেন+অক্সিজেন→জল,

(ii) কাঠামো সমীকরণে—$H_2 + O_2 \rightarrow H_2O$ এবং

(iii) সুষম সমীকরণে—$2H_2 + O_2 = 2H_2O$ রূপে লেখা হয়।

সুষম সমীকরণটিতে দেখিবে সমীকরণের দুই পাশেই হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের পরমাণুর সংখ্যা যথাক্রমে 4 ও 2। কাঠামো সমীকরণে তাহা নয়।

(৩) জিংক ধাতু ও হাইড্রোক্লোরিক এসিডের বিক্রিয়ার ফলে জিংক ক্লোরাইড ও হাইড্রোজেন গ্যাস তৈয়ারি হয়। এই তথ্যটি—

(i) সংক্ষেপে ভাষায়—জিংক+হাইড্রোক্লোরিক এসিড→জিংক ক্লোরাইড +হাইড্রোজেন,

(ii) কাঠামো সমীকরণে—$Zn+HCl \rightarrow ZnCl_2+H_2$ এবং

(iii) সুষম সমীকরণে $Zn+2HCl=ZnCl_2+H_2$ রূপে লেখা হয়।

সুষম সমীকরণটিতে বাঁ ও ডানদিকে দুই পাশেই Zn, H ও Cl পরমাণুর সংখ্যা যথাক্রমে 1, 2 ও 2। কাঠামো সমীকরণে তাহা নয়।

এই উদাহরণগুলি হইতে রাসায়নিক সমীকরণ 'সুষম বা প্রতিমিত করা' (balancing) কাহাকে বলে এবং উহা কিভাবে করিতে হয় বুঝিতে পারিবে।

প্রশ্ন। রাসায়নিক সমীকরণ কাহাকে বলে? উহাকে কি কি ভাবে লেখা যায়? সমীকরণ সুষম করা (balancing) বলিতে কি বুঝায়? ইহার দুইটি উদাহরণ দাও। নিচের কাঠামো সমীকরণটি (Skeleton equation) সুষম কর—

$$2H_2S+O_2 \rightarrow H_2O+S$$

এই কাঠামো সমীকরণটি কি বুঝায় তাহা ভাষায় বল। (H_2S-কে হাইড্রোজেন সালফাইড বলে।)

III-3.4. রাসায়নিক সমীকরণের তাৎপর্য (Significance of Chemical Equations)।

যে-কোন সুষম রাসায়নিক সমীকরণ দেখিয়া আমরা নিচের তথ্যগুলি জানিতে পারি।

(১) কোন্ কোন্ পদার্থ হইতে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় কোন্ কোন্ পদার্থ সৃষ্ট হয়—ইহা বিক্রিয়কের রাসায়নিক ধর্ম সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা দেয়, যেমন $Zn+H_2SO_4=ZnSO_4+H_2$ সমীকরণটি দেখিয়া বলা যায় যে জিংক ও সালফিউরিক এসিডের বিক্রিয়ার ফলে জিংক সালফেট ও হাইড্রোজেন তৈয়ারি হয়।

(২) রাসায়নিক সমীকরণ দেখিয়া বোঝা যায় কোন্ কোন্ পদার্থের কয়টি অণু বা পরমাণু বিক্রিয়ার সাহায্যে কোন্ কোন্ পদার্থের কয়টি অণু তৈয়ারি করে। যেমন $2H_2+O_2=2H_2O$ সমীকরণটি দেখিয়া বোঝা যায় যে দুইটি হাইড্রোজেন অণু একটি অক্সিজেন অণুর সহিত বিক্রিয়া করিয়া জলের দুইটি অণু তৈয়ারি করে।

(৩) প্রত্যেক মৌলের পরমাণু-ভর (Atomic weight) জানা থাকায় বিক্রিয়ক ও বিক্রিয়জের সংকেত ও চিহ্ন হইতে প্রত্যেকটির পরিমাণ হিসাব করা যায়।

(৪) বিক্রিয়ক অথবা বিক্রিয়জ অথবা দুই-ই গ্যাসীয় পদার্থ হইলে রাসায়নিক বিক্রিয়ার আগে ও পরে গ্যাসীয় রাসায়নিক পদার্থের আয়তন জানা যায়।

একই চাপে ও উষ্ণতায় যে-কোন গ্যাসীয় পদার্থের অণুর সংকেত উহার 'এক আয়তন' (one volume) পরিমাণ আয়তনের প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন,

H_2 লিখিলে 'এক আয়তন' হাইড্রোজেন গ্যাস বুঝায়। (III-3.2 অংশ 'বিভিন্ন অর্থে মৌলের আণবিক সংকেতের ব্যবহার' দেখ।) নিচের সমীকরণগুলিতে বিক্রিয়ক ও বিক্রিয়জের আয়তন লক্ষ্য কর।

(ক) $H_2 + Cl_2 = 2HCl$

এই বিক্রিয়ার 'এক আয়তন' হাইড্রোজেন ও 'এক আয়তন' ক্লোরিন রাসায়নিক বিক্রিয়ার সাহায্যে 'দুই আয়তন' হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস উৎপন্ন করে। সুতরাং এই বিক্রিয়ার আগে ও পরে গ্যাসীয় পদার্থের মোট আয়তন সমান।

(খ) $2H_2 + O_2 = 2H_2O$

এই বিক্রিয়ায় 'দুই আয়তন' হাইড্রোজেন ও 'এক আয়তন' অক্সিজেন রাসায়নিক মিলনে 'দুই আয়তন' জলীয় বাষ্প উৎপন্ন করে অর্থাৎ বিক্রিয়কের তুলনায় বিক্রিয়জের আয়তন পরিমাণ 'এক আয়তন' কম।

প্রশ্ন। সুষম রাসায়নিক সমীকরণ (balanced chemical equation) হইতে আমরা কি কি তথ্য আহরণ করিতে পারি তাহা একটি করিয়া উদাহরণ দিয়া বল।

III-4. বৈদ্যুত বিভাজন (Electrolysis)। বিশুদ্ধ জলের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎপ্রবাহ কার্যত যাইতে পারে না। কিন্তু **কোন কোন যৌগের জলীয় দ্রবণের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ-ধারা সহজেই প্রবাহিত হইতে পারে। প্রবাহকালে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটিতে দেখা যায়। এই ঘটনাকে 'বৈদ্যুত বিভাজন' বা ইলেকট্রোলাইসিস (Electrolysis) বলে।**

বৈদ্যুত বিভাজন বুঝিতে পরমাণুর গঠন ও 'আয়ন' (Ion) সম্বন্ধে আমাদের সামান্য একটু জ্ঞান দরকার হইবে। দশম শ্রেণীতে গঠন সম্বন্ধে তোমরা বিশদভাবে জানিতে পারিবে। এখানে অল্পকথায় উহা বলা হইতেছে। পরবর্তী আলোচনায়, বিশেষ করিয়া এসিড, লবণ ও ক্ষারকের ক্ষেত্রে (III-5 বিভাগ), আয়ন সম্বন্ধে জ্ঞান খুব কাজে লাগিবে বলিয়া আয়ন সংক্রান্ত মৌলিক কথাগুলিও এখানে বলিয়া লওয়া হইল।

পরমাণু তিন প্রকার অতি ক্ষুদ্র কণায় গঠিত। ইহাদের নাম ইলেকট্রন (Electron), প্রোটন (Proton) ও নিউট্রন (Neutron)। ইলেকট্রন নিগেটিভ বিদ্যুৎ-আধানের (Electric charge-এর) ক্ষুদ্রতম কণা। প্রোটন পজিটিভ বিদ্যুৎ-আধানের ক্ষুদ্রতম কণা এবং ইহাতে পজিটিভ আধানের পরিমাণ ইলেকট্রনের নিগেটিভ আধানের পরিমাণের ঠিক সমান। নিউট্রনে কোন প্রকার আধান নাই; কিন্তু ওজনে উহা কার্যত প্রোটনের সমান। স্বাভাবিক অবস্থায় যে-কোন পরমাণুতে ইলেকট্রনের সংখ্যা ও প্রোটনের সংখ্যা সমান। অতএব পরমাণুতে পজিটিভ বা নিগেটিভ কোন প্রকার আধানের আধিক্য থাকে না; স্বাভাবিক অবস্থায় উহারা অনাহিত (uncharged)।

আয়ন (Ion)। অনাহিত পরমাণুতে ইলেকট্রন যুক্ত হওয়া অথবা পরমাণু হইতে ইলেকট্রন বিচ্ছিন্ন হওয়াকে পরমাণুর আয়নিত হওয়া বা **'আয়নন' (Ionization)** বলে। **স্বাভাবিকের চেয়ে এক বা একাধিক ইলেকট্রন যুক্ত অথবা ইলেকট্রন বিযুক্ত পরমাণু বা পরমাণুগুচ্ছকে আয়ন (Ion) বলে।**

পরমাণু হইতে একটি বা একাধিক ইলেকট্রন বিচ্ছিন্ন হইলে বাকী যে অংশ থাকে তাহাকে **'পজিটিভ আয়ন' (Positive ion) বা ক্যাটায়ন (Cation)** বলে। ইলেকট্রন বিচ্ছিন্ন পরমাণুতে পজিটিভ আধানের আধিক্য থাকে। হাইড্রোজেন পরমাণুতে একটি মাত্র ইলেকট্রন ও একটি মাত্র প্রোটন আছে। অতএব হাইড্রোজেন হইতে ইলেকট্রন বিচ্ছিন্ন হইলে কেবল পজিটিভ আধানবিশিষ্ট প্রোটনটি থাকে।

ইলেকট্রন-বিচ্ছিন্ন হাইড্রোজেন পরমাণুকে 'হাইড্রোজেন আয়ন' বলা হয়, এবং উহাকে H^+ চিহ্ন দিয়া বুঝান হয়। H-এর উপরে ডান দিকের যোগ চিহ্নটিতে বুঝায় যে H পরমাণু হইতে একটি ইলেকট্রন বিচ্ছিন্ন হইয়াছে এবং ফলে বাকী অংশে এক পজিটিভ আধানের আধিক্য ঘটিয়াছে। এই বাকী অংশ অর্থাৎ H^+-ই প্রোটন। তামার (Copper-এর) পরমাণু Cu হইতে একটি বা দুইটি ইলেকট্রন বিচ্ছিন্ন হইতে পারে। একটি গেলে বাকী অংশ Cu^+ লিখিয়া বুঝান হয়। দুইটি বিচ্ছিন্ন হইলে বাকী অংশকে লেখা হয় Cu^{++} অথবা Cu^{2+}। Cu^+ ও Cu^{2+} আয়ন দুইটি আলাদা করিয়া বুঝাইতে প্রথমটিকে কিউপ্রাস (Cuprous) আয়ন ও দ্বিতীয়টিকে কিউপ্রিক (Cupric) আয়ন বলা হয়। মৌলের চিহ্ন ও ইলেকট্রন কথাটির বদলে e^- চিহ্ন ব্যবহার করিয়া পরমাণু হইতে পজিটিভ আয়ন সৃজন সংক্ষেপে বুঝান যায়। হাইড্রোজেন ও কপার-এর বেলায় ইহা নিম্নরূপ :

$$H = H^+ + e^-$$

$$Cu = Cu^+ + e^-$$

$$Cu = Cu^{2+} + 2e^-$$

ধাতুর পরমাণু হইতে অনেকটা সহজেই এক বা একাধিক ইলেকট্রন বিচ্ছিন্ন হইতে পারে, এবং উহারা সহজেই পজিটিভ আয়নে পরিণত হয়। এই কারণে ধাতুকে ইলেকট্রোপজিটিভ (Electropositive) বলা হয়।

এক পরমাণু হইতে বিচ্ছিন্ন ইলেকট্রন অন্য পরমাণুতে বা পরমাণুগুচ্ছে যুক্ত হইতে পারে। যখন কোন পরমাণু বা পরমাণুগুচ্ছে এক বা একাধিক ইলেকট্রন যুক্ত হওয়ায় উহার ইলেকট্রনের সংখ্যা স্বাভাবিকের তুলনায় বেশী হয়, তখন উহাকে **নিগেটিভ আয়ন (Negative ion) বা অ্যানায়ন (Anion)** বলে। নিগেটিভ আয়নে

নিগেটিভ আধানের আধিক্য থাকে। অধাতুর পরমাণুতে ইলেকট্রন সহজেই যুক্ত হইয়া নিগেটিভ আয়ন সৃষ্টি করিতে পারে। এই কারণে অধাতুকে ইলেকট্রোনিগেটিভ (Electronegative) বলা হয়।

পজিটিভ আয়নে যেভাবে পজিটিভ আধানের আধিক্য বুঝান হয়, নিগেটিভ আয়নেও সেইরূপ, যেমন $Cl+e^-=Cl^-$ লিখিয়া ক্লোরিন পরমাণু হইতে ক্লোরিন আয়ন সৃষ্টি বুঝান হয়। অক্সিজেন পরমাণুতে দুইটি ইলেকট্রন যুক্ত হইলে উহা O^{--} বা O^2 নিগেটিভ আয়নে পরিণত হয়। সোডিয়াম নাইট্রেটে ($NaNO_3$-তে) সোডিয়ামের ত্যক্ত একটি ইলেকট্রন বাকী NO_3 অংশে যুক্ত হইয়া উহাকে NO_3^- আয়নে পরিণত করে। সোডিয়াম পরমাণু Na^+ আয়নে পরিণত হয়।

সোডিয়াম ক্লোরাইড (NaCl), হাইড্রোজেন ক্লোরাইড (HCl), সালফিউরিক এসিড (H_2SO_4) ইত্যাদিকে জলে দ্রবীভূত করিলে উহারা আয়নিত হয়। NaCl হইতে Na^+ ও Cl^- আয়ন, HCl হইতে H^+ ও Cl^- আয়ন এবং H_2SO_4 হইতে $2H^+$ ও SO_4^{2-} (সালফেট আয়ন) উৎপন্ন হয়।

$$NaCl=Na^++Cl^- ;\ HCl=H^++Cl^- ;\ H_2SO_4=2H^++SO_4^{2-}$$

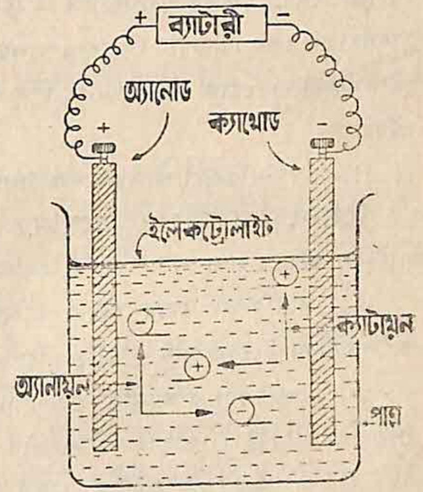
প্রশ্ন। পজিটিভ ও নিগেটিভ আয়ন কাহাদের বলে দুইটি করিয়া উদাহরণ দিয়া বুঝাও।

III-4.1. ইলেকট্রোলাইট ও নন-ইলেকট্রোলাইট (Electrolytes and Non-electrolytes)। যে সকল যৌগিক পদার্থ তরল বা দ্রাবিত অবস্থায় বিদ্যুৎ পরিবহণ করে তাহাদের ইলেকট্রোলাইট বলে। সোডিয়াম ক্লোরাইড, হাইড্রোক্লোরিক এসিড, সালফিউরিক এসিড, পটাসিয়াম হাইড্রক্সাইড (KOH), ইত্যাদি ইলেকট্রোলাইটের উদাহরণ। ইহারা জলে দ্রবীভূত হইয়া সমান সংখ্যক পজিটিভ ও নিগেটিভ আয়নে বিভক্ত হয়। এই আয়নগুলির সাহায্যে দ্রবণের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ পরিবাহিত হয়। বিদ্যুৎ পরিবাহী দ্রবণকেও 'ইলেকট্রোলাইট' বলে।

যে সকল যৌগিক পদার্থ তরল বা দ্রাবিত অবস্থায় বিদ্যুৎ পরিবহণ করে না তাহাদের নন ইলেকট্রোলাইট বলে। অর্থাৎ যাহারা ইলেকট্রোলাইট নয় তাহারাই নন-ইলেকট্রোলাইট। চিনির জলীয় দ্রবণ বিদ্যুৎ পরিবহণ করে না— চিনি নন-ইলেকট্রোলাইট।

ইলেকট্রোলাইসিস সেল (Electrolysis cell), অ্যানোড (Anode) ও ক্যাথোড (Cathode)। কোন পাত্রে ইলেকট্রোলাইটের দ্রবণে একই ধাতুর বা গ্রাফাইটের দু'খানা পাত ডুবাইয়া উহাদের ইলেকট্রিক ব্যাটারী (Electric

battery) বা বিদ্যুৎ উৎপাদক কোন ব্যবস্থার দুই প্রান্তের সঙ্গে যুক্ত করিয়া দ্রবণের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ চালনা করা যায়। দ্রবণে ডুবান পাত দু'খানাকে **'ইলেকট্রোড'** (**Electrodes**) বলে। যে পাত ব্যাটারীর নিগেটিভ প্রান্তের সঙ্গে যুক্ত থাকে তাহাকে 'নিগেটিভ ইলেকট্রোড' বা 'ক্যাথোড' (Negative electrode বা Cathode) বলে। যে পাত ব্যাটারীর পজিটিভ প্রান্তের সঙ্গে যুক্ত থাকে তাহাকে 'পজিটিভ ইলেকট্রোড' বা 'অ্যানোড' (Positive electrode বা Anode) বলে। ব্যাটারীর মত এখানেও ক্যাথোড ও অ্যানোড বুঝাইতে যথাক্রমে '−' চিহ্ন ও '+' চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। কোন পাত্রের অ্যানোড, ক্যাথোড ও ইলেকট্রোলাইটের সমষ্টিকে **ইলেকট্রোলাইসিস সেল** (**Electrolysis cell**) বা **ইলেকট্রোলাইটিক সেল** (**Elctrolytic cell**) বলে। (III.2 চিত্র দেখ।)



III.2 চিত্র

*[**ইলেকট্রোলাইটের দ্রবণে বৈদ্যুত-রাসায়নিক ক্রিয়া** (**Electro-chemical action in a cell**)। ইলেকট্রোলাইসিস সেলের অ্যানোড ও ক্যাথোড ব্যাটারীর সঙ্গে যুক্ত থাকিলে :

(১) ক্যাথোডে ব্যাটারী হইতে ইলেকট্রন আসিয়া উহাতে নিগেটিভ আধানের আধিক্য ঘটায় ;

(২) অ্যানোড হইতে কিছু ইলেকট্রন ব্যাটারীতে চলিয়া যাওয়ায় অ্যানোডে ইলেকট্রন ঘাটতি হওয়ায় উহাতে পজিটিভ আধানের আধিক্য ঘটে ;

(৩) ইহাতে দ্রবণের নিগেটিভ আয়নগুলি অ্যানোডের পজিটিভ আধানে আকৃষ্ট হইয়া অ্যানোডে যায় এবং অ্যানোডকে নিজ আধান দিয়া অনাহিত পরমাণু বা পরমাণুগুচ্ছে পরিণত হয় ;

(৪) পজিটিভ আয়নগুলি ক্যাথোডের নিগেটিভ আধানে আকৃষ্ট হইয়া ক্যাথোডে গিয়া ক্যাথোড হইতে ইলেকট্রন নিয়া অনাহিত পরমাণু বা পরমাণুগুচ্ছে পরিণত হয় ;

(৫) এইভাবে অ্যানোডে ও ক্যাথোডে যুক্ত পরমাণু বা পরমাণুগুচ্ছগুলি (ক) দ্রবণের সহিত বা (খ) ইলেকট্রোডের পদার্থের সহিত রাসায়নিক বিক্রিয়া করিতে

পারে। পদার্থগুলির প্রকৃতি বুঝিয়া অ্যানোড ও ক্যাথোডের কাছে নানারকম রাসায়নিক বিক্রিয়া হইতে পারে।

(৬) শেষ পর্যন্ত দুই ইলেকট্রোডে যে বিক্রিয়জ আমরা পাই রাসায়নিক সমীকরণের সাহায্যে যে রকম বিক্রিয়ায় তাহাদের পাওয়া যায় সেই বিক্রিয়াই আমরা প্রকাশ করি। ইহার সাহায্যে বোঝা যায় কোন্ যৌগ ইলেকট্রোলাইসিসে বিশ্লিষ্ট হইয়া কি উৎপন্ন করিয়াছে।

III-4.2. উপবিভাগে জলের ইলেকট্রোলাইসিসে ইহার একটি উদাহরণ পাইবে।]*

ইলেকট্রোলাইসিসের প্রয়োগ। পরীক্ষাগারে ও বিভিন্ন শিল্পে ইলেকট্রোলাইসিস প্রক্রিয়া বহুল ব্যবহৃত হয়। এখানে কয়েকটি প্রয়োগের উল্লেখ করা হইল :

(১) নানাপ্রকার যৌগ হইতে হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, ক্লোরিন, সোডিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদি ধাতু ও অধাতু পাইতে,

(২) সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড (Sodium hydroxide, NaOH), হাইড্রোজেন পেরক্সাইড (H_2O_2) প্রভৃতি বিভিন্ন যৌগ পাইতে ;

(৩) ইলেকট্রোপ্লেটিং করিতে (III-4.3. বিভাগ) ইত্যাদি। অন্যান্য বহু কাজেও ইলেকট্রোলাইসিসের ব্যবহার আছে।

প্রশ্ন। ইলেকট্রোলাইট ও ইলেকট্রোলাইসিস কথা দুইটির অর্থ উদাহরণ দিয়া বুঝাও। ইলেকট্রোলাইসিস সেলের গঠন বর্ণনা কর। ইহার অ্যানোড ও ক্যাথোড কাহাদের বলে? সেলের ভিতরে বৈদ্যুত-রাসায়নিক ক্রিয়া কিভাবে ঘটে।

III-4.2. জলের ইলেকট্রোলাইসিস (Electrolysis of water). বিশুদ্ধ জলের মধ্য দিয়া বিদ্যুৎপ্রবাহ কার্যত যায় না। কিন্তু জলে হাইড্রোক্লোরিক এসিড, সালফিউরিক এসিড, সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড ইত্যাদি কোন ইলেকট্রোলাইট সামান্য পরিমাণে যোগ করিলেই উহা আয়নিত হইয়া জলীয় দ্রবণকে বিদ্যুৎ পরিবাহী করে।

জলে একটু সালফিউরিক বা হাইড্রোক্লোরিক এসিড দিয়া দ্রবণে প্ল্যাটিনাম ধাতুর দুইটি ইলেকট্রোড ডুবাইয়া ব্যাটারীর সাহায্যে জলের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ চালনা করিলে জলের ইলেকট্রোলাইসিস হয়। ইহাতে নিগেটিভ ইলেকট্রোডে (ক্যাথোডে) হাইড্রোজেন গ্যাস এবং পজিটিভ ইলেকট্রোডে (অ্যানোডে) অক্সিজেন গ্যাস উৎপন্ন হয়।

ইলেকট্রোড হইতে বুদ্বুদের আকারে যে গ্যাস ওঠে তাহার সবটা ইলেকট্রোডের উপর উবুড় করা আলাদা আলাদা কাচের নলে ধরিতে পারিলে দেখা যাইবে হাইড্রোজেন গ্যাসের আয়তন অক্সিজেনের দ্বিগুণ। বিদ্যুতের সাহায্যে জলের রাসায়নিক বিশ্লেষণ

হইয়া উহা দুই আয়তন হাইড্রোজেন ও এক আয়তন অক্সিজেনে পরিণত হয়। বিক্রিয়াটি নিচের সমীকরণের আকারে লেখা যায় :

$$2H_2O = 2H_2\uparrow + O_2\uparrow \qquad (ক)$$

(কোন রাসায়নিক চিহ্ন বা সংকেতের পাশে উর্ধ্বমুখী তীরচিহ্ন (↑) থাকিলে বুঝাইবে যে উহা গ্যাস রূপে বাহির হয়।)

*[জলের ইলেকট্রোলাইসিসে নিচের ক্রিয়াগুলি ঘটে বলিয়া গ্যাস দুইটি একটি আরেকটির দ্বিগুণ আয়তনে উৎপন্ন হয় :

(a) জলের আয়নিত হওয়ায় : $4H_2O = 4H^+ + 4OH^-$

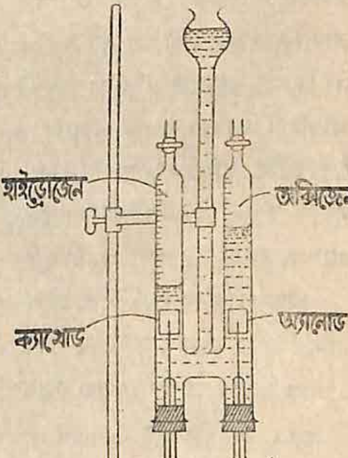
(b) জলের ইলেকট্রোলাইসিসে :

(i) ক্যাথোড-বিক্রিয়া : $4H^+ + 4e^- = 2H_2$

(ii) অ্যানোড-বিক্রিয়া : $4OH^- = O_2 + 2H_2O + 4e^-$

গণিতের সমীকরণের নিয়ম অনুযায়ী (a) ও (b)-এর সমীকরণগুলি যোগ করিয়া (ক) চিহ্নিত সমীকরণটি পাওয়া যায়।]*

জলের ইলেকট্রোলাইসিসের যন্ত্র। ইহা গঠনে নানাপ্রকারের হইতে পারে। একটির রূপ III.3 চিত্রে দেখান হইয়াছে। উহাতে একটি U-নলের দু পাশের দুইটি বাহুর মাথায় স্টপকক (Stopcock, অর্থাৎ দরকার মত খোলা বা বন্ধ করা যায় এমন ছিপি) লাগান আছে। U-নলের মাঝখানে আর একটি সোজা নল জোড়া আছে ; উহার মাথায় একটি ফানেল (Funnel)। দুই বাহুর মাথার স্টপকক খোলা রাখিয়া ফানেল দিয়া অল্প সালফিউরিক এসিড মেশান জল ঢালিয়া পাশের নল দুইটি ভরা হয়। তারপর দুই নলের মাথার ছিপি বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।



III 3 চিত্র

U-নলের দুই বাহুর নিচের দিকে দুইটি ছিপির মধ্য দিয়া কাচের দুইটি সরু নল ঢুকান আছে। নল দুইটির ভিতর দিয়া প্ল্যাটিনাম ধাতুর তার গিয়াছে। তারের মাথায় দু'খানা প্ল্যাটিনাম পাত লাগান। এই পাত এসিড মেশান জলের সংস্পর্শে থাকে। ইহাদের একটি ক্যাথোড ও অন্যটি অ্যানোডরূপে ব্যবহৃত হয়। এ উদ্দেশ্যে তারের সাহায্যে এই পাত দু'খানার একখানাকে ব্যাটারীর '+' চিহ্ন যুক্ত প্রান্তে ও অন্যখানাকে '−'

চিহ্ন যুক্ত প্রান্তে যোগ করা হয়। ইহাতে প্রথম পাত সেলের অ্যানোড ও দ্বিতীয় পাত সেলের ক্যাথোড হয়। এইভাবে পাত দু'খানা ব্যাটারীর সঙ্গে যুক্ত হইলে জলের বৈদ্যুত বিভাজন হয়।

ইলেকট্রোলাইসিস যন্ত্রের ক্যাথোডে হাইড্রোজেন গ্যাস ও অ্যানোডে অক্সিজেন গ্যাসের আয়তন মাপিলে দেখা যায়, হাইড্রোজেন গ্যাস অক্সিজেন গ্যাসের দ্বিগুণ পরিমাণে উৎপন্ন হইয়াছে।

প্রশ্ন। জলের ইলেকট্রোলাইসিস করার একটি যন্ত্র বর্ণনা কর। জলের ইলেকট্রোলাইসিস কিভাবে হয় বল।

III-4.3. ইলেকট্রোপ্লেটিং (Electroplating)। ইলেকট্রোপ্লেটিং বলিতে ইলেকট্রোলাইসিসের সাহায্যে কোন ধাতব বস্তুতে দেখিতে সুন্দর, বা কম ক্ষয়িষ্ণু, বা জল ও বায়ুর ক্রিয়া বেশী প্রতিরোধ করিতে পারে এমন অন্য কোন ধাতুর প্রলেপ দেওয়া বুঝায়। ধাতব কোন যন্ত্রাংশ ক্ষয় হইয়া ছোট হইলে ইলেকট্রোলাইসিসের সাহায্যে উহার উপরে সেই ধাতুর প্রলেপ জমাইয়া ক্ষয়িত অংশকে ঠিকমত মানে (মাপে) আনা যায়।

যে বস্তুতে প্রলেপ দেওয়া হইবে তাহাকে খুব ভাল করিয়া পরিষ্কার করিয়া উহাকে ইলেকট্রোলাইটিক সেলের ক্যাথোড করা হয়। যে ধাতুর প্রলেপ দেওয়া হইবে তাহাকে করা হয় ঐ সেলের অ্যানোড। ইলেকট্রোলাইট হিসাবে সেলে এমন যৌগ লওয়া হয় যাহাতে দ্বিতীয় ধাতুটি (অর্থাৎ যাহার প্রলেপ দেওয়া হইবে তাহা) আয়নিত অবস্থায় আছে। যাহাতে প্রলেপ্য ধাতব বস্তুটির উপর প্রলেপ সকলদিকে সুষমভাবে পড়িতে পারে সেজন্য কখন কখন উহাকে (ক্যাথোডকে) আস্তে আস্তে ঘুরান হয়। কখনও বা অ্যানোড (অর্থাৎ যে ধাতুর প্রলেপ দেওয়া হইবে তাহা) প্রলেপ্য বস্তুটিকে সম্পূর্ণ ঘিরিয়া রাখে।

পরবর্তী পৃষ্ঠার সারণিতে বাঁদিকে প্রথম স্তম্ভে যে ধাতুর প্রলেপ দিতে হইবে তাহার নাম, দ্বিতীয় স্তম্ভে যে ধাতুর উপরে প্রলেপ পড়িবে তাহার নাম ও তৃতীয় স্তম্ভে যে উদ্দেশ্যে ধাতব প্রলেপ দেওয়া হয় সেই উদ্দেশ্যগুলি লেখা হইয়াছে।

প্রশ্ন। ইলেকট্রোপ্লেটিং কাহাকে বলে? উহাতে কি কি উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে? কোন ধাতব বস্তুকে ইলেকট্রোপ্লেট করিতে কিরূপ ব্যবস্থা করা হয়?

III-5. এসিড (Acids), ক্ষারক (Bases) ও লবণ (Salts)। বহু যৌগের অনেকটা একই ধরনের রাসায়নিক ধর্ম থাকিলে উহাদের এক শ্রেণীভুক্ত করিয়া বিশেষ নাম দেওয়া হয়। এসিড (Acids), ক্ষারক (Bases) ও লবণ (Salts) এই রকম তিনটি বিশেষ শ্রেণীর যৌগের নাম।

যে ধাতুর প্রলেপ	যে ধাতুর উপর প্রলেপ	প্রলেপের উদ্দেশ্য
সোনা	পিতল	নকল গহনা বানান।
রূপা	তামা, পিতল	টেবিলে ব্যবহার্য বাসনপত্র বানান।
নিকেল	লোহা	সাইকেল ইত্যাদির লোহার অংশে মরিচা না ধরার জন্য।
তামা	লোহা	লোহার উপর নিকেল, সোনা বা রূপার প্রলেপ দেওয়ার ভিত (ভিত্তি) হিসাবে।
ক্রোমিয়াম	পিতল	মোটর গাড়ির অংশ, দরজার হাতল, পরদা ঝুলাইবার ডাণ্ডা ইত্যাদির উপর যাহাতে আঁচড় না লাগে বা উহা ময়লা না হয়।
জিংক বা ক্যাডমিয়াম	লোহা	মরিচা না পড়ার জন্য।
প্ল্যাটিনাম	পিতল	বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির উপরটা শক্ত করা এবং এসিড ইত্যাদিতে ক্ষয় হওয়া বন্ধ করা।

III-5.1. এসিড : সংজ্ঞা। যে সকল যৌগ জলে দ্রাবিত হইয়া হাইড্রোজেন আয়ন, H^+, উৎপন্ন করে তাহাদের এসিড বলে।

উদাহরণ : হাইড্রোক্লোরিক এসিড (HCl), নাইট্রিক এসিড (HNO_3), সালফিউরিক এসিড (H_2SO_4) ইত্যাদি। ইহারা জলে আয়নিত হইয়া এক বা একাধিক H^+ আয়ন উৎপন্ন করে।

$$HCl = H^+ + Cl^-$$ (ক্লোরাইড আয়ন)

$$HNO_3 = H^+ + NO_3^-$$ (নাইট্রেট আয়ন)

$$H_2SO_4 = 2H^+ + SO_4^{2-}$$ (সালফেট আয়ন)

এসিডের ধর্ম। এসিডের কোনটি তরল, যেমন সালফিউরিক এসিড ও নাইট্রিক এসিড, কোনটি বা কঠিন, যেমন বরিক এসিড (Boric acid ; H_3BO_3)। হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাসের জলীয় দ্রবণ হাইড্রোক্লোরিক এসিড।

(১) এসিডের স্বাদ সাধারণত টক।

(২) এসিডের কোন কোনটি (যেমন নাইট্রিক এসিড ও সালফিউরিক এসিড) ত্বকের ক্ষতি করে।

(৩) এসিডের জলীয় দ্রবণের সংস্পর্শে লিটমাস (Litmus) নামক পদার্থের রং নীল হইতে লালে পরিবর্তিত হয়।

(৪) ধাতুর সঙ্গে বিক্রিয়ায় অনেক এসিডেরই হাইড্রোজেন আয়ন ধাতু দিয়া প্রতিস্থাপিত হয়। ইহাতে হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হয়। জিংক ধাতু সালফিউরিক এসিডের সঙ্গে বিক্রিয়ায় হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন করে।

$$Zn+H_2SO_4=ZnSO_4+H_2\uparrow$$

(৫) ক্ষারকজাতীয় যৌগের সঙ্গে বিক্রিয়ায় এসিড লবণজাতীয় যৌগ উৎপন্ন করে। অনেক ক্ষেত্রে এই সঙ্গে জলও উৎপন্ন হয়। যেমন, হাইড্রোক্লোরিক এসিডের সঙ্গে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড (NaOH) ক্ষারকের বিক্রিয়ায় সোডিয়াম ক্লোরাইড (লবণ) উৎপন্ন হয়।

$$HCl+NaOH=NaCl+H_2O$$

এই বিক্রিয়ায় হাইড্রোক্লোরিক এসিডের হাইড্রোজেন আয়ন (H^+) সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডের সোডিয়াম আয়ন (Na^+) দিয়া প্রতিস্থাপিত হওয়ার ফলে সোডিয়াম ক্লোরাইড (NaCl) (লবণ) উৎপন্ন হইয়াছে।

প্রশ্ন। এসিডের সংজ্ঞা দাও। এসিডের প্রধান ধর্মগুলি বল ও পাঁচটি এসিডের নাম কর।

III-5.2. ক্ষারক। (১) হাইড্রক্সিল আয়ন (OH^-)-যুক্ত প্রতিটি যৌগ এবং (২) যে সকল যৌগে OH দল (group) থাকায় জলে দ্রাবিত হইয়া উহারা OH^- আয়ন দেয় তাহাদের **ক্ষারক** বলে। NaOH, KOH, NH_4OH, $Ha(OH)_2$, (ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড) $Mg(OH)_2$ (ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রক্সাইড) ইত্যাদি ক্ষারক ইহাদের মধ্যে যে সকল ক্ষারক জলে দ্রাবিত হইয়া প্রচুর পরিমাণে হাইড্রক্সিল আয়ন (OH^-) দেয় তাহাদের **ক্ষার** (Alkali) বলে। সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড (NaOH), পটাসিয়াম হাইড্রক্সাইড (KOH) ক্ষারের উদাহরণ। ত্বকের ক্ষতি করে বলিয়া NaOH ও KOH কে কষ্টিক সোডা (Caustic soda) এবং কষ্টিক পটাশ (Caustic potash)-ও বলা হয়। NaOH, KOH কঠিন পদার্থ। অ্যামোনিয়া গ্যাসের জলীয় দ্রবণ অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড (Ammonium hydroxide ; NH_4OH) ও ক্ষারক।

ক্ষারকের ধর্ম। (১) ক্ষারকের স্বাদ সাধারণত কষায়।

(২) ক্ষারক জলে দ্রাবিত হইয়া OH^- আয়ন দেয়।

(৩) ক্ষারকের জলীয় দ্রবণে লিটমাসের লাল রং নীলে পরিবর্তিত হয়।

(৪) সব ক্ষারকই এসিডের সঙ্গে বিক্রিয়ায় লবণজাতীয় যৌগ ও জল উৎপন্ন করে। পটাসিয়াম হাইড্রক্সাইড হাইড্রোক্লোরিক এসিডের সঙ্গে বিক্রিয়ায় পটাসিয়াম ক্লোরাইড (লবণ) ও জল উৎপন্ন করে।

$$KOH+HCl=KCl+H_2O$$

অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড হাইড্রোক্লোরিক এসিডের সঙ্গে বিক্রিয়ায় অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড (লবণ) ও জল উৎপন্ন করে।

$$NH_4OH+HCl=NH_4Cl+H_2O$$

প্রশ্ন। ক্ষারক কাহাকে বলে ? ক্ষারকের তিনটি উদাহরণ দাও। উহাদের প্রধান ধর্মগুলি বল।

III-5.3. লবণ। এসিড ও ক্ষারকের বিক্রিয়ায় জল ছাড়া অন্য যে যৌগ উৎপন্ন হয় তাহাকে **লবণ** বলে। উপরে দেওয়া III-5.1 ও III-5.2 বিভাগে এসিড ও ক্ষারকের বিক্রিয়ার উদাহরণগুলিতে NaCl, KCl ও NH_4Cl লবণ।

লবণের ধর্ম। (১) লবণের স্বাদ সাধারণত নোনতা বা নোনতা-কষায়।

(২) লবণ সাধারণত লিটমাসের রং পরিবর্তন করে না।

III-5.4. প্রশমন (Neutralization)। এসিডের সঙ্গে ক্ষারকের যে রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে দ্রবণে এসিড বা ক্ষারকের আধিক্য থাকে না তাহাকে প্রশমন বলে। জলীয় দ্রবণে এই বিক্রিয়ায় প্রধানত এসিডের হাইড্রোজেন আয়ন (H^+)-এর সঙ্গে ক্ষারকের হাইড্রক্সিল (OH^-) আয়ন যুক্ত হয় ও জল উৎপন্ন হয়। একই সঙ্গে লবণও উৎপন্ন হয়।

$$H^++OH^-=H_2O$$

হাইড্রোক্লোরিক এসিড ও সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড (NaOH)-এর বিক্রিয়ায় সোডিয়াম ক্লোরাইড ও জল উৎপন্ন হয়।

$$HCl+NaOH=NaCl+H_2O$$

*[জলে হাইড্রোক্লোরিক এসিড, সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড ও সোডিয়াম ক্লোরাইড আয়নিত অবস্থায় থাকে বলিয়া এই বিক্রিয়া নিচের মতও লেখা যায়।

$$H^++Cl^-+Na^++OH^-=Na^++Cl^-+H_2O$$

লক্ষ্য কর এই বিক্রিয়ায় একমাত্র H^+ আয়ন ও OH^- আয়ন বিক্রিয়া করে এবং Na^+ আয়ন ও Cl^- আয়ন বিক্রিয়া করে না। এই বিক্রিয়ার আগে ও পরে Na^+ আয়ন ও Cl^- আয়নের ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন ঘটে না।

নাইট্রিক এসিড (HNO_3) ও পটাসিয়াম হাইড্রক্সাইড (KOH)-এর বিক্রিয়াও এরূপ প্রশমন ক্রিয়ার উদাহরণ।

$$HNO_3+KOH=KNO_3+H_2O$$

এই বিক্রিয়াও নিচের মত লেখা যায় ;

$$H^++NO_3^-+K^++OH^-=K^++NO_3^-+H_2O$$

জলীয় দ্রবণ শুকাইলে উপরের এই বিক্রিয়া দুইটি হইতে যথাক্রমে সোডিয়াম ক্লোরাইড ($NaCl$) ও পটাসিয়াম নাইট্রেট (KNO_3) লবণ দুইটি কঠিন অবস্থায় পাওয়া যায়।]*

উপরের এসিড, ক্ষারক ও লবণের আলোচনায় লক্ষ্য করিয়া থাকিবে এসিডের সংস্পর্শে লিটমাসের রং লাল ও ক্ষারকের সংস্পর্শে উহার রং নীল ; লবণের সংস্পর্শে সাধারণত লিটমাসের রং পরিবর্তিত হয় না। সুতরাং কোন ক্ষারকের (যেমন $NaOH$-এর) দ্রবণে লিটমাস দিলে উহার রং নীল হইবে। উহাতে ক্রমাগত অল্প পরিমাণে এসিড (যেমন HCl) দিতে থাকিলে নিচের সমীকরণ অনুযায়ী বিক্রিয়া ঘটিয়া ক্ষারকের পরিমাণ ক্রমশ কমিতে থাকিবে।

$$HCl+NaOH=NaCl+H_2O$$

এক সময় দ্রবণে ক্ষারক বা এসিড কোনটির আধিক্য থাকিবে না এবং দ্রবণে লিটমাসের রং লাল ও নীলের মাঝামাঝি হইবে। এই সময় **প্রশমন সম্পূর্ণ** হইয়াছে। ক্ষারক সম্পূর্ণ প্রশমিত হইয়া দ্রবণে এসিডের পরিমাণ বেশী হওয়ামাত্র দ্রবণের রং পরিবর্তিত হইয়া লাল হইবে।

এসিড দিয়া ক্ষারকের বা ক্ষারক দিয়া এসিডের সম্পূর্ণ প্রশমন লিটমাসের সাহায্যে বোঝা যায়।

প্রশ্ন। প্রশমন কাহাকে বলে ? প্রশমনের দুইটি উদাহরণ দাও।

III-6. জারণ ও বিজারণ (Oxidation and Reduction)।

জারণ (Oxidation) বলিতে কোন মৌল বা যৌগের সঙ্গে অক্সিজেন, ফ্লুওরিন, ক্লোরিন প্রভৃতি বিশেষ কয়েকটি অধাতু জাতীয় মৌলের রাসায়নিক বিক্রিয়া বুঝায়। অধাতু জাতীয় এই বিশেষ মৌলগুলিকে **জারক (Oxidising agent বা Oxidant)** বলে। জারণে এই বিশেষ মৌলগুলির কোনটি অন্য কোন মৌল বা যৌগের সঙ্গে যুক্ত হয়, বা ক্ষেত্রবিশেষে কোন কোন যৌগ হইতে হাউড্রোজেন সরাইয়া নেয়। পার্শ্ববর্তী পৃষ্ঠায় জারণের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হইল :

(১) $C+O_2=CO_2$

(২) $2H_2+O_2=2H_2O$

(৩) $4NH_3+3O_2=2N_2+6H_2O$

(৪) $2Na_2SO_3+O_2=2Na_2SO_4$
(সোডিয়াম সালফাইট) (সোডিয়াম সালফেট)

(৫) $C+2F_2=CF_4$ (কার্বন টেট্রাফ্লুওরাইড)

(৬) $2Fe+3F_2=2FeF_3$ (ফেরিক ফ্লুওরাইড)

(৭) $H_2+Cl_2=2HCl$

(৮) $2FeCl_2+Cl_2=2FeCl_3$
(ফেরাস ক্লোরাইড) (ফেরিক ক্লোরাইড)

(৯) $SnCl_2+Cl_2=SnCl_4$
(স্ট্যানাস ক্লোরাইড) (স্ট্যানিক ক্লোরাইড)

সমীকরণগুলির (১) হইতে (৪) অক্সিজেন দিয়া জারণ, (৫) ও (৬) ফ্লুওরিন দিয়া ও শেষের তিনটি ক্লোরিন দিয়া।

(৩)-এর সমীকরণটি জারণে যৌগ হইতে হাইড্রোজেন সরানোর উদাহরণ।

বিজারণ (Reduction) জারণের বিপরীত প্রক্রিয়া। যে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় বিভিন্ন ধাতু ও হাইড্রোজেন, কার্বন প্রভৃতি বিশেষ কয়েকটি অধাতু অন্য কোন মৌল বা যৌগের সঙ্গে যুক্ত হয়, বা ক্ষেত্রবিশেষে কোন কোন যৌগ হইতে অক্সিজেন, ফ্লুওরিন, ক্লোরিন প্রভৃতি মৌল সরাইয়া নেয়, তাহাকে **বিজারণ (Reduction)** বলে। এরূপ বিক্রিয়ায় ধাতুগুলি, হাইড্রোজেন ও কার্বন ইত্যাদিকে **বিজারক (Reducting agent বা Reductant)** বলে।

(১) $H_2+F_2=2HF$

(২) $CuO+H_2=Cu+H_2O$
(কিউপ্রিক অক্সাইড)

(৩) $ZnO+C=Zn+CO$
(জিংক অক্সাইড)

(৪) $Cr_2O_3+2Al=2Cr+Al_2O_3$
(ক্রোমিক অক্সাইড) (অ্যালুমিনিয়ম অক্সাইড)

(৫) $2CrCl_3+H_2 =2CrCl_2+2HCl$
(ক্রোমিক ক্লোরাইড) (ক্রোমাস ক্লোরাইড)

(৬) $Zn+2HCl=ZnCl_2+H_2$

(১), (২) ও (৫) সমীকরণে হাইড্রোজেন বিজারক, তৃতীয়ে কার্বন, চতুর্থ ও ষষ্ঠে অ্যালুমিনিয়াম ও জিংক ধাতু বিজারক।

প্রথম সমীকরণে হাইড্রোজেন ফ্লুওরিনের সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে। অন্য সমীকরণগুলিতে লক্ষ্য কর বিজারণে কোন যৌগ হইতে বিজারক দিয়া অক্সিজেন, ক্লোরিন ইত্যাদি জারক সরাইয়া লওয়া হইতেছে।

দুইটি মৌল বা যৌগের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় একটি জারকের কাজ করিলে অন্যটি বিজারকের কাজ করে, অর্থাৎ **জারণ ও বিজারণ একই সঙ্গে ঘটে।**

$$ZnO+C=Zn+CO$$

সমীকরণে C (কার্বন) ZnO-কে বিজারিত করিয়া Zn-এ পরিণত করিয়াছে এবং নিজে ZnO দিয়া জারিত হইয়া CO-তে পরিণত হইয়াছে। এখানে ZnO জারক এবং C বিজারক ; জারণ-বিজারণ একই সঙ্গে হইতেছে। কোথাও জারণ হইলে সেইসঙ্গে জারক বিজারিত হয়। আগেকার উদাহরণগুলিতে অক্সিজেন, ফ্লুওরিন, ক্লোরিন, কপার অক্সাইড (CuO) ইত্যাদি জারক এবং হাইড্রোজেন, কার্বন, লোহা, স্ট্যানাস ক্লোরাইড ($SnCl_2$), ফেরাস ক্লোরাইড ($FeCl_2$) ইত্যাদি বিজারক।

*[**জারক ও বিজারক কথা দুইটি আপেক্ষিক,** কেন না একই মৌল জারক কি বিজারক হিসাবে কাজ করিবে তাহা রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী অন্য মৌল বা যৌগের ধর্মের উপর নির্ভর করে। উদাহরণ দেখ—সালফার ও অক্সিজেনের বিক্রিয়ায় সালফার বিজারক কিন্তু লোহার সঙ্গে বিক্রিয়ায় সালফার জারক :

$S+O_2=SO_2$ (অক্সিজেন সালফারকে জারিত করিল ; সালফার বিজারক)।

$Fe+S=FeS$ (সালফার লোহাকে জারিত করিল , সালফার জারক)।

জারণ-বিজারণের যে সংজ্ঞা আমরা দিয়াছি তাহা প্রাথমিক স্তরের সংজ্ঞা।]*

প্রশ্ন। জারণ ও বিজারণ কাহাকে বলে উদাহরণ দিয়া বুঝাও। তিনটি করিয়া জারক ও বিজারকের নাম বল।

একটি সমীকরণ লিখিয়া জারণ-বিজারণ যে একসঙ্গে ঘটে তাহা দেখাও।

III-7. বায়ু সম্বন্ধীয় (About air । বায়ু আয়তনে প্রায় 78% নাইট্রোজেন ও 21% অক্সিজেনের মিশ্রণ। ইহা ছাড়া বায়ুতে প্রায় 1% আর্গন (Argon) নামে একটি গ্যাস এবং অতি সামান্য পরিমাণে আরও কয়েকটি গ্যাস, প্রায় 0·03%, কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং সামান্য জলীয় বাষ্পও আছে। জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বিভিন্ন স্থানে ও সময়ে বিভিন্ন হয় ; ইহার কথা আমরা আলোচনা করিব না। বাকী গ্যাস-গুলির অনুপাত কার্যত স্থির থাকে। কিন্তু উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহ গঠনে নাইট্রোজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইড দরকার। বায়ু হইতে এ দুটি বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় নেওয়া হয়। অনবরত নিতে থাকিলে গ্যাস দুটির পরিমাণ বায়ুতে ক্রমশ কমার কথা। কিন্তু তাহা হইলে উহাদের পরিমাণ স্থির থাকে কি করিয়া ? নিশ্চয়ই নেওয়া গ্যাস আবার বায়ুতে

ফিরিয়া আসার প্রাকৃতিক কোন ব্যবস্থা আছে। প্রকৃতির এই ব্যবস্থা দুটি III-7.3. ও III-7.4. উপবিভাগে বলা হইয়াছে।

III-7.1. তরল বায়ু (Liquid air)। সকল গ্যাসকেই তাহার পক্ষে বিশিষ্ট কোন এক উষ্ণতার নিচে আনিয়া যথেষ্ট চাপ দিয়া তরল করা যায়। বায়ুকে তরল করিতে উহাকে অন্তত $-141^\circ C$-র নিচে ঠাণ্ডা করা দরকার, এবং এই উষ্ণতায় প্রায় 38 বায়ুমণ্ডল চাপে উহা তরল হইবে।

শিল্পে বহু পরিমাণ তরল বায়ুর দরকার হয় বলিয়া উহাকে তরল করিবার একাধিক উপায় ও যন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে। বেশী চাপে রাখা বায়ুর চাপ হঠাৎ কমাইলে উহা শীতল হয়। এই ক্রিয়ার পৌনঃপুনিক প্রয়োগে বায়ুকে এত শীতল করা যায় যে তখন এক বায়ুমণ্ডল চাপেই উহা তরল হইয়া যায়। (ইহা ছাড়াও অন্যান্য উপায় আছে ; কিন্তু সেগুলি আলোচনার স্থান ইহা নয়।)

এক বায়ুমণ্ডল চাপে নাইট্রোজেনের স্ফুটনাঙ্ক $-196^\circ C$ ও অক্সিজেনের স্ফুটনাঙ্ক $-183^\circ C$। তরল বায়ু হইতে স্ফুটনাঙ্কের প্রভেদের জন্য গ্যাস দুটিকে আংশিক পাতনে (Fractional distillation-এ) আলাদা করিয়া লওয়া যায়।

[গঠনে থার্মফ্লাস্কের (Thermos flask-এর) মত, কিন্তু আকারে বড় ও ধাতুতে তৈয়ারি পাত্রে তরল বায়ু প্রথমে বায়ু তরলন যন্ত্র হইতে আসিয়া জমে। নাইট্রোজেনের স্ফুটনাঙ্ক অক্সিজেনের চেয়ে কম বলিয়া ঐ তরল মিশ্রণ হইতে নাইট্রোজেন উবিয়া যাইতে থাকে ও পাত্রের তরলে অক্সিজেনের অংশ বাড়ে। পাত্রের অর্ধেক তরল উবিয়া গেলে বাকী তরলে অক্সিজেনের অংশ 21% হইতে বাড়িয়া 35% হয়।]

উভয় গ্যাসকে আলাদাভাবে পাইতে বায়ু তরল করিবার যন্ত্রের সঙ্গে 'রেক্টিফায়ার' (Rectifier) নামে একটি অংশ যোগ করা হয়। উহার সাহায্যে তরল বায়ু হইতে তরল অক্সিজেন ও গ্যাসীয় নাইট্রোজেন আলাদাভাবে পাওয়া যায়। এইভাবে 99·5% বিশুদ্ধ অক্সিজেন পাওয়া যাইতে পারে। আর্গনও এই অংশে তরলিত অবস্থায় থাকে। গ্যাসীয় নাইট্রোজেনকে আবার তরল করিয়া নেওয়া যায়।

রাসায়নিক সার উৎপাদনে নাইট্রোজেন দরকার। কোন কোন ধাতু সংক্রান্ত বিক্রিয়ায় নিষ্ক্রিয় পরিবেশ রাখিতে নাইট্রোজেন ব্যবহৃত হয়। মহাকাশে রকেট উঠাইতে গ্যাস-ঝালাইয়ের (gas-welding) কাজে, মানুষের শ্বাসকষ্ট কমাইতে ও বিভিন্ন শিল্পে অক্সিজেন প্রচুর ব্যবহৃত হয়। তরল নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন হইতে উচ্চ চাপ গ্যাসীয় অবস্থায় ইহাদের নেওয়া হয়। রকেট উঠাইতে তরল অক্সিজেনের ব্যবহার আছে।

প্রশ্ন। কি অবস্থায় বায়ু তরল হইতে পারে? তরল বায়ুতে প্রধানত কি কি মৌল থাকে? তরল বায়ুর কোন স্থির স্ফুটনাঙ্ক আছে কি? কেন?

III-7.2. বায়ুর 'বিরল' গ্যাস (The rare gases in air) এবং নিয়ন আলোকন (Neon lighting)। বায়ুতে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন ছাড়া বিশেষ পাঁচটি গ্যাস সামান্য পরিমাণে পাওয়া যায়। ইহাদের নাম হিলিয়াম (Helium), নিয়ন (Neon), আর্গন (Argon), ক্রিপ্‌টন (Krypton) ও জেনন (Xenon)। পরিমাণে খুব কম বলিয়া ইহারা 'বিরল গ্যাস' (Rare gases) নামে পরিচিত। এই গ্যাস পাঁচটি রাসায়নিক ব্যাপারে নিষ্ক্রিয় (Inert), অর্থাৎ অন্য মৌলের সঙ্গে ইহারা রাসায়নিক বন্ধনে আবদ্ধ হয় না। এজন্য যৌথভাবে ইহাদের 'নিষ্ক্রিয় গ্যাস' (Inert gases) নাম দেওয়া হইয়াছে। ইহারা নিষ্ক্রিয় বলিয়া ইহাদের দুই বা ততোধিক পরমাণু মিলিয়া অণু গঠন করে না। পরমাণুগুলিই স্বাধীনভাবে থাকে।

গ্যাসগুলির মধ্যে আর্গনই সবচেয়ে বেশী পরিমাণে আছে—প্রায় শতকরা এক ভাগ, অর্থাৎ প্রতি একশত বায়ুকণায় প্রায় একটি। কিন্তু অন্যগুলির পরিমাণ এত কম যে শতকরা হারে সংখ্যা না বলিয়া বলিতে হয় প্রতি দশ লক্ষ (10^6 বা মিলিয়ন) বায়ুকণায় হিলিয়াম আছে 500টি, নিয়ন আছে 1500টি, ক্রিপ্‌টন 110টি ও জেনন আছে মাত্র 9টি।

ভূত্বক হইতে যে সব জায়গায় প্রাকৃতিক গ্যাস (Natural gas) পাওয়া যায় তাহাতে হিলিয়ামও থাকে।

এত বিরল ও নিষ্ক্রিয় হইলেও মানুষ ইহাদের কাজে লাগাইয়াছে। বিভিন্ন গ্যাস কাজে লাগাইতে হইলে বায়ু হইতে ইহাদের আলাদা করিয়া নিতে হয়। স্ফুটনাঙ্কের বিভিন্নতার সাহায্যে (এবং অন্য প্রক্রিয়ার সাহায্য লইয়াও) ইহাদের আলাদা করা হয়।

বায়ুর বিরল বা নিষ্ক্রিয় গ্যাসের ব্যবহার। সবচেয়ে শীতল অবস্থা সৃষ্টি করিতে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে হিলিয়াম ব্যবহৃত হয়। ইহা বায়ুর চেয়ে হালকা এবং দাহ্য নয় বলিয়া আবহাওয়া সংক্রান্ত নিরীক্ষার জন্য ঊর্ধ্ব বায়ুস্তরে যন্ত্রপাতি পাঠাইবার বেলুন হিলিয়াম গ্যাসে ভরা হয়। গভীর জলের নিচে যে সব ডুবুরির কাজ করিতে হয়, শ্বাস নিতে তাহাদের বায়ু না দিয়া অক্সিজেন ও হিলিয়ামের মিশ্রণ দেওয়া হয়। নাইট্রোজেনের চেয়ে হিলিয়াম রক্তে দ্রাবিত হয় কম। ডুবুরি যখন উপরে উঠিয়া আসে তখন তাহার রক্তে দ্রাবিত নাইট্রোজেন তাড়াতাড়ি মুক্ত হইলে তাহার মৃত্যু ঘটিতে পারে। হিলিয়ামে এরূপ সম্ভাবনা অনেক কম।

ধাতুবিদ্যায় (Metallurgy-তে) টাইট্যানিয়াম (Titanium) প্রভৃতি ধাতু নিষ্কাশনে নিষ্ক্রিয় পরিবেশের দরকার হয়। এ উদ্দেশ্যে প্রধানত আর্গন, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে হিলিয়াম ব্যবহৃত হয়।

তারের বৈদ্যুত বাল্‌ব্‌গুলি বায়ুশূন্য করিয়া উহাদের এক বায়ুমণ্ডলের তিন-চতুর্থাংশ চাপে আর্গন গ্যাস দিয়া ভরা হয়। ভিতরে বায়ু থাকিলে তার পুড়িয়া যাইত। আর্গন নিষ্ক্রিয় বলিয়া উষ্ণ তারের সঙ্গে কোন রাসায়নিক ক্রিয়া করে না। দ্রুত ফটোগ্রাফ তোলার জন্য যে ফ্ল্যাশ বাল্‌ব্‌ (Flash bulb) ব্যবহৃত হয় তাহাতে ক্রিপ্‌টন বা জেনন ভরা থাকে। রাসায়নিক নিষ্ক্রিয়তা ও কম তাপ-পরিবাহিতা গুণের জন্য এ সকল এবং অনুরূপ ক্ষেত্রে এই গ্যাসগুলির ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে।

নিয়ন আলোকন (Neon lighting)। নিয়ন গ্যাস প্রধানত রাত্রে আলোকিত বিজ্ঞাপনের কাজে ব্যবহৃত হয়। কাচের এক বা একাধিক নলকে অক্ষরের আকারে বাঁকাইয়া বা উহাকে বিজ্ঞাপনীয় বস্তুর আকার দিয়া নলে নিম্নচাপে নিয়ন গ্যাস ভরা হয়। এই গ্যাসের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ স্রোত পাঠাইলে নিয়ন উজ্জ্বল কমলা-লাল রঙের আলো দেয়। বিদ্যুৎ স্রোত জোরাল হইলে আলো বেশী উজ্জ্বল হয়। ইহাকে **নিয়ন আলোকন (Neon lighting)** বলে। অনেকে অল্প নিয়ন ভরা বৈদ্যুত বাল্‌ব্‌ রাত্রে ঘরে জ্বালাইয়া রাখেন। এগুলি হইতে মৃদু কমলা রঙের আলো বাহির হয়। ইহাতে বিদ্যুৎ খরচ খুব কম হয়, ঘুমের কোন ব্যাঘাত হয় না এবং রাত্রে অন্ধকারে উঠিতে হয় না। বৈদ্যুতিক লাইনে বিদ্যুৎ আছে কি না তাহা দেখিবার জন্য পেনসিলের মত নলে একটু নিয়ন ভরা থাকে। লাইনে বিদ্যুৎ থাকিলে উহাতে ঐ পেনসিল ছোঁয়াইলে, এমন কি কাছে নিয়া গেলেও, উহা কমলা রঙের আলো দেয়। 'ভোল্টেজ' (Voltage), অর্থাৎ লাইনে বৈদ্যুত চাপ বেশী থাকিলে আলো বেশী উজ্জ্বল হয়।

বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে অন্যান্য গ্যাসগুলিও ব্যবহার হয়। হিলিয়াম হলদে আলো দেয় ; আর্গনের আলো লাল, ক্রিপ্‌টনের সবুজ-হলদে ও জেননের নীল। ক্রিপ্‌টন ও জেনন খুব কম পাওয়া যায় বলিয়া উহাদের ব্যবহারও খুব সীমিত।

প্রশ্ন। 'বিরল' গ্যাসগুলির নাম ও উহাদের ব্যবহার বল। নিয়ন লাইটিং বলিতে কি বুঝায় ?

III-7.3. নাইট্রোজেনের আবর্তন বা নাইট্রোজেন-চক্র (Nitrogen cycle)। বায়ুতে প্রচুর পরিমাণে (78%) নাইট্রোজেন মৌল রূপে আছে। তাছাড়া সোডিয়াম নাইট্রেট, পটাসিয়াম নাইট্রেট ইত্যাদি বিভিন্ন যৌগ রূপেও ইহা ভূত্বকে পাওয়া যায়। উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতে এমিনো এসিড (Amino acid), প্রোটিন (Protein) ইত্যাদি বিভিন্ন যৌগ রূপে ইহা বর্তমান। উদ্ভিদ ও প্রাণীর বাঁচিয়া থাকার ও বৃদ্ধির জন্য অক্সিজেনের মত ইহারও প্রয়োজন।

উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহে নাইট্রোজেন-ঘটিত বিভিন্ন যৌগ তৈয়ারিতে যে নাইট্রোজেন দরকার তাহার উৎস বায়ুর নাইট্রোজেন। কিন্তু বায়ুর নাইট্রোজেন শ্বাস লওয়ার সঙ্গে জীবদেহে প্রবেশ করিলেও উহা বিভিন্ন যৌগ গঠনের কাজে লাগে না। উদ্ভিদ ও প্রাণী বিভিন্ন যৌগ গঠন করার জন্য বায়ুর নাইট্রোজেন অন্যভাবে লয়। প্রকৃতি তাহার সুবন্দোবস্ত নিজেই করিয়াছে।

বর্ষার দিনে বিদ্যুৎ চমকানো ও বাজ পড়ার সময় বিদ্যুতের প্রভাবে বায়ুর অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের বিক্রিয়ায় বিভিন্ন নাইট্রোজেন অক্সাইড তৈয়ারি হয়। উহারা বৃষ্টির জলের সহিত বিক্রিয়া করিয়া নাইট্রাস এসিড (Nitrous acid, HNO_2) ও নাইট্রিক এসিড (HNO_3) রূপে মাটিতে নামিয়া আসে। মাটির ক্ষারজাতীয় যৌগের সঙ্গে বিক্রিয়া করিয়া উহারা বিভিন্ন নাইট্রাইট ও নাইট্রেট উৎপন্ন করে।

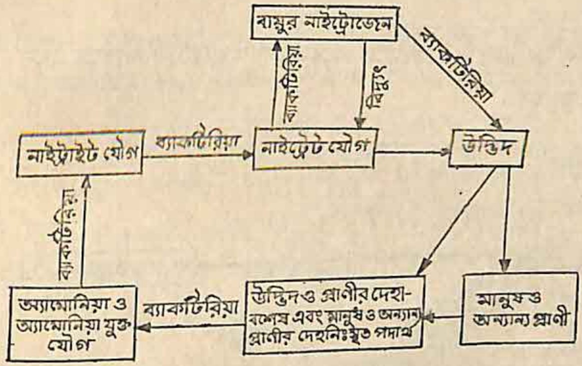
প্রকৃতিতে আর একটি উপায়েও বায়ুর নাইট্রোজেন মৌল হইতে যৌগে পরিণত হয়। তোমরা হয়তো অনেকেই শিমজাতীয় গাছের শিকড়ে আবের মত স্ফীতি (Nodules) লক্ষ্য করিয়াছ। উহাতে এক ধরনের ব্যাকটিরিয়া (Bacteria) বাসা বাঁধিয়া থাকে। উহারা সরাসরি বায়ুর নাইট্রোজেন হইতে নাইট্রোজেনযুক্ত যৌগ তৈয়ারি করিয়া উদ্ভিদকে যোগায়।

[শিমজাতীর গাছ ছাড়াও ক্লোভার (Clover) ও লুসার্ন (Lucerne)-এর শিকড়েও এইরূপ স্ফীতি ও তাহাতে এই ধরনের ব্যাকটিরিয়া দেখা যায়। কয়েক জাতীয় মস (Moss), অ্যালগি (Algae) এবং ফাংগাস (Fungus)-ও বায়ুর নাইট্রোজেনকে যৌগে পরিণত করে।]

মাটির নাইট্রোজেনযুক্ত যৌগ হইতে উদ্ভিদ নাইট্রোজেনযুক্ত অন্যান্য যৌগ তৈয়ারি করে। উদ্ভিদ খাইয়া পশু, মাছ প্রভৃতি জন্তু উহার শরীরে প্রোটিন ও অন্যান্য যৌগ তৈয়ারি করে। উদ্ভিদ এবং প্রাণীজাত বিভিন্ন বস্তু (যেমন ডাল প্রভৃতি, মাছ, দুধ, মাংস ইত্যাদি) হইতে মানুষ শরীরের প্রয়োজনীয় প্রোটিন ও অন্যান্য নাইট্রোজেন যুক্ত যৌগ গ্রহণ করে।

এইভাবে বিভিন্ন উপায়ে বায়ুতে নাইট্রোজেনের ভাগ করিলেও প্রকৃতি নাইট্রোজেনকে অন্যভাবে বায়ুতে ফিরাইয়া নেয়। প্রাণীদেহের নিঃসারিত পদার্থ ও জীবের মৃত্যুর পর দেহাবশেষ হইতে ব্যাকটিরিয়ার প্রভাবে পচনে অ্যামোনিয়া ও অ্যামোনিয়াযুক্ত যৌগ উৎপন্ন হয়। ইহার কিছু অংশ উদ্ভিদ ব্যবহার করে ; বাকীটা বিভিন্ন ব্যাকটিরিয়ার প্রভাবে ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন নাইট্রাইট, নাইট্রেট ও শেষে নাইট্রোজেন গ্যাসে পরিণত হয়।

প্রকৃতিতে এইভাবে বায়ুর নাইট্রোজেনের অপসারণ ও প্রত্যাবর্তন চলিতেছে, ইহাকে নাইট্রোজেনের আবর্তন বা নাইট্রোজেন-চক্র (Nitrogen cycle) বলে। নিচের III.4 লিপিচিত্রে ইহা দেখান হইয়াছে।



III.4 চিত্র—নাইট্রোজেন-চক্র

প্রশ্ন। নাইট্রোজেনের আবর্তন বা নাইট্রোজেন-চক্র (Nitrogen cycle) বলিতে কি বোঝ? উহা কিভাবে ঘটে তাহা ভাষায় বা লিপিচিত্রের সাহায্যে সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

III-7.4. কার্বন ডাইঅক্সাইডের আবর্তন বা কার্বন ডাইঅক্সাইড-চক্র (Carbon dioxide cycle)। বায়ুতে নাইট্রোজেনের মত কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণও সর্বসময় প্রায় এক (0.03%) এবং প্রকৃতিতে ইহাও আবর্তিত হয়। III.5 লিপিচিত্রে সংক্ষেপে কার্বন ডাইঅক্সাইডের আবর্তন দেখান হইয়াছে। ইহাকে **কার্বন-চক্র (Carbon cycle)**-ও বলা হয়।

বিভিন্ন জীব-জন্তু ও উদ্ভিদ শ্বাসকার্যের জন্য বায়ু হইতে অক্সিজেন নেয় ও বায়ুতে কার্বন ডাইঅক্সাইড ছাড়িয়া দেয়। জীবের শ্বাসকার্য ছাড়াও প্রধানত জীবদেহের পচনে, কয়লা, কাঠ, পেট্রোলিয়াম ইত্যাদির দহনে, চুন তৈরির জন্য ক্যালসিয়াম কার্বনেট (Calcium carbonate) পোড়ানয় বায়ুর কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বাড়ে। (ঝিনুক, শামুক ইত্যাদি বিভিন্ন জলজপ্রাণীর খোলা ও পাথরচুন প্রধানত ক্যালসিয়াম কার্বনেট দিয়া গঠিত।)

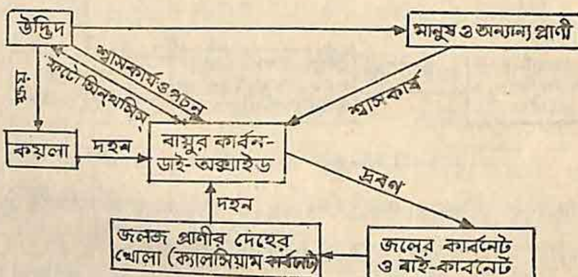
উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষ (ফটোসিন্থেসিস, Photosynthesis) প্রক্রিয়ায় সূর্যের আলো ও ক্লোরোফিলের (Chlorophyll, গাছের পাতার সবুজ-কণা) সাহায্যে বায়ুর কার্বন ডাইঅক্সাইড নিয়া স্টার্চ (Starch), শর্করা (Sugar) ইত্যাদি বিভিন্ন কার্বোহাইড্রেট (Carbohydrate) তৈয়ার করে এবং অক্সিজেন বায়ুতে ছাড়িয়া দেয়।

জল ও জলীয় দ্রবণে কার্বন ডাইঅক্সাইড সামান্য দ্রবণীয় হওয়ায় বৃষ্টির জলের সঙ্গে কার্বনিক এসিডরূপে বায়ু হইতে কিছু পরিমাণে কার্বন ডাইঅক্সাইড মাটিতে চলিয়া

আসে। ভূত্বকের বিভিন্ন পদার্থের সঙ্গে কার্বনিক এসিড বিক্রিয়া করিয়া বিভিন্ন বাইকার্বনেট (Bicarbonate) ও উহাদের জলীয় দ্রবণ তৈয়ারি করে। এই দ্রবণ হইতে বিভিন্ন জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণী উহাদের প্রয়োজনীয় কার্বন ডাইঅক্সাইড সংগ্রহ করে।

এইভাবে বিভিন্ন ক্রিয়ায় প্রকৃতিতে কার্বন ডাইঅক্সাইডের আবর্তন চলে ও বায়ুতে উহার সমতা রক্ষা হয়।

প্রশ্ন। কার্বন ডাইঅক্সাইড-চক্র কাহাকে বলে? ভাষায় বা লিপিচিত্রের সাহায্যে উহা সংক্ষেপে বর্ণনা কর।



III.5 চিত্র—কার্বন-চক্র

III-8. কয়েকটি মৌল ও যৌগ তৈয়ারির সরল পদ্ধতি ও উহাদের ধর্ম (Simple methods of preparation and properties of O_2, H_2, N_2, NH_3, CO_2, SO_2, H_2S)। প্রকৃতিতে বিশুদ্ধ অবস্থায় কোন মৌল বা যৌগ সাধারণত পাওয়া যায় না। কোন মৌল বা যৌগের ধর্মগুলি জানিতে হইলে উহাদের বিশুদ্ধ অবস্থায় প্রস্তুত করিয়া নিতে হয়। উপরে বলা মৌল ও যৌগ কয়টি কি করিয়া পরীক্ষাগারে (Laboratory-তে) সহজে প্রস্তুত করা যায় তাহা এই বিভাগে বলা হইবে। উহাদের প্রধান ধর্মগুলিও উল্লেখ করা হইবে।

(1) অক্সিজেন তৈয়ারি (Preparation of oxygen)।

(ক) প্রথম পদ্ধতি : পটাসিয়াম ক্লোরেট (Potassium chlorate) হইতে।

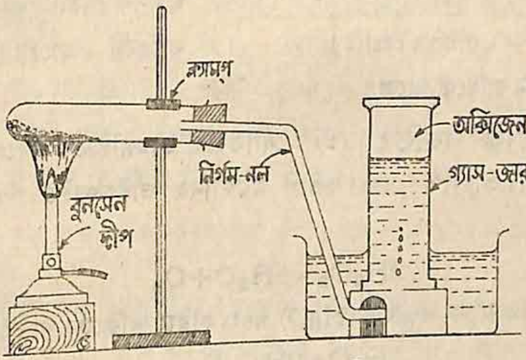
তত্ত্ব (Principle) : পটাসিয়াম ক্লোরেট ($KClO_3$) গরম করিলে ভাঙিয়া গিয়া 630°C উষ্ণতায় উহা পটাসিয়াম ক্লোরাইড (KCl) ও অক্সিজেন উৎপন্ন করে।

সাধারণত পটাসিয়াম ক্লোরেটের সঙ্গে ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড (Manganese dioxide, MnO_2) মিশাইয়া দেওয়া হয়। ইহাতে কম উষ্ণতায় (240°C-তে)

পটাসিয়াম ক্লোরেট নিচের সমীকরণ অনুযায়ী ভাঙে ও অক্সিজেন উৎপন্ন হয়। এই বিক্রিয়ায় ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড প্রভাবকরূপে কাজ করে।

$$2KClO_3 = 2KCl + 3O_2 \uparrow$$

প্রক্রিয়া (Method) : পরীক্ষাগারে অক্সিজেন তৈয়ারির জন্য উচ্চ তাপসহ কাচের পরীক্ষা নলে (Test tube-এ) চার ভাগ পটাসিয়াম ক্লোরেট ও এক ভাগ ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইডের মিশ্রণ নেওয়া হয় (III-6 চিত্র দেখ)। পরীক্ষা নলটি প্রায় অনুভূমিক (horizontal) ভাবে বন্ধনীর (clamp-এর) সাহায্যে এমনভাবে লোহার স্ট্যাণ্ড (Stand)-এর দণ্ডে লাগান হয় যাহাতে পরীক্ষানলের মুখটি একটু নিচের দিকে থাকে। পরীক্ষা নলটিতে একটি নির্গম-নল (Outlet tube)-যুক্ত ছিপি



III.6 চিত্র (অক্সিজেন তৈয়ারি)

লাগান হয়। নির্গম-নলের অন্য প্রান্ত একটি জলের পাত্রে ডুবান হয়। এই নলের প্রান্তে জলপূর্ণ গ্যাস জার (Gas jar) উবুড় করিয়া রাখা হয়। তারপর সাবধানে গ্যাস বার্নারের (Gas burner-এর) সাহায্যে পরীক্ষা নলের মিশ্রণ গরম করা হয়। তখন অক্সিজেন মুক্ত হইয়া নির্গম-নল দিয়া গ্যাস জারে আসে এবং জল সরাইয়া জারে জমা হয়। (নল দিয়া গ্যাস আসিয়া জারে কি করিয়া জমা হয় তাহা পরিশিষ্টে III.6 (ক) চিত্রের সাহায্যে আলাদাভাবে দেখান হইয়াছে।)

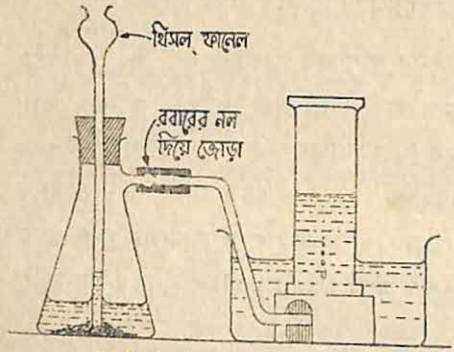
(খ) দ্বিতীয় পদ্ধতি : সোডিয়াম পেরক্সাইড (Sodium peroxide, Na_2O_2) হইতে।

তত্ত্ব : সোডিয়াম পেরক্সাইড জলের সঙ্গে নিচের সমীকরণ অনুযায়ী বিক্রিয়া করে ;

$$2Na_2O_2 + 2H_2O = 4NaOH + O_2$$

প্রক্রিয়া : একটি বুখ্‌নার ফ্লাস্ক (Buchner flask)-এ সোডিয়াম পেরক্সাইড নিয়া তাহাতে থিস্‌ল্ (thistle) ফানেলযুক্ত ছিপি ও নির্গম-নল লাগান হয়

(III.7 চিত্র দেখ)। নির্গম-নলের অন্য প্রান্ত একটি পাত্রের জলে ডুবান হয়। থিস্‌ল্ ফানেলের নলের প্রান্ত ফ্লাস্কের প্রায় তলা পর্যন্ত রাখা হয়। ফানেলের মধ্য দিয়া জল ঢালিলে সোডিয়াম পেরক্সাইডের সহিত জলের বিক্রিয়া ঘটে ও অক্সিজেন সৃষ্টি হয়। থিস্‌ল্ ফানেলের প্রান্ত জলে ডুবিয়া থাকায় অক্সিজেন গ্যাস নির্গম-নল দিয়া জলে বুদ্‌বুদের আকারে বাহির হইতে থাকে। নির্গম-নলের প্রান্তে জলপূর্ণ গ্যাস জার উবুড় করা থাকিলে জারের জল সরাইয়া উহাতে অক্সিজেন জমিতে থাকে।



III.7 চিত্র (অক্সিজেন তৈয়ারি)

(গ) অন্যান্য পদ্ধতিঃ (১) সোডিয়াম পেরক্সাইডের বদলে হাইড্রোজেন পেরক্সাইড নিয়া তাহাতে প্রভাবকরূপে ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড দিলেও অক্সিজেন পাওয়া যায়।

$$2H_2O_2 = 2H_2O + O_2$$

(২) মারকিউরিক অক্সাইড (HgO) গরম করিয়া অক্সিজেন পাওয়া যায় ;

$$2HgO = 2Hg + O_2$$

অক্সিজেনের ভৌত ধর্ম। ইহা স্বাদ, বর্ণ ও গন্ধবিহীন একটি গ্যাস। বায়ুর তুলনায় ইহা কিছুটা ভারী। জলে ইহা অল্প পরিমাণে দ্রবীভূত হয়। মাছ ও অন্যান্য জলচর প্রাণী এবং বিভিন্ন জলজ উদ্ভিদ শ্বাসক্রিয়ায় এই দ্রাবিত অক্সিজেন নেয়।

অক্সিজেনের রাসায়নিক ধর্ম। (i) অক্সিজেন নিজে দাহ্য নয়, কিন্তু অন্য পদার্থের দহন ঘটায়। দহনে ও অন্যান্য বিক্রিয়ায় অক্সিজেন **জারকরূপে** কাজ করে।

(ii) কার্বন, সালফার, ম্যাগনেসিয়াম প্রভৃতি বেশীর ভাগ মৌলই বিশেষ উষ্ণতায় অক্সিজেনের সহিত বিক্রিয়া করিয়া উহাদের অক্সাইড উৎপন্ন করে।

$2C + O_2 = 2CO$ (কার্বন মনক্সাইড)

$C + O_2 = CO_2$ (কার্বন ডাইঅক্সাইড)

$2Mg + O_2 = 2MgO$ (ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড)।

(iii) বিশেষ পারিপার্শ্বিক অবস্থায় বিভিন্ন যৌগের সঙ্গে অক্সিজেন বিক্রিয়া করে। কার্বন মনক্সাইড ও নাইট্রিক অক্সাইড (Nitric Oxide, NO) অক্সিজেনের সহিত

বিক্রিয়া করিয়া যথাক্রমে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড (NO_2) উৎপন্ন করে।

$$2CO+O_2=2CO_2$$
$$2NO+O_2=2NO_2$$

সোডিয়াম সালফাইট (Sodium sulphite, Na_2SO_3) অক্সিজেনের সহিত বিক্রিয়া করিয়া সোডিয়াম সালফেটে (Sodium sulphate, Na_2SO_4-এ) পরিণত হয় ;

$$2Na_2SO_3+O_2=2Na_2SO_4$$

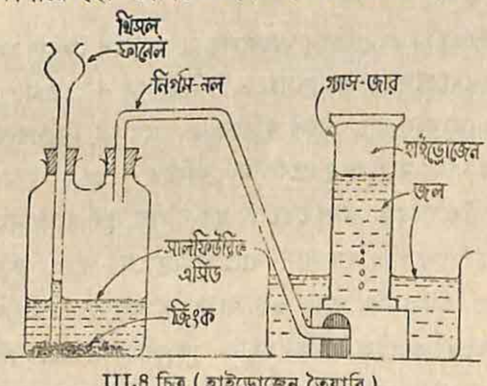
প্রভাবকের উপস্থিতিতে ও বিশেষ উষ্ণতায় সালফার ডাইঅক্সাইড (Sulphur dioxide, SO_2) ও অ্যামোনিয়া অক্সিজেনের সহিত বিক্রিয়া করিয়া যথাক্রমে সালফার ট্রাইঅক্সাইড (Sulphur trioxide, SO_3) ও নাইট্রিক অক্সাইড উৎপন্ন করে ;

$$2SO_2+O_2=2SO_3$$
$$4NH_3+5O_2=4NO+6H_2O\text{।}$$

(iv) পটাসিয়াম হাইড্রক্সাইডযুক্ত পটাসিয়াম পাইরোগ্যালেটের (Potassium pyrogallate-এর) জলীয় দ্রবণে অক্সিজেন বিক্রিয়া করিয়া দ্রবীভূত হয়।

প্রশ্ন। পরীক্ষাগারে অক্সিজেন তৈয়ারির একটি উপায় এবং অক্সিজেনের ভৌত ধর্ম ও তিনটি রাসায়নিক ধর্ম বল।

(2) হাইড্রোজেন তৈয়ারি (Preparation of hydrogen)। জলের ইলেকট্রোলাইসিস করিয়া হাইড্রোজেন পাওয়া যায় (III-4.2. বিভাগ দেখ)। রাসায়নিক পরীক্ষাগারে ইহা সাধারণত এসিড হইতে তৈয়ারি হয়।

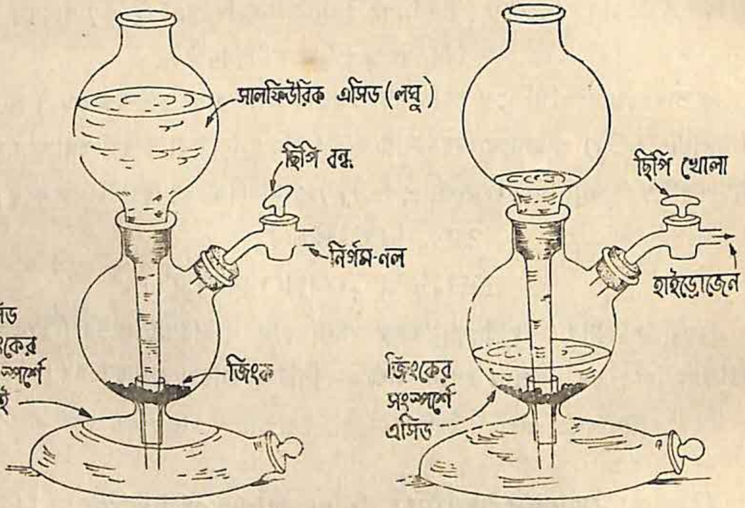


III.8 চিত্র (হাইড্রোজেন তৈয়ারি)

তত্ত্ব ঃ বিভিন্ন ধাতুর সহিত এসিডের বিক্রিয়ায় হাইড্রোজেন উৎপন্ন হয়। এই উদ্দেশ্যে সাধারণত জিংক ধাতু ও সালফিউরিক এসিড নেওয়া হয়।

$$Zn+H_2SO_4=ZnSO_4+H_2$$

প্রক্রিয়া ঃ দীর্ঘ নলযুক্ত থিস্‌ল্ (thistle) ফানেল ও নির্গম-নল (Outlet tube)-যুক্ত উলফ্ (Woulfe) বোতলে (III.8 চিত্র) (বা অন্য কোন বোতলে), অথবা কিপের যন্ত্রের (Kipp's apparatus) (III.9 চিত্র) গোলাকার অংশগুলির মাঝেরটিতে অপরিশোধিত জিংক ধাতুর ছোট ছোট টুকরা নেওয়া হয় এবং লঘু সালফিউরিক এসিড ফানেলের মধ্য দিয়া ঐ বোতলে (অথবা কিপের যন্ত্রে) ঢালা হয়।



III.9 চিত্র (হাইড্রোজেন তৈয়ারি)

[এই চিত্রে দেখান কিপের যন্ত্রের বিভিন্ন অংশ পরিশিষ্টে III.9 (ক) চিত্রে আলাদা করিয়া দেখান হইয়াছে। যন্ত্রের সম্পূর্ণ ক্রিয়া সেখানে বুঝান হইয়াছে।]

লক্ষ্য রাখিতে হয় (১) যেন থিস্‌ল্ ফানেলের নলের বেশ কিছুটা অংশ এসিডে ডুবিয়া থাকে এবং (২) বোতলের সঙ্গে ছিপির ও ছিপির সঙ্গে কাচের নলের জুড়িয়া দেওয়া জায়গাগুলি দিয়া বোতলে বায়ু প্রবেশ করিতে না পারে। (কিপের যন্ত্রের ক্ষেত্রেও লক্ষ্য রাখা হয় যাহাতে যন্ত্রের মধ্যে বায়ু প্রবেশ না করিতে পারে। হাইড্রোজেন ও বায়ুর অক্সিজেন মিশিয়া বিস্ফোরক মিশ্রণ তৈয়ারি হয় বলিয়া এই সাবধানতা নিতে হয়।)

জিংক ধাতুর সংস্পর্শে এসিড আসা মাত্র হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হয় ও নির্গম-নল দিয়া বাহির হইয়া আসে। এই গ্যাস সংগ্রহ করিতে হইলে নির্গম নল কোন পাত্রের জলে ডুবাইয়া রাখা হয়। বুদ্‌বুদের আকারে কিছুক্ষণ বায়ু মিশ্রিত হাইড্রোজেন গ্যাস বাহির হইয়া যাওয়ার পর নির্গম-নলের মুখে জলপূর্ণ গ্যাস-জার (Gas jar) উবুড় করিয়া রাখা হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই গ্যাস-জারের জল বাহির করিয়া দিয়া হাইড্রোজেন উহার স্থান অধিকার করে। গ্যাস জারের গ্যাস নিয়া হাইড্রোজেনের বিভিন্ন ধর্ম পরীক্ষা করা যায়।

হাইড্রোজেনের ভৌত ধর্ম। ইহা বর্ণ, স্বাদ ও গন্ধবিহীন একটি গ্যাস। মৌল ও যৌগের মধ্যে ইহা সবচেয়ে হাল্কা। সেজন্য বেলুন উড়াইতে ইহা ব্যবহৃত হয়। ইহা খুব কম উষ্ণতায় ($-252.7^\circ C$) তরলে পরিণত হয়। জলে ইহা খুব কম পরিমাণে দ্রাবিত হয়।

হাইড্রোজেনের রাসায়নিক ধর্ম। সাধারণ অবস্থায় ইহা সক্রিয় নয়। কিন্তু বিশেষ পরিবেশে ইহা **বিজারকরূপে** বিভিন্ন মৌল বা যৌগের সহিত বিক্রিয়া করে।

(i) বায়ুতে বা অক্সিজেন গ্যাসে ইহা জ্বলে ও জল উৎপন্ন করে। শিখার রং ঈষৎ নীলাভ। হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের মিশ্রণে আগুন ধরাইলে বিস্ফোরণ ঘটে।

$$2H_2+O_2=2H_2O$$

(ii) উত্তপ্ত ধাতব অক্সাইডকে ইহা **বিজারিত** করিয়া বিশুদ্ধ ধাতু উৎপন্ন করে। এইরূপে কপার অক্সাইড হইতে কপার (তামা) পাওয়া যায়।

$$CuO+H_2=Cu+H_2O$$

(iii) লিথিয়াম (Lithium), সোডিয়াম ইত্যাদি ধাতুর সহিত বিক্রিয়া করিয়া ইহা উহাদের হাইড্রাইড (Hydride) গঠন করে ;

$$2Na+H_2=2NaH$$

(iv) বিশেষ পরিবেশে ক্লোরিন, নাইট্রোজেন ইত্যাদি অধাতুর সহিত বিক্রিয়া করিয়া ইহা হাইড্রোজেন ক্লোরাইড, অ্যামোনিয়া ইত্যাদি বিভিন্ন যৌগ উৎপন্ন করে ;

$$H_2+Cl_2=2HCl$$

$$3H_2+N_2=2NH_3$$

প্যালাডিয়াম (Palladium), প্ল্যাটিনাম (Platinum) ইত্যাদি কয়েকটি ধাতু হাইড্রোজেন গ্যাস অধিশোষণ (Absorption) করে। অধিশোষণ একপ্রকার রাসায়নিক ক্রিয়া। অধিশোষণের পর ধাতু গরম করিয়া সহজেই হাইড্রোজেন ফেরত পাওয়া যায়।

প্রশ্ন। পরীক্ষাগারে হাইড্রোজেন তৈয়ারির একটি উপায় এবং হাইড্রোজেনের ভৌত ও তিনটি রাসায়নিক ধর্ম বল।

(3) নাইট্রোজেন তৈয়ারি (Preparation of nitrogen)।

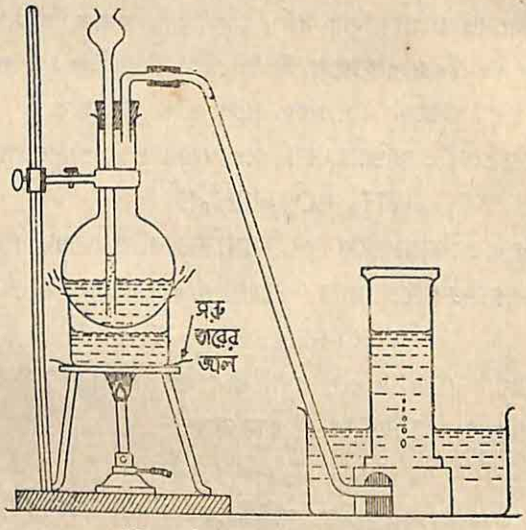
তত্ত্ব : অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইট (Ammonium nitrite)-এর ভাঙনে নাইট্রোজেন গ্যাস তৈয়ারি হয়।

$$NH_4NO_2=N_2+2H_2O$$

প্রক্রিয়া : একটি গোল তলাবিশিষ্ট ফ্লাস্কে ছিপি আঁটিয়া উহাতে দীর্ঘ নলযুক্ত থিস্‌ল্ ফানেল ও নির্গম-নল লাগান হয়। তারপর ঐ ফ্লাস্কে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড ও

সোডিয়াম নাইট্রাইটের মিশ্রণ রাখা হয় (III.10 চিত্র দেখ) ও ফানেল দিয়া এমন পরিমাণে জল ঢালা হয় যাহাতে ফানেলের প্রান্ত জলে ডুবিয়া থাকে। ইহাতে নিচের সমীকরণ অনুসারে দ্রবণে অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইট তৈয়ারি হয়।

$$NH_4Cl + NaNO_2 = NH_4NO_2 + NaCl$$



III 10 চিত্র (নাইট্রোজেন তৈয়ারি)

একটি পাত্রে জল নিয়া ফ্লাস্কটি তাহার উপরে রাখিয়া পাত্রটি গরম করা হয়। তখন পাত্রের জল বাষ্পীভূত হইয়া ফ্লাস্কটিকে গরম করে। দ্রবণ উষ্ণ হওয়ায় অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইট ভাঙিয়া নাইট্রোজেন গ্যাস তৈয়ারি হইয়া নির্গম-নল দিয়া বাহিরে আসে। এই গ্যাস সংগ্রহ করার জন্য নির্গম-নল জলে ডুবাইয়া তাহার উপরে জল-ভরা গ্যাসজার উবুড় করিয়া রাখা হয়। তখন জল সরাইয়া গ্যাসজারে নাইট্রোজেন জমে।

নাইট্রোজেনের ভৌত ধর্ম। ইহা স্বাদ, বর্ণ ও গন্ধহীন একটি গ্যাস। ইহা প্রায় বায়ুর মতই ভারী। জলে ইহার দ্রাব্যতা খুব কম।

রাসায়নিক ধর্ম। (i) ইহা দাহ্য নয় এবং দহনে সাহায্য করে না। রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ইহা বেশ নিষ্ক্রিয়। সেজন্য পরীক্ষাগারে ও বিভিন্ন শিল্পে নাইট্রোজেন গ্যাসের সাহায্যে নিষ্ক্রিয় আবহমণ্ডল (Inert atmosphere) সৃষ্টি করা হয়।

(ii) ইহা ম্যাগনেসিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদি কয়েকটি ধাতুর সহিত বেশী উষ্ণতায় বিক্রিয়া করিয়া উহাদের নাইট্রাইড (Nitride) উৎপন্ন করে।

$$3Mg + N_2 = Mg_3N_2$$

(iii) প্রভাবকের উপস্থিতিতে বিশেষ উষ্ণতায় ও চাপে নাইট্রোজেন ও হাই-ড্রোজেন বিক্রিয়া করিয়া অ্যামোনিয়া উৎপন্ন করে।

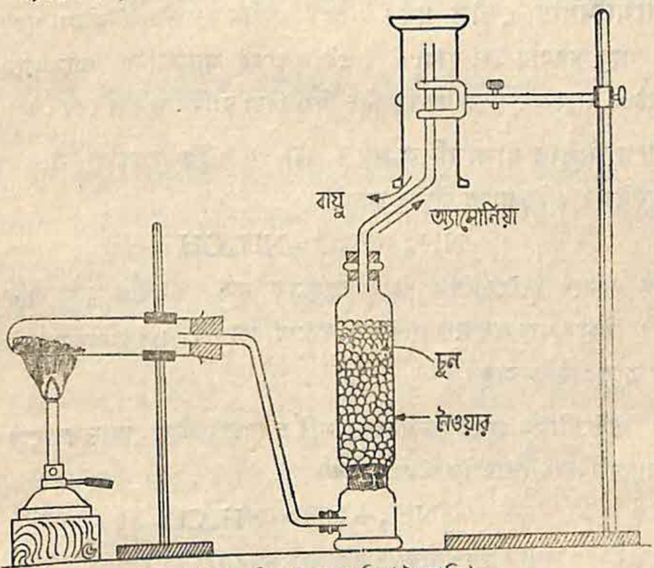
$$N_2 + 3H_2 = 2NH_3$$

(iv) ইলেকট্রিক আর্কের (Electric arc-এর) উষ্ণতায় (প্রায় 3000°C) নাইট্রোজেন অক্সিজেনের সহিত বিক্রিয়া করিয়া নাইট্রিক অক্সাইড উৎপন্ন করে ;

$$N_2 + O_2 = 2NO$$

প্রশ্ন। নাইট্রোজেন প্রস্তুত করার একটি সহজ উপায় বর্ণনা কর। নাইট্রোজেনের ভৌত ধর্ম ও তিনটি রাসায়নিক ধর্ম বল।

(4) অ্যামোনিয়া তৈয়ারি (Preparation of ammonia)।



III.11 চিত্র (অ্যামোনিয়া তৈয়ারি)

তত্ত্ব : সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড, ক্যালসিয়াম অক্সাইড (Calcium oxide, CaO), ইত্যাদি ক্ষারকের সহিত অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড (Ammonium chloride, NH_4Cl), ও অন্যান্য অ্যামোনিয়াযুক্ত যৌগের বিক্রিয়ার ফলে অ্যামোনিয়া গ্যাস উৎপন্ন হয়।

$$NH_4Cl + NaOH = NaCl + NH_3 + H_2O$$

$$2NH_4Cl + CaO = CaCl_2 + 2NH_3 + H_2O$$

প্রক্রিয়া : একটি টেস্টটিউবে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড ও ক্যালসিয়াম অক্সাইডের (চুনের) মিশ্রণ নিয়া উহাতে একটি নির্গম-নলযুক্ত ছিপি লাগান হয় (III.11

চিত্র দেখ)। নির্গম-নলের অন্য প্রান্ত একটি ক্যালসিয়াম অক্সাইড পূর্ণ টাওয়ারের (Tower-এর) নিচের দিকে লাগান হয়। টাওয়ারের মাথায় লাগান নির্গম-নলের প্রান্তে একটি গ্যাস জার উবুড় করিয়া রাখা হয়।

টেস্টটিউবটি গরম করার সঙ্গে সঙ্গে অ্যামোনিয়া গ্যাস উৎপন্ন হইয়া টাওয়ারের মধ্য দিয়া বিশুষ্ক হইয়া গ্যাস জারে আসে। অ্যামোনিয়া গ্যাসের সহিত উৎপন্ন জলীয় বাষ্প টাওয়ারের ক্যালসিয়াম অক্সাইডের সহিত বিক্রিয়া করিয়া উহাতে থাকিয়া যায়।

$$CaO + H_2O = Ca(OH)_2$$

জারের বায়ু স্থানচ্যুত করিয়া শুষ্ক অ্যামোনিয়া গ্যাস উহাতে জমা হয়।

অ্যামোনিয়ার ভৌত ধর্ম। ইহা বর্ণহীন ও তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধযুক্ত একটি গ্যাস। বায়ুর তুলনায় ইহা হাল্কা। (এই কারণেই অ্যামোনিয়া গ্যাসজারে উপরের দিকে ওঠে ও বায়ুকে ঠেলিয়া জারের নিচ দিক দিয়া বাহির করিয়া দেয়।)

অ্যামোনিয়ার রাসায়নিক ধর্ম। (i) জলে ইহা প্রচুর পরিমাণে দ্রাবিত হয় ও অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড উৎপন্ন করে।

$$NH_3 + H_2O = NH_4OH$$

(এই কারণে হাইড্রোজেন বা অক্সিজেনের মত গ্যাসজার জলে ভরিয়া নেওয়া হয় না।) ইহার গাঢ় দ্রবণকে লাইকার অ্যামোনিয়া (Liquor ammonia) বলে। এই দ্রবণ ত্বকের ক্ষতি করে।

(ii) হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাসের সহিত অ্যামোনিয়া **ক্ষারকরূপে** বিক্রিয়া করিয়া অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড উৎপন্ন করে।

$$NH_3 + HCl = NH_4Cl$$

অ্যামোনিয়ার জলীয় দ্রবণ ব্যবহৃত হইলে উপরের বিক্রিয়ায় জলও উৎপন্ন হয়।

$$NH_4OH + HCl = NH_4Cl + H_2O$$

একইরূপে অন্যান্য এসিডের সঙ্গেও অ্যামোনিয়া বিক্রিয়া করে।

(iii) অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড বিভিন্ন যৌগের জলীয় দ্রবণের সঙ্গে বিক্রিয়া করিয়া উহাদের হাইড্রক্সাইড উৎপন্ন করে। উদাহরণ—ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড (Magnesium chloride, $MgCl_2$) ও অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইডের বিক্রিয়ায় ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রক্সাইড, $Mg(OH)_2$ উৎপন্ন হয়। ইহা জলে খুব কম দ্রাবিত হয় বলিয়া এই বিক্রিয়ায় দ্রবণের মধ্যে ইহা আলাদা সাদা পদার্থরূপে দেখা দেয়। এই ঘটনাকে **'অধঃক্ষেপণ বা প্রিসিপিটেশন'** (Precipitation) বলে।

দ্রবণের মধ্যে বিক্রিয়ার ফলে পৃথক হওয়া কঠিন পদার্থকে বলে **অধঃক্ষেপ** (Precipitate)। অধঃক্ষেপণ বুঝাইতে সেই যৌগের পাশে একটি নিম্নমুখী তীর চিহ্ন (↓) দেওয়া যায়।

$$MgCl_2 + 2NH_4OH = Mg(OH)_2 \downarrow + 2NH_4Cl$$

(iv) অ্যামোনিয়া গ্যাস অন্য পদার্থের দহনে সাহায্য করে না কিন্তু অক্সিজেন গ্যাসে ইহা জ্বালান যায়।

$$4NH_3 + 3O_2 = 2N_2 + 6H_2O$$

(v) নেসলার দ্রবণের (Nessler's solution-এর) সহিত বিক্রিয়ায় অ্যামোনিয়া গাঢ় বাদামী রংয়ের অধঃক্ষেপ উৎপন্ন করে।

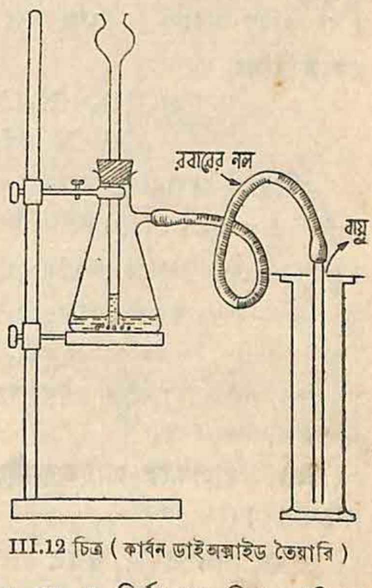
প্রশ্ন। অ্যামোনিয়া প্রস্তুত করার একটি সহজ উপায় বর্ণনা কর। উহার ভৌত ধর্ম ও তিনটি রাসায়নিক ধর্ম বল।

(5) কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈয়ারি (Preparation of carbon dioxide)।

তত্ত্ব : যে কোন কার্বনেট বা বাইকার্বনেটে (bicarbonate-এ) হাইড্রোক্লোরিক এসিড, সালফিউরিক এসিড ইত্যাদি দিলে কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয়। পরীক্ষাগারে সাধারণত চুনাপাথর ও হাইড্রোক্লোরিক এসিডের বিক্রিয়ায় কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন করা হয়।

$$CaCO_3 + 2HCl = CaCl_2 + CO_2 + H_2O$$

প্রক্রিয়া : দীর্ঘ নলযুক্ত থিস্‌ল্ ফানেল ও নির্গম-নল লাগান বুখ্‌নার ফ্লাস্কে (III.12 চিত্র) অথবা কিপের যন্ত্রের গোলাকার অংশগুলির মাঝেরটিতে (III.9 চিত্র) মার্বেলের টুকরা নেওয়া হয় এবং ফানেল দিয়া জল মিশ্রিত হাইড্রোক্লোরিক এসিড ফ্লাস্কে এমন পরিমাণে ঢালা হয় যেন ফানেলের প্রান্ত এসিডে ডুবিয়া থাকে। এসিড মার্বেলের সংস্পর্শে আসা মাত্র কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয় ও নির্গম-নল দিয়া বাহিরে আসে। গ্যাসজার খাড়া রাখিয়া উহাতে নির্গম-নল ঢুকান হয়। কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসজারের বায়ু দূর করিয়া উহাতে জমা হয়, কারণ উহা বায়ুর চেয়ে ভারী।



III.12 চিত্র (কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈয়ারি)

কার্বন ডাইঅক্সাইডের ভৌত ধর্ম। ইহা বর্ণহীন, খুব মৃদু গন্ধযুক্ত ও অম্ল স্বাদযুক্ত একটি গ্যাস। ইহা বায়ুর তুলনায় প্রায় দেড়গুণ ভারী। খুব ঠাণ্ডায় ও চাপে ইহাকে সহজেই তরল অথবা কঠিন অবস্থায় পরিণত করা যায়। কঠিন কার্বন ডাই-অক্সাইডকে 'ড্রাই আইস' (Dry ice ; 'শুকনা বরফ') বলে।

রাসায়নিক ধর্ম। (i) ইহা দাহ্য নয় এবং দহনে সাহায্য করে না। সেজন্য আগুন নিভাইবার কাজে ইহা ব্যবহৃত হয়।

(ii) ইহা **জলে দ্রবীভূত হইয়া কার্বনিক এসিড** (Carbonic acid, H_2CO_3) উৎপন্ন করে।

$$H_2O + CO_2 = H_2CO_3$$

এই কারণে **জলীয় দ্রবণে কার্বন ডাইঅক্সাইডের বিক্রিয়া আসলে কার্বনিক এসিডের বিক্রিয়া।**

(iii) ক্যালসিয়াম অক্সাইডের সঙ্গে বিক্রিয়ায় ইহা ক্যালসিয়াম কার্বনেট উৎপন্ন করে।

$$CaO + CO_2 = CaCO_3$$

(iv) সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড, ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড, ইত্যাদি ক্ষারজাতীয় পদার্থের জলীয় দ্রবণের সঙ্গে বিক্রিয়ায় ইহা ক্রমান্বয়ে উহাদের কার্বনেট ও বাইকার্বনেট (বা এসিড-কার্বনেট) উৎপন্ন করে। $Ca(OH)_2$-র দ্রবণ, অর্থাৎ চুনের জলের ক্ষেত্রে বিক্রিয়া হয়

$$Ca(OH)_2 + H_2CO_3 = CaCO_3 \downarrow = 2H_2O$$

$$CaCO_3 + H_2CO_3 = Ca(HCO_3)_2$$

সমীকরণে দেখান এই বিক্রিয়ায় প্রথমে $CaCO_3$ অধঃক্ষেপরূপে পাওয়া যায়; কিন্তু অতিরিক্ত কার্বনিক এসিডে ইহা বাইকার্বনেটে রূপান্তরিত হইয়া জলে দ্রাবিত হয়।

(v) বেশী উষ্ণতায় ক্ষেত্রবিশেষে কার্বন ডাইঅক্সাইড **জারকরূপে** বিক্রিয়া করে। উদাহরণ—উত্তপ্ত কার্বনের সহিত বিক্রিয়ায় কার্বন মনক্সাইড উৎপন্ন করা :

$$CO_2 + C = 2CO$$

প্রশ্ন। পরীক্ষাগারে কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈয়ারির একটি উপায় বর্ণনা কর। উহার ভৌত ধর্ম ও তিনটি রাসায়নিক ধর্ম বল।

(6) সালফার ডাইঅক্সাইড তৈয়ারি (Preparation of sulphur dioxide)।

প্রথম পদ্ধতি। তত্ত্ব : সোডিয়াম সালফাইট (Sodium sulphite, Na_2SO_3) অথবা সোডিয়াম বাইসালফাইটে (Sodium bisulphite, $NaHSO_3$-তে) সালফিউরিক এসিড দিলে সোডিয়াম সালফেট (Sodium sulphate, Na_2SO_4) ও সালফার ডাইঅক্সাইড তৈয়ারি হয়।

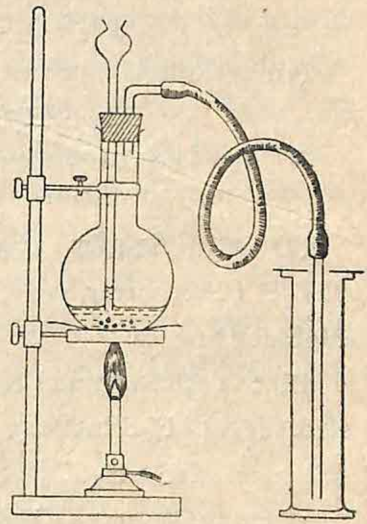
$$Na_2SO_3 + H_2SO_4 = Na_2SO_4 + SO_2 + H_2O$$
$$2NaHSO_3 + H_2SO_4 = Na_2SO_4 + 2SO_2 + 2H_2O$$

প্রক্রিয়া : কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈয়ারি করার মত (III.12 চিত্র দেখ) যন্ত্র সাজাইয়া অর্থাৎ দীর্ঘনলযুক্ত থিস্‌ল্ ফানেল ও নির্গম-নল লাগান বুখ্‌নার ফ্লাস্কে সোডিয়াম সালফাইট অথবা সোডিয়াম বাইসালফাইটের গাঢ় জলীয় দ্রবণ নেওয়া হয় এবং ফানেলের মধ্য দিয়া গাঢ় সালফিউরিক এসিড দেওয়া হয়। এসিড ও সালফাইটের বিক্রিয়ায় সালফার ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হইয়া নির্গম-নল দিয়া বাহিরে আসে ও গ্যাসজারে জমা হয়। বায়ুর তুলনায় দ্বিগুণের বেশী ভারী বলিয়া কার্বন ডাইঅক্সাইডের মত ইহাও গ্যাসজারের বায়ু উপর দিকে ঠেলিয়া দিয়া উহার স্থান অধিকার করে।

দ্বিতীয় পদ্ধতি। তত্ত্ব : কপার, সালফার, মারকারি ইত্যাদি বিভিন্ন মৌল গরম অবস্থায় গাঢ় সালফিউরিক এসিডকে বিজারিত করিয়া সালফার ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন করে। কপারের এইরূপ বিক্রিয়ায় কপার সালফেটও ($CuSO_4$) তৈয়ারি হয়।

$$Cu + 2H_2SO_4 = CuSO_4 + SO_2 + 2H_2O$$

প্রক্রিয়া : একটি গোল তলাবিশিষ্ট ফ্লাস্কে কপার ধাতু নেওয়া হয় ও উহাতে দীর্ঘনলযুক্ত থিস্‌ল্ ফানেল ও নির্গম-নলযুক্ত ছিপি লাগান হয় (III.13 চিত্র)। তারপর ফানেল দিয়া ফ্লাস্কটিতে গাঢ় সালফিউরিক এসিড এমন পরিমাণে ঢালা হয় যাহাতে কপার ধাতু ও থিস্‌ল্ ফানেলের প্রান্ত সালফিউরিক এসিডে ডুবিয়া থাকে। তখন মিশ্রণটি সাবধানে গরম করা হয়। উৎপন্ন সালফার ডাইঅক্সাইডকে আগের মতই বায়ুর প্রতিস্থাপনে গ্যাস জারে সংগ্রহ করা হয়।


III.13 চিত্র (সালফার ডাইঅক্সাইড তৈয়ারি)

সালফার ডাইঅক্সাইডের ভৌত ধর্ম। ইহা তীব্র গন্ধযুক্ত বর্ণহীন গ্যাস ও বায়ুর তুলনায় ভারী। ঠাণ্ডা করিয়া ইহাকে সহজেই তরল করা যায়।

রাসায়নিক ধর্ম। (i) ইহা দাহ্য নয় এবং সাধারণত অন্য পদার্থের দহনে সহায়তা করে না।

(ii) ইহা **জলে দ্রাবিত হইয়া সালফিউরাস এসিড** (Sulphurous acid, H_2SO_3) উৎপন্ন করে।

$$H_2O+SO_2=H_2SO_3$$

(iii) ইহা ক্ষারজাতীয় পদার্থের সহিত বিক্রিয়া করে। সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডের দ্রবণের সঙ্গে বিক্রিয়া করিয়া ইহা ক্রমান্বয়ে সোডিয়াম সালফাইট ও বাইসালফাইট উৎপন্ন করে।

$$2NaOH+H_2SO_3=Na_2SO_3+2H_2O$$
$$NaOH+H_2SO_3=NaHSO_3+H_2O$$

(iv) ইহা অনেক সময় **বিজারকরূপেও** বিক্রিয়া করে। ক্লোরিন, ফেরিক ক্লোরাইড (Ferric chloride, $FeCl_3$) ইত্যাদিকে ইহা বিজারিত করিয়া যথাক্রমে হাইড্রোক্লোরিক এসিড ও ফেরাস ক্লোরাইড (Ferrous chloride, $FeCl_2$)-এ পরিণত করে এবং নিজে সালফিউরিক এসিডে জারিত হয়।

$$Cl_2+2H_2O+SO_2=2HCl+H_2SO_4$$
$$2FeCl_3+2H_2O+SO_2=2FeCl_2+H_2SO_4+2HCl$$

(v) বিশেষ উষ্ণতায় ও প্রভাবকের উপস্থিতিতে সালফার ডাইঅক্সাইড অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করিয়া সালফার ট্রাইঅক্সাইড (Sulphur trioxide, SO_3) গ্যাস উৎপন্ন করে।

$$2SO_2+O_2=2SO_3$$

(vi) হাইড্রোজেন সালফাইডের সঙ্গে ইহা **জারকরূপে** বিক্রিয়া করে।

$$SO_2+2H_2S=3S\downarrow+2H_2O$$

প্রশ্ন। সালফার ডাইঅক্সাইড তৈয়ারি করার একটি পদ্ধতি বর্ণনা কর। উহার ভৌত ধর্ম ও তিনটি রাসায়নিক ধর্ম বল। সালফার ট্রাইঅক্সাইড কি ভাবে তৈয়ারি করা যায়?

(7) সালফিউরেটেড হাইড্রোজেন বা হাইড্রোজেন সালফাইড তৈয়ারি (Preparation of Sulphuretted hydrogen or Hydrogen sulphide)।

তত্ত্ব: ফেরাস সালফাইড (Ferrous sulphide, FeS) ও লঘু সালফিউরিক এসিডের বিক্রিয়ায় H_2S তৈয়ারি হয়।

$$FeS+H_2SO_4=FeSO_4+H_2S$$

এই সঙ্গে ফেরাস সালফেট (Ferrous sulphate, $FeSO_4$)-ও উৎপন্ন হয়।

প্রক্রিয়া: হাইড্রোজেন তৈয়ারির মত যন্ত্র সাজাইয়া (III.8 ও III.9 চিত্র দেখ) উল্ফ্‌ বোতলে অথবা কিপের যন্ত্রের মধ্যেকার গোলাকার অংশে ফেরাস

সালফাইড নেওয়া হয় ও লঘু সালফিউরিক এসিড ফানেল দিয়া ঢালা হয়। ফেরাস সালফাইডের সংস্পর্শে এসিড আসা মাত্র হাইড্রোজেন সালফাইড উৎপন্ন হইয়া নির্গম-নল দিয়া বাহির হয়। ইহা জলে দ্রবীভূত হয় বলিয়া জলের প্রতিস্থাপনে (displacement-এ) ইহাকে সংগ্রহ করা হয় না। বায়ুর তুলনায় ভারী বলিয়া কার্বন ডাইঅক্সাইডের মত বায়ুর প্রতিস্থাপনে ইহা সংগ্রহ করা হয়।

হাইড্রোজেন সালফাইডের ভৌত ধর্ম। ইহা বর্ণহীন ও পচা ডিমের মত গন্ধযুক্ত একটি বিষাক্ত গ্যাস। বায়ুর তুলনায় ইহা ভারী।

রাসায়নিক ধর্ম। (i) ইহা দহনে সহায়তা করে না, কিন্তু নিজে দাহ্য। ইহার জ্বলনে সালফার অথবা সালফার ডাইঅক্সাইড ও জল তৈয়ারি হয়।

$$2H_2S + O_2 = 2H_2O + 2S$$

$$2H_2S + 3O_2 = 2H_2O + 2SO_2$$

(ii) ইহা **জলে দ্রাবিত হয় ও এসিডজাতীয় দ্রবণ** উৎপন্ন করে। সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডের সঙ্গে বিক্রিয়ায় ইহা ক্রমান্বয়ে সোডিয়াম সালফাইড ও সোডিয়াম হাইড্রোসালফাইড (Sodium hydrosulphide, NaHS) উৎপন্ন করে।

$$2NaOH + H_2S = Na_2S + 2H_2O$$

$$NaOH + H_2S = NaHS + H_2O$$

অন্যান্য ক্ষারের সঙ্গেও ইহা একইরূপে বিক্রিয়া করে।

(iii) মারকিউরিক ক্লোরাইড (Mercuric chloride, $HgCl_2$), কপার সালফেট, লেড নাইট্রেট (Lead nitrate, $Pb(NO_3)_2$) প্রভৃতির দ্রবণে হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস প্রবেশ করাইলে যথাক্রমে মারকিউরিক সালফাইড (HgS), কপার সালফাইড (CuS) ও লেড সালফাইড (PbS) অধঃক্ষেপরূপে পাওয়া যায়।

$$HgCl_2 + H_2S = HgS \downarrow + 2HCl$$

$$CuSO_4 + H_2S = CuS \downarrow + H_2SO_4$$

$$Pb(NO_3)_2 + H_2S = PbS \downarrow + 2HNO_3$$

(iv) ক্লোরিন, ফেরিক ক্লোরাইড ইত্যাদির সঙ্গে ইহা **বিজারক রূপে** বিক্রিয়া করে এবং যথাক্রমে হাইড্রোক্লোরিক এসিড ও ফেরাস ক্লোরাইড উৎপন্ন করে। ইহার জারণে সালফার উৎপন্ন হয়।

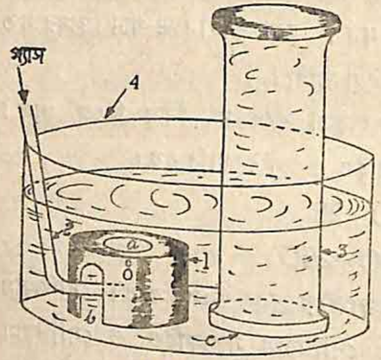
$$Cl_2 + H_2S = 2HCl + S \downarrow$$

$$2FeCl_3 + H_2S = 2FeCl_2 + 2HCl + S \downarrow$$

প্রশ্ন। হাইড্রোজেন সালফাইডের অন্য নাম কি? ইহা কিভাবে তৈয়ারি করা যায়? ইহার ভৌত ধর্ম ও তিনটি রাসায়নিক ধর্ম বল।

পরিশিষ্ট

১। বী-হাইভ সেল্‌ফ্ (Bee-hive shelf)-এর সাহায্যে জল ভরা গ্যাস জারে গ্যাস সংগ্রহ। III.6(ক) চিত্রে জল ভরা গ্যাস জারে কিভাবে গ্যাস সংগ্রহ করা হয় তাহা আলাদা করিয়া দেখান হইয়াছে।



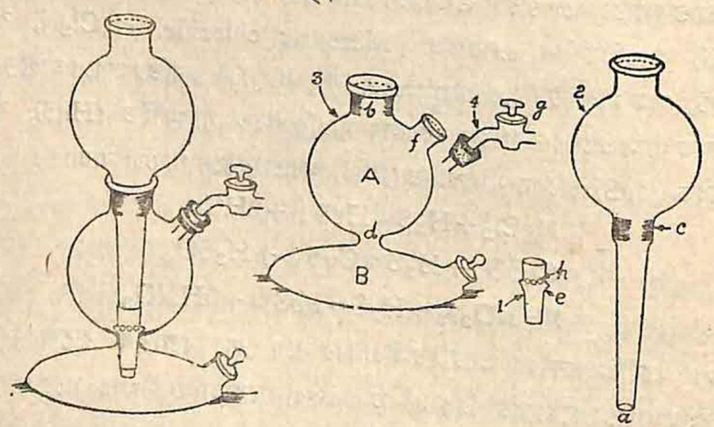
III.6 (ক) চিত্র

1=বী-হাইভ সেল্‌ফ্। ইহা একটি বিশেষ ধরনের বাটি। বাটির খোলামুখ নিচের দিকে। বাটির উপরে *a* অংশ এবং পাশের *b* অংশ দুটি ছিদ্র।

2=নির্গম-নল। ইহা *b* ছিদ্র দিয়া সেল্‌ফের ভিতরে ঢোকে। নলের প্রান্ত দিয়া বাহির হওয়া গ্যাসের বুদ্‌বুদ *a* ছিদ্র দিয়া উঠিয়া সেল্‌ফের উপরে রাখা জল ভরা গ্যাস জারে জল সরাইয়া জমা হয়।

3=জল ভরা গ্যাস জার জল পাত্রের (4) জলে উবুড় করা অবস্থায় দেখান আছে। জারের খোলামুখ *c* নিচের দিকে। গ্যাস সংগ্রহের সময় জলভরা গ্যাস জার বী-হাইভ সেল্‌ফের উপর বসান হয়।

২। কিপের যন্ত্রের (Kipp's apparatus-এর) বিভিন্ন অংশ। এই যন্ত্রের একটু বিভিন্ন রূপ আছে। III.9 চিত্রে আঁকা যন্ত্রের অংশগুলি এখানে (III.9(ক) চিত্রে) আলাদা করিয়া দেখান হইয়াছে।



III.9 (ক) চিত্র। বাঁ দিকে সকল অংশ লাগান ফাঁকা যন্ত্র; ডান দিকে যন্ত্রের বিভিন্ন অংশ।
1=কলার (collar); 2=ফানেল; 3=যন্ত্রের গোলক (A) ও অর্ধগোলক (B) আকার অংশ; 4=ছিপিযুক্ত নির্গম-নল।

কিপের যন্ত্রের ফানেলের (2) লেজে *a*-প্রান্ত দিয়া প্রথমে কলার (1) পরান হয়। কলার একটু ঢিলা থাকে। যন্ত্রের (3) অংশকে কাত করিয়া কলার সমেত ফানেল (2)

উহাতে b মুখ দিয়া ঢুকান হয়। 3-এর b ও 2-এর c-র ভিতরে কোন ফাঁক থাকে না। কলার (1)-এর e অংশ একটু চওড়া থাকায় কলার যন্ত্রের d অংশে আলগা ভাবে আটকাইয়া থাকে। যন্ত্র কাত করিয়া f-পথে উহার ভিতরে জিংকের টুকরা (বা প্রয়োজন মত অন্য জিনিস) ঢুকান হয়। টুকরাগুলি কলারের e অংশে আটকাইয়া থাকে; নিচে B অংশে পড়িতে পারে না।

এবার যন্ত্র খাড়া করিয়া উহার f-মুখে নির্গম-নল সমেত ছিপি (4) আঁটা হয়। এখন ফানেলে এসিড ঢালিলে এসিড যন্ত্রের B অংশ ভর্তি করিয়া কলারের মধ্য দিয়া উঠিয়া উহার h ছিদ্র দিয়া যন্ত্রের A অংশে রাখা জিংক স্পর্শ করিলে গ্যাস উদ্ভূত হয়। স্টপকক g খোলা থাকিলে নির্গম-নল দিয়া গ্যাস বাহির হয়। g বন্ধ করিলে A-র ভিতরে গ্যাসের চাপ বাড়ে ও গ্যাস এসিডকে ঠেলিয়া B অংশে নামায়। ইহার ফলে এসিড ও জিংকে সংস্পর্শ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় গ্যাসের উদ্গম বন্ধ হয়। g খুলিলে নির্গম-নল দিয়া গ্যাস বাহির হওয়ায় A-তে চাপ কমে এবং B হইতে এসিড আবার A-তে ওঠে। ইহাতে আবার গ্যাস উদ্ভূত হইতে থাকে।

বিক্রিয়ার ফলে জিংকের টুকরা ক্রমশ ছোট হয়; কিন্তু কলার থাকায় B-তে পড়িতে পারে না। কলার লাগাইবার ইহাই সুবিধা।

৩। কয়েকটি সুপরিচিত মৌল ও তাহাদের চিহ্ন

নাম	চিহ্ন	নাম	চিহ্ন
অ্যালুমিনিয়াম	Al	ম্যাগনেসিয়াম	Mg
অ্যান্টিমনি	Sb	ম্যাঙ্গানিজ	Mn
আর্গন	Ar	মার্কারি (পারা)	Hg
আর্সেনিক	As	নিয়ন	Ne
বেরিয়াম	Ba	নিকেল	Ni
বিসমাথ	Bi	নাইট্রোজেন	N
বোরন	B	অক্সিজেন	O
ব্রোমিন	Br	ফসফরাস	P
সিজিয়াম	Cs	প্ল্যাটিনাম	Pt
ক্যালসিয়াম	Ca	পটাসিয়াম	K
কার্বন	C	রেডিয়াম	Ra
ক্লোরিন	Cl	রুবিডিয়াম	Rb
ক্রোমিয়াম	Cr	সেলেনিয়াম	Se

নাম	চিহ্ন	নাম	চিহ্ন
কোবাল্ট	Co	সিলিকন	Si
কপার (তামা)	Cu	সিলভার (রূপা)	Ag
ফ্লুওরিন	F	সোডিয়াম	Na
গোল্ড (সোনা)	Au	সালফার (গন্ধক)	S
হিলিয়াম	He	টিন	Sn
হাইড্রোজেন	H	টাইটেনিয়াম	Ti
আয়োডিন	I	টাংস্টেন	W
আয়রন (লোহা)	Fe	ইউরেনিয়াম	U
লেড (সীসা)	Pb	জেনন	Xe
লিথিয়াম	Li	জিংক	Zn

৪। **কয়েকটি আয়ন, উহাদের নাম ও সংকেত এবং যৌগের রাসায়নিক সংকেত লেখা ঃ**

পজিটিভ আয়ন (ক্যাটায়ন)		নিগেটিভ আয়ন (অ্যানায়ন)	
আয়নের নাম	সংকেত	আয়নের নাম	সংকেত
অ্যামোনিয়াম	NH_4^+	ফ্লুওরাইড	F^-
হাইড্রোজেন	H^+	ক্লোরাইড	Cl^-
সোডিয়াম	Na^+	ক্লোরেট	ClO_3^-
পটাসিয়াম	K^+	পারক্লোরেট	ClO_4^-
সিলভার	Ag^+	ব্রোমাইড	Br^-
কপার (I) বা		আয়োডাইড	I^-
কিউপ্রাস (Cuprous)	Cu^+	হাইড্রক্সাইড বা হাইড্রক্সিল আয়ন	OH^-
কপার (II) বা		অক্সাইড	O^{2-}
কিউপ্রিক (Cupric)	Cu^{2+}	পেরক্সাইড	O_2^{2-}
ক্যালসিয়াম	Ca^{2+}	কার্বনেট	CO_3^{2-}
বেরিয়াম	Ba^{2+}	হাইড্রোজেন কার্বনেট বা	
ম্যাগনেসিয়াম	Mg^{2+}	বাইকার্বনেট	HCO_3^-

পজিটিভ আয়ন (ক্যাটায়ন)	
আয়নের নাম	**সংকেত**
জিংক	Zn^{2+}
মারকারি (I) বা মারকিউরাস (Mercurous)	$Hg_2{}^{2+}$
মারকারি (II) বা মারকিউরিক (Mercuric)	Hg^{2+}
লেড	Pb^{2+}
ম্যাঙ্গানিজ (II) বা ম্যাঙ্গানাস (Manganous)	Mn^{2+}
অ্যালুমিনিয়াম	Al^{3+}
ক্রোমিয়াম (III) বা ক্রোমিক (Chromic)	Cr^{3+}
আয়রন (II) বা ফেরাস (Ferrous)	Fe^{2+}
আয়রন (III) বা ফেরিক (Ferric)	Fe^{3+}
টিন (II) বা স্ট্যানাস (Stannous)	Sn^{2+}
টিন (IV) বা স্ট্যানিক (Stannic)	Sn^{4+}

নিগেটিভ আয়ন (অ্যানায়ন)	
আয়নের নাম	**সংকেত**
নাইট্রাইট	$NO_2{}^-$
নাইট্রেট	$NO_3{}^-$
হাইড্রোজেন সালফেট	$HSO_4{}^-$
সালফেট	$SO_4{}^{2-}$
সালফাইড	S^{2-}
সালফাইট	$SO_3{}^{2-}$
ক্রোমেট	$CrO_4{}^{2-}$
ডাইক্রোমেট	$Cr_2O_7{}^{2-}$
পারমাঙ্গানেট	$MnO_4{}^-$
ফসফেট	$PO_4{}^{3-}$

সব যৌগেই পজিটিভ ও নিগেটিভ আধান সমান সমান থাকে। ইহা মনে রাখিয়া উপরের আয়নগুলির সংকেত হইতে আয়নযুক্ত যৌগের সংকেত অনুমান করিয়া সঠিকভাবে লেখা যায়।

উদাহরণ। (১) সোডিয়াম আয়নের বৈদ্যুৎ আধান $+1$ ও ক্লোরাইড আয়নের বৈদ্যুৎ আধান -1। সুতরাং সোডিয়াম আয়ন (Na^+) ও ক্লোরাইড আয়ন (Cl^-) দিয়া গঠিত সোডিয়াম ক্লোরাইডের সংকেত হইবে NaCl।

(২) একইরূপে ক্যালসিয়াম আয়ন (Ca^{2+}) ও ক্লোরাইড আয়ন দিয়া গঠিত ক্যালসিয়াম ক্লোরাইডের সংকেত হইবে $CaCl_2$ (অর্থাৎ Ca^{2+} ও $2 \times Cl^-$)।

(৩) পটাসিয়াম আয়ন (K^+) ও কার্বনেট আয়ন ($CO_3{}^{2-}$) দিয়া গঠিত পটাসিয়াম কার্বনেটের সংকেত হইবে K_2CO_3 (অর্থাৎ $2\times K^+$ ও $CO_3{}^{2-}$)।

(৪) ফেরিক আয়ন (Fe^{3+}) ও ফসফেট আয়ন ($PO_4{}^{3-}$) দিয়া গঠিত ফেরিক ফসফেটের সংকেত হইবে $FePO_4$।

(৫) অ্যালুমিনিয়াম আয়ন (Al^{3+}) ও সালফেট আয়ন ($SO_4{}^{2-}$) দিয়া গঠিত অ্যালুমিনিয়াম সালফেটের সংকেত হইবে $Al_2(SO_4)_3$ (দুইটি অ্যালুমিনিয়াম আয়নের মোট বৈদ্যুৎ আধান $+3\times2=+6$ ও তিনটি সালফেট আয়নের মোট বৈদ্যুৎ আধান $-2\times3=-6$)।

কার্বন মনক্সাইড (CO), কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2), মিথেন (CH_4), ইথেন (C_2H_6), ইথিলিন (C_2H_4) ইত্যাদি যে সকল যৌগ অণু দিয়া গঠিত, সেই সকল যৌগের সংকেত একমাত্র উহাদের রাসায়নিক বিশ্লেষণের ফলের উপর ভিত্তি করিয়াই সঠিকভাবে লেখা সম্ভব। অন্যথায় শুধুমাত্র যোজ্যতার উপর ভিত্তি করিয়া লিখিতে গেলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা।

বিবিধ প্রশ্ন

প্রথম অংশ—রসায়ন ও পদার্থ-বিদ্যা উভয়ে প্রযোজ্য

(I-1 হইতে I-5 বিভাগ পর্যন্ত)

1. মাপনের বিভিন্ন পদ্ধতির নাম কর, এবং উহাদের কোনটিতে দৈর্ঘ্য, ভর ও কালের একক কি কি বল।

2. শক্তি কাহাকে বলে? বিভিন্ন প্রকার শক্তির নাম কর ও উহাদের রূপান্তরের তিনটি উদাহরণ দাও।

3. ভর ও শক্তির নিত্যতা বা সংরক্ষণ বলিতে কি বুঝায় ব্যাখ্যা কর।

ভর ও ভারে প্রভেদ কি? ভর আছে অথচ ভার নাই ইহা কোন্ অবস্থায় হইতে পারে?

4. পদার্থের বিভিন্ন প্রকার অবস্থান্তর উদাহরণের সাহায্যে বর্ণনা কর। স্ফুটন ও বাষ্পনে প্রভেদ কি?

5. গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক কাহাদের বলে? উহারা কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে? জলের স্ফুটনাঙ্ক কি ভাবে বাড়ান বা কমান যায়? বরফ 0°C-র নিচে কি ভাবে গলাইতে পার?

6. লীন তাপ কাহাকে বলে? বরফের লীন তাপ প্রতি গ্রামে 80 ক্যালরি বলিলে কি বুঝায়? এক শিশি জল বরফ দিয়া ঢাকিয়া রাখিলে উহা জমিবে কিনা বুঝাইয়া বল।

দ্বিতীয় অংশ—পদার্থ-বিদ্যা

(II-1 হইতে II-6 বিভাগ পর্যন্ত)

1. স্থিতি ও গতিকে আপেক্ষিক বলা হয় কেন? বেগ ও দ্রুতিতে প্রভেদ কি? ত্বরণ ও মন্দন কাহাকে বলে উদাহরণ দিয়া বুঝাও। ত্বরণ বা মন্দনের উল্লেখে সময়ের একক দুবার আসে কেন?

2. নিউটনের গতিবিষয়ক সূত্রগুলি বল। জাড্য বলিতে কি বুঝায় উদাহরণ দিয়া বল।

3. নিউটনের প্রথম সূত্র হইতে বলের কি সংজ্ঞা পাওয়া যায়? দ্বিতীয় সূত্র বল মাপনের কি উপায় নির্দেশ করে? তৃতীয় সূত্র প্রথম দুটি হইতে কি বিষয়ে পৃথক?

4. বলের সংজ্ঞা দাও ও ক্রিয়াগুলি বল।

10 গ্রাম ভরকে প্রতি বর্গ সেকেণ্ডে 30 সেমি ত্বরণ দিতে কত বলের প্রয়োজন? 40 পাউণ্ডাল বলে 2 পাউণ্ড ভরে কত ত্বরণ হইবে?

5. কার্য ও ক্ষমতা বলিতে কি বুঝায়? কোন বল দ্বারা কৃত কার্য ও উহা দ্বারা ব্যয়িত ক্ষমতা জানিতে হইলে কি কি রাশি জানা থাকা দরকার?

গতিশক্তি ও স্থিতিশক্তি কি? উহাদের একটি হইতে অন্যটিতে রূপান্তরের উদাহরণ দাও।

6. আর্গ, জুল, ওয়াট, ফুট-পাউণ্ড, হর্স পাওয়ার কাহাদের বলে?

ভূমি হইতে 10 মিটার উচ্চতায় এক কিলোগ্রাম ভর সেকেণ্ডে 5 মিটার বেগে চলিতেছে। উহার স্থিতিশক্তি ও গতিশক্তি কত?

7. বিভিন্ন শ্রেণীর লিভারের একটি করিয়া উদাহরণ দিয়া উহাদের সুবিধা অসুবিধা বুঝাইয়া বল।

8. নত-তল বা চক্র-ও-অক্ষদণ্ডের সাহায্যে আমাদের কার্য করিতে কি সুবিধা হয় বুঝাও।

9. তাপ ও উষ্ণতার প্রভেদ কি? কোন বস্তু উষ্ণ করিতে যে তাপ লাগিবে তাহা কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে?

10. তাপ এক প্রকার শক্তি এ সিদ্ধান্তে কি ভাবে আসা যায়? কার্যের সহিত ইহার সম্পর্ক কি? তাপশক্তি কি প্রকারের শক্তি, এ সম্বন্ধে যাহা জান লেখ।

11. প্রতিফলন ও প্রতিসরণের সূত্রগুলি বল এবং উহাতে ব্যবহৃত বিশেষ কথাগুলির অর্থ বুঝাও। প্রতিসরাঙ্ক কাহাকে বলে? উহা কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে?

12. সমান গভীর জলে দাঁড়াইয়া থাকিলে পায়ের কাছেই জল সব চেয়ে গভীর মনে হয় কেন?

13. পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন কি অবস্থায় ঘটে বুঝাইয়া বল। কিরূপ অবস্থা হইলে মরুভূমিতে মরীচিকা দেখা যাইতে পারে?

14. উত্তল লেন্সের সাহায্যে আলো কি করিয়া কেন্দ্রীভূত হয়? আলো কেন্দ্রীকরণের ক্ষমতা লেন্সের কি কি বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে? উত্তল লেন্সের ফোকাস্ ও ফোকাস-দূরত্ব কাহাদের বলে? ফোকাস-দূরত্ব কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে?

15. উত্তল লেন্সের সাহায্যে ছোট জিনিসকে কি ভাবে বড় করিয়া দেখা যায়, ছবি আঁকিয়া বুঝাইয়া বল।

16. আলোর বিচ্ছুরণ কাহাকে বলে? দীপকের বর্ণালি বলিতে কি বুঝায়? সূর্যের আলোর বর্ণালি কি ভাবে দেখা যায়? বর্ণালির সাহায্যে দীপক সম্বন্ধে কোন তথ্য জানা যায় কি?

তৃতীয় অংশ—রসায়ন

(III-1 হইতে III-8 বিভাগ পর্যন্ত)

1. বিশুদ্ধ পদার্থ কি কারণে তিন অবস্থায় থাকিতে পারে বুঝাইয়া বল। গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক বলিতে কি বুঝায়? সকল পদার্থেরই কি এগুলি থাকে? কি প্রকার ক্ষেত্রে গলনাঙ্ক ও হিমাঙ্ক এক হয়?

2. দেখিতে এক রকম দুটি পদার্থকে উহাদের (ক) ভৌতধর্মের, (খ) রাসায়নিক ধর্মের সাহায্য কি ভাবে চেনা যাইতে পারে, তাহা দুইটি করিয়া উদাহরণ দিয়া বুঝাও।

3. ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তন তুলনা কর।

তাপ উৎপাদক ও তাপ শোষক পরিবর্তনের একটি করিয়া ভৌত ও রাসায়নিক উদাহরণ দাও।

4. কি কি বিষয় রাসায়নিক বিক্রিয়াকে প্রভাবিত করিতে পারে তাহাদের নাম কর ও প্রত্যেকটির একটি করিয়া উদাহরণ দাও।

5. মৌল ও যৌগ কাহাদের বলে? প্রত্যেকের তিনটি করিয়া উদাহরণ দাও। ধাতু ও অধাতুর ধর্ম তুলনা কর। সকল মৌলকেই কি এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়? উদাহরণ দাও।

6. দ্রবণ, দ্রাবক ও দ্রাব কথাগুলির অর্থ বল। সংপৃক্ত ও অসংপৃক্ত দ্রবণ কাহাদের বলে? ইহাদের উপর উষ্ণতার ক্রিয়া ব্যাখ্যা কর। উদাহরণ দাও।

দ্রাব্যতা কাহাকে বলে? উহার উপর উষ্ণতার ক্রিয়া কি? গ্যাসীয় দ্রবণে চাপের ক্রিয়া কি?

7. রাসায়নিক চিহ্ন (Symbol) ও সংকেত (Formula) বলিতে কি বুঝায়? মৌল ও যৌগের ক্ষেত্রে ইহাদের কি কি বিভিন্ন তাৎপর্য আছে বল।

8. রাসায়নিক সমীকরণ বলিতে কি বুঝায়? সমীকরণ সুষম (প্রতিমান ; balance) করার অর্থ কি? উদাহরণ দিয়া অপ্রতিমিত ও প্রতিমিত সমীকরণের প্রভেদ বুঝাও।

9. ইলেকট্রোলাইসিস কাহাকে বলে? ইলেকট্রোলাইট বলিতে কি বোঝ? জলকে ইলেকট্রোলাইসিসের সাহায্যে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনে বিচ্ছিন্ন করার কোন ব্যবস্থা বর্ণনা কর।

10. ইলেকট্রোপ্লেটিং কাহাকে বলে? উহার উদ্দেশ্য কি? ইলেকট্রোপ্লেটিং করিতে কি প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়?

11. এসিড, ক্ষারক ও লবণ কাহাদের বলে? প্রত্যেকের দুইটি করিয়া উদাহরণ দাও।
এসিড ও ক্ষারকের ধর্মগুলি বর্ণনা কর।
প্রশমন বলিতে কি বুঝায়? সম্পূর্ণ প্রশমন কি ভাবে বোঝা যায়?

12. শমিত লবণ, এসিড লবণ ও ক্ষারকীয় লবণ কাহাদের বলে একটি করিয়া উদাহরণ দিয়া বুঝাও

13. জারণ ও বিজারণ কাহাকে বলে? তিনটি জারক ও তিনটি বিজারকের নাম বল। জারণ ও বিজারণ একই সঙ্গে ঘটে এ কথা বলার তাৎপর্য কি?

14. বায়ুকে কি অবস্থায় তরল করা যায়? তরল বায়ু রাখিয়া দিলে উহা হইতে কোন্ গ্যাস বেশী উবিয়া যায়? তরল বায়ু কি রকম পাত্রে রাখা হয়?

বায়ুতে যে পাঁচটি বিরল গ্যাস আছে তাহাদের নাম কর। উহাদের প্রত্যেকের একটি করিয়া প্রয়োগ বল।

15. নাইট্রোজেন-চক্র ও কার্বন ডাইঅক্সাইড-চক্র বলিতে কি বুঝায় লিপিচিত্রের সাহায্যে বর্ণনা কর।

16. নিচের যে কোন একটি পদার্থ পরীক্ষাগারে কি করিয়া তৈয়ার করা যায় বল। উহার ধর্মগুলিও বল।

(১) অক্সিজেন; (২) হাইড্রোজেন; (৩) নাইট্রোজেন; (৪) অ্যামোনিয়া, (৫) সালফার ডাই-অক্সাইড; (৬) হাইড্রোজেন সালফাইড (H_2S); (৭) কার্বন ডাই-অক্সাইড।

1. শূন্যস্থানগুলি পূর্ণ কর :—
   (১) সিজিএস্ পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্যের একক —, ভরের একক —, সময়ের একক —।
   (২) এম্‌কেএস্ পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্যের একক —, ভরের একক —, সময়ের একক —।
   (৩) এফ্‌পিএস্ পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্যের একক —, ভরের একক —, সময়ের একক —।
   (৪) দৈর্ঘ্যের মাপন যন্ত্র —, ভরের মাপন যন্ত্র —, আয়তনের মাপন যন্ত্র —।
   (৫) শূন্যস্থানে আলোর বেগ সেকেণ্ডে — মিটার বা — মাইল।
   (৬) জুল — একক, হর্স পাওয়ার — একক, ফুট-পাউণ্ড — একক। (কোন্ রাশির একক তাহা বল।)
   (৭) ওয়াট — একক; কিলোওয়াট হর্স পাওয়ার অপেক্ষা —।
   (৮) এসিডে — যোগ করিলে উহা লবণে পরিণত হয়।
   (৯) ইলেকট্রোলাইসিস সেলে পজিটিভ আয়নগুলি — যায়; নিগেটিভ আয়নগুলি — যায়।
   (১০) 'শুকনা বরফ' বা 'Dry ice' বলিতে কঠিন — বুঝায়।

2. ডানদিকের কথাগুলি হইতে ঠিক কথাটি নিয়া শূন্যস্থান পূর্ণ কর :—
   (১) তামা —, সিলিকন —, সালফার —। (ধাতুকল্প, অধাতু, ধাতু)
   (২) চিনির দ্রবণ বিদ্যুৎ —, বিশুদ্ধ জল —, নুনের দ্রবণ —। (পরিবাহী, অপরিবাহী)
   (৩) হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস —, কিন্তু উহার দ্রবণ —। (এসিড, এসিড নয়)
   (৪) — ও — -এর ক্রিয়ায় — উৎপন্ন হয়। (এসিড, ক্ষারক, লবণ)
   (৫) — — কে প্রশমিত করে। (এসিড, ক্ষারক, লবণ)
   (৬) — জারক ও — বিজারক। (অক্সিজেন, হাইড্রোজেন)

(৭) হিলিয়াম প্রধানত আসে — হইতে। (বায়ু, ভূত্বকের প্রাকৃতিক গ্যাস)

(৮) নিয়ন গ্যাস হইতে আলো পাওয়া যায় — জন্য। (ভাস্বরতার, বিদ্যুৎপ্রবাহের)

3. শুদ্ধ কথাটি রাখিয়া অন্যটি কাটিয়া দাও :—

(১) মেট্রিক পদ্ধতিতে মিটার দৈর্ঘ্যের একক/মানক।

(২) এম্‌কেএস্ পদ্ধতিতে কিলোগ্রাম ভরের একক/মানক।

(৩) এফপিএস্ পদ্ধতিতে গজ (yard) দৈর্ঘ্যের একক/মানক।

(৪) সিজিএস্ পদ্ধতিতে আয়তনের একক মিলিলিটার/এক ঘন সেন্টিমিটার।

(৫) আলোক শক্তি আমরা দেখিতে পাই/পাই না।

(৬) একই উচ্চতা হইতে একটি এক কেজি ও একটি দুকেজি ভর একসঙ্গে ছাড়িয়া দিলে উহারা একসঙ্গে মাটিতে পড়িবে/পড়িবে না।

(৭) নকল উপগ্রহে তুলার সাহায্যে ভর মাপা যায়/যায় না।

(৮) সকল প্রকার গ্যাসকে তরল করা যায়/যায় না।

(৯) কাচের নির্দিষ্ট গলনাঙ্ক আছে/নাই।

(১০) বরফের গলনের লীন তাপের চেয়ে জলের বাষ্পনের লীন তাপ বেশী/কম।

(১১) চক্র-ও-অক্ষদণ্ডের ক্রিয়া লিভারের মত/মত নয়।

(১২) আলো বায়ু হইতে জলে প্রবেশ করিলে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন হইতে পারে/পারে না।

(১৩) স্বচ্ছ পদার্থে আলোর বেগ শূন্য স্থানের চেয়ে বেশী/কম।

(১৪) কাচে আলোর বেগ জলে আলোর চেয়ে কম/বেশী।

(১৫) কাচে লাল আলোর বেগ নীল আলোর চেয়ে কম/বেশী।

(১৬) দহন তাপশোষক/তাপ উৎপাদক বিক্রিয়া।

(১৭) নির্দিষ্ট পরিমাণ জলে যত ইচ্ছা চিনি দ্রবিত করা যায়/যায় না।

(১৮) পিতলের চামচে নিকেলের প্রলেপ দিতে চামচকে অ্যানোড/ক্যাথোড করা হয়।

(১৯) তরল বায়ু উবিতে থাকিলে উহাতে অক্সিজেনের/নাইট্রোজেনের আধিক্য ঘটে।

(২০) বায়ুর রাসায়নিক সংকেত আছে/নাই।

4. শুদ্ধ কথাটির আগে ✓ চিহ্ন দাও :—

(১) (ক) অণুর স্থিতিশক্তি ও গতিশক্তিই তাপ শক্তি।

(খ) উষ্ণতার প্রভেদে একস্থান হইতে অন্যস্থানে যে শক্তি যায় তাহাই তাপশক্তি।

(গ) কার্যই তাপশক্তি।

(২) (ক) নিয়ন বাতি উষ্ণ হইয়া আলো দেয়।

(খ) নিয়ন বাতিতে বিদ্যুৎ প্রবাহ গেলে উহা আলো দেয়।

(গ) নিয়ন বাতি নিজ হইতেই আলো দেয় ; অন্ধকার হইলে তাহা দেখা যায়।

(৩) (ক) উত্তল লেন্‌স কেবল সমান্তরাল আলোক কিরণকে এক বিন্দুতে সংহত করিতে পারে।

(খ) উত্তল লেন্‌স যে কোন বিন্দু দীপক হইতে আগত আলোক কিরণকে এক বিন্দুতে সংহত করিতে পারে।

(গ) বিন্দু দীপক উত্তল লেন্‌সের ফোকাসের চেয়ে দূরে থাকিলে লেন্‌স উহা হইতে আগত আলোকে এক বিন্দুতে সংহত করিতে পারে।

আরও প্রশ্ন

(পদার্থ-বিদ্যা)

প্রত্যেক প্রশ্নে বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া শব্দগুলি হইতে উপযুক্ত শব্দটি নিয়া প্রশ্নের শূন্যস্থানগুলি পূর্ণ কর।

১। যে রাশি মাপিয়া মাপনের ফল সংখ্যায় প্রকাশ করা যায় তাহাকে — রাশি বলে। —, —, —, —, —, এরূপ রাশির পাঁচটি উদাহরণ। — বা — এরূপ রাশি নয়। একটি — ও — দিয়া — রাশি প্রকাশ করা হয়।

(সংখ্যা, বোধশক্তি, বল, চেতনা, কার্য, একক, ত্বরণ, বেগ, ভৌত, ক্ষমতা)

২ যে তিনটি রাশির এককের সাহায্যে অন্য সকল ভৌত রাশির একক প্রকাশ করা যায় তাহাদের নাম —, — ও —। ইহাদের একককে — একক বলে। অন্যরাশির এককগুলিকে বলে — একক। সিজিএস্ পদ্ধতিতে — বলের একক ; এমকেএস্ পদ্ধতিতে বলের একক —।

(ডাইন, দৈর্ঘ্য, মৌলিক, ভর, যৌগিক, কাল, নিউটন)

৩। যাহার ক্রিয়ায় পদার্থে পরিবর্তন ঘটে তাহাকে — বলে। সকল পদার্থের —, — ও — আছে। — একপ্রকার শক্তি। — একটি ভৌত ধর্ম। — ও — ভৌত রাশি।

(উষ্ণতা, ভর, আয়তন, তাপ, পারস্পরিক আকর্ষণ ক্ষমতা, শক্তি, ভার)

৪। সকল পদার্থে — আছে ; কিন্তু স্থান বিশেষে উহার — না থাকিতেও পারে। — ও — এরূপ স্থান। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে একই বস্তুর — বিভিন্ন হইতে পারে ; কিন্তু — একই থাকে। বস্তুর — ভূপৃষ্ঠে যাহা, ভূপৃষ্ঠের উপরে ও নিচে তাহার চেয়ে —। অক্ষাংশ বাড়িলে উহা — হয়।

(ভার, কম, ভর, বেশী, ভূকেন্দ্র, উত্তর মেরু, নকল উপগ্রহ)

৫। — ও — সংরক্ষিত রাশি ; উহাদের সৃষ্টি বা বিনাশ হয় না। —র নানারূপ আছে। বাষ্পীয় ইঞ্জিনের চলায় — শক্তি — শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। টর্চের ব্যাটারিতে — শক্তি — শক্তিতে পরিণত হইয়া — ও — দেয়। পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণে — তে রূপান্তরিত হয়।

(রাসায়নিক, গতি, বৈদ্যুতিক, আলো, শক্তি, তাপ, ভর)

৬। বিশুদ্ধ কেলাসিত পদার্থের স্থির — ও — থাকে। কঠিন অবস্থা হইতে উষ্ণতা বাড়াইতে থাকিলে উহারা প্রথমে — ও পরে — অবস্থায় পরিণত হয়। কিন্তু আয়োডিন উষ্ণ করিলে — হইতে — অবস্থায় চলিয়া যায় ; — হয় না।

(কঠিন, তরল, গ্যাসীয়, গলনাঙ্ক, স্ফুটনাঙ্ক)

৭। জল দুইটি বিভিন্ন উপায়ে বাষ্পে পরিণত হইতে পারে : ইহাদের নাম — ও —। — কেবল জলের উপর তল হইতেই হয় : কিন্তু — জলের সর্বাংশ হইতে হয়। — নির্দিষ্ট উষ্ণতায় হয় ; কিন্তু—সকল উষ্ণতায়ই হইতে পারে। মেঘ ও কুয়াশায় জল — অবস্থায় আছে ; বায়ুতে উহার অবস্থা —।

(তরল, বাষ্পীয়, স্ফুটন, বাষ্পন)

৮। চাপ বাড়াইলে জলের স্ফুটনাঙ্ক —, বরফের গলনাঙ্ক —। ন্যাফথালিনের উপর চাপ বাড়াইলে উহার স্ফুটনাঙ্ক —, গলনাঙ্ক —।

(কমে, বাড়ে)

৯। বিশুদ্ধ পদার্থের গলন বা স্ফুটন — উষ্ণতায় হয়। এই উষ্ণতাকে যথাক্রমে — ও — বলে। —তে বা — তে পৌঁছিলেই — বা — হয় না। ঐ উষ্ণতায় আরও — দিতে হয়। এই — উষ্ণতা বাড়ায়

না। ইহাকে — বলে। তরল অবস্থা হইতে বাষ্পে পরিণত হইতে জল লীন তাপ —। জল বরফে পরিণত হইতে লীন তাপ —।

(ছাড়ে, নেয়, তাপ, লীন তাপ, নির্দিষ্ট, গলন, গলনাঙ্ক, স্ফুটন, স্ফুটনাঙ্ক।

১০। —, — ও — রাশি কয়টির মান ও দিক উভয়ই আছে। — রাশিটির মান আছে দিক নাই। — ও — রাশি দুইটি একে অন্যের নিগেটিভ। ইহাদের এককে —, — ও — এই তিনটি মৌলিক এককের — এককটি দরকার হয় না।

(সরণ, বেগ, দ্রুতি, ত্বরণ, মন্দন, দৈর্ঘ্য, ভর, কাল)

১১। নিউটনের প্রথম সূত্রে দুইটি নূতন রাশির অবতারণা করা হইয়াছে ; উহাদের নাম — ও —। — রাশিটির সহিত — সম্পর্কিত। অন্যটির সঙ্গে সম্পর্কিত রাশি —।

(ভর, বল, ত্বরণ, জাড্য)

১২। বল বাড়াইলে উহার সমানুপাতে — বাড়ে। ইহাতে — এবং — ও বাড়ে।

(সরণ, বেগ, ত্বরণ, মন্দন)

১৩। নিউটনের তৃতীয় সূত্রে দুইটি করিয়া বলের উল্লেখ আছে, উহারা — এবং —। যে বল প্রয়োগ করে তাহার উপর — প্রযুক্ত হয়। — ও বল ; ইহাতে — ঘটিতে পারে। বল দুইটি — ও বিপরীত ; উহারা — বস্তুর উপর প্রযুক্ত।

(ক্রিয়া, ত্বরণ, প্রতিক্রিয়া, বিভিন্ন, সমান)

১৪। এক বল অন্য বলের ক্রিয়াকে — বা — করিতে পারে। দুইটি সমান ও বিপরীত বল একই বস্তুর উপর ক্রিয়া করিয়া উহাকে — অবস্থায় রাখে ; কিন্তু ইহাতে বস্তুটি — হইতে পারে।

(সাম্য, বিনষ্ট, বিকৃত, সাহায্য)

১৫। কোন বস্তুর উপর প্রযুক্ত — ক্রিয়ায় বলের — বলের অভিমুখে সরিলে — বস্তুটির — — করিয়াছে বলা হয়।

(ক্রিয়াবিন্দু, বল, বলের, কার্য, উপর)

১৬। একখানা ইট মাটি হইতে উপরে তুলিতে — — অভিকর্ষের — ইটের — — করে।

(উপর, বিরুদ্ধে, বল, কার্য, প্রযুক্ত)

১৭। কোন বস্তুর — করার — থাকিলে উহার — আছে বলা হয়। — করার হারকে — বলে।

(ক্ষমতা, সামর্থ্য, কার্য, শক্তি)

১৮। —, —, —, — কার্যের একক। —, — ক্ষমতার একক।

(ওয়াট, ফুট-পাউণ্ড, ফুটপাউণ্ডাল, আর্গ, জুল, হর্সপাওয়ার)

১৯। — বস্তুর — আছে। টান করা স্প্রিং-এর — আছে। — বস্তুর — প্রকার শক্তি আছে। বাঁধে আটকান নদীর জলের — আছে।

(স্থিতিশক্তি, সচল, পড়ন্ত, গতিশক্তি, উভয়)

২০। — র প্রভেদে যে — প্রবাহিত হয় তাহাকে — বলে। — বস্তুর বিশেষ এক প্রকার অবস্থা উহা দ্বারা — এক বস্তু হইতে অন্য বস্তুতে যাইবে কি না বোঝা যায়।

(তাপ, শক্তি, উষ্ণতা)

২১। সমপরিমাণ জল ও লোহা সমান উষ্ণ করিতে — তাপ লাগে। একই হারে তাপ সরবরাহ করিলে সমপরিমাণ লোহা ও জলের মধ্যে একই সময়ে জল — গরম হইবে। উহাদের একই উষ্ণতা

হইতে ঠাণ্ডা হইতে দিলে জল — ঠাণ্ডা হইবে। সমপরিমাণ বিভিন্ন বস্তু সমান উষ্ণতা পরিবর্তনে — তাপ ছাড়ে বা নেয়।

(সমান, অসমান, আস্তে, দ্রুত)

২২। কোন বস্তু 30°C হইতে 100°C পর্যন্ত গরম হইতে যে তাপ নেয় তাহা উহার — ও — র উপর নির্ভর করে।

(ভর, ভার, প্রকৃতি, উষ্ণতা)

২৩। — কে তাপে পরিণত করা যায়। ইহাতে বোঝা যায় তাপ এক প্রকার —। তাপ হইতে — পাওয়া সম্ভব।

(শক্তি, ক্ষমতা, কার্য)

২৪। —, —, — দীপক ; — দীপক নয়।

(সূর্য, চন্দ্র, তারা, দীপশিখা)

২৫। আলোকরশ্মি আলোর — নির্দেশ করে।

(বর্ণ, গতিপথ)

২৬। দুই মাধ্যমের বিভেদ তলে আলো আপতিত হইলে প্রথম মাধ্যমে উহার — ও দ্বিতীয় মাধ্যমে — ঘটে। — হইলে আলোর বেগ বদলায়।

(প্রতিফলন, প্রতিসরণ)

২৭। প্রতিসরণ হইলে ঘনতর মাধ্যমে আলোকরশ্মি আপতন বিন্দুতে লম্বের — ও লঘুতর মাধ্যমে লম্ব হইতে — থাকে। ঘনতর মাধ্যমে প্রতিসরণ কোণ আপতন কোণের চেয়ে —। লঘুতর মাধ্যমে আলোর বেগ ঘনতর মাধ্যমের চেয়ে —।

(কাছে, দূরে, ছোট, বড়, বেশী, কম)

২৮। ঘনতর মাধ্যম হইতে আলো আসিয়া লঘুতর মাধ্যমের বিভেদ তলে পড়িলে সাধারণত আলোর — হয়। কিন্তু আপতন কোণ সংকট কোণের চেয়ে বড় হইলে — হয় না।

(প্রতিফলন, প্রতিসরণ)

২৯। আপতিত — কিরণকে উত্তল লেন্স যে বিন্দুতে একত্রিত করে সেই বিন্দুকে লেন্সের ফোকাস বলে।

(সমান্তরাল, যে কোন)

৩০। উত্তল লেন্সকে আমরা যখন বিবর্ধক লেন্সরূপে ব্যবহার করি তখন যে বিবর্ধিত বিম্ব দেখিতে পাই তাহা প্রকৃতিতে —। এই বিম্ব সিনেমার ছবির মত পর্দার উপর ধরা —।

(সৎ, অসৎ, সম্ভব, অসম্ভব)

৩১। কোন দীপক হইতে আলোক রশ্মি প্রিজমের ভিতর দিয়া গেলে, ঐ আলোতে যে সকল রং আছে প্রিজম তাহাদের নিজের — দিকে বিভিন্ন কোণে বিক্ষিপ্ত করে। এই ঘটনাকে — বলে।

(শীর্ষের, ভূমির, বিচ্ছুরণ, বর্ণালি)

৩২। লাল আলোর বেগ নীল আলোর বেগের চেয়ে —। সাদা আলোর দীপক হইতে আসা সরু কিরণ প্রিজমের মধ্য দিয়া গিয়া যে রঙীন পটি সৃষ্টি করে তাহাকে ঐ দীপকের — বলে। রঙীন পটিতে লাল আলো প্রিজমের — দিকে ও নীল আলো — দিকে থাকে।

(বেশী, কম, বিম্ব, বর্ণালি, শীর্ষের, ভূমির)

রসায়ন

১। পদার্থের তিন অবস্থার পার্থক্য কি?

২। কোন দীপশিখার উষ্ণতা 800°C। সোনা, রূপা, তামার গলনাঙ্ক ইহার চেয়ে বেশী। দস্তা (জিংক), সীসা (লেড) ও টিনের গলনাঙ্ক ইহার চেয়ে কম। এই সকল ধাতুর এক টুকরা তার ঐ শিখায় কয়েক মিনিট ধরিয়া রাখিলে কোন্ ক্ষেত্রে কি পরিবর্তন হইবে মনে কর? অনেকক্ষণ রাখিলে তামার তার গলিবে? (বায়ুর ক্রিয়া উপেক্ষা কর।)

৩। মোমবাতি যখন জ্বলে, সে পরিবর্তন রাসায়নিক কি ভৌতিক? ঐ শিখায় গন্ধক ধরিলে কি জাতীয় পরিবর্তন হইবে? ।

তাপের ক্রিয়ায় বিভিন্ন প্রকারের দুইটি ভৌত পরিবর্তন ও দুইটি রাসায়নিক পরিবর্তনের উদাহরণ দাও।

৪। চিনির দ্রাবণ ও চুনের দ্রাবণ উভয়েই ভৌত পরিবর্তন কি না বুঝাইয়া বল।

৫। দীপশিখায় ম্যাগনেসিয়ামের তার ধরিলে উহা তীব্র আলো বিকিরণ করিয়া পোড়ে ও সাদা ছাইয়ে পরিণত হয়। ইহা কি জাতীয় পরিবর্তন?

৬। পেট্রলে খুব সহজেই আগুন ধরে। কিন্তু সরিষার তেলে তাহা হয় না কেন?

৭। তেল বেশী উষ্ণ করিলে উহাতে আগুন ধরে কেন?

৮। চাপে পটকা বা বারুদ ফাটে কেন?

৯। প্রেসার কুকারে রান্না তাড়াতাড়ি হয় কেন?

১০। কাঠে একটু কেরোসিন ঢালিয়া উহাতে জ্বলন্ত দিয়াশলাই ছোঁয়াইলে কাঠ সহজে জ্বলে কেন?

১১। সমপরিমাণ জলে যতটা চিনি গোলা যায় ততটা নুন গোলা যায় কি? সমপরিমাণ উষ্ণ জলে কি বেশী চিনি গলিবে? জলের উষ্ণতা বাড়াইয়া কি অনেক নুন গোলা যায়?

১২। জল কিছু গরম করিলে উহা হইতে ছোট ছোট বুদ্‌বুদ বাহির হয় কেন?

১৩। বাড়িতে কাচের বাক্সে মাছ রাখিলে, জলের ভিতর দিয়া বায়ুর বুদ্‌বুদ পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতে হয় কেন?

১৪। নুনের দ্রবণ দিয়া বিদ্যুৎপ্রবাহ যায়, কিন্তু চিনির দ্রবণ দিয়া যায় না কেন?

১৫। গ্যাস জারে হাইড্রোজেন সংগ্রহ করিতে জার নির্গম নলের উপর উবুড় করিয়া রাখিতে হয়। কিন্তু SO_2 বা CO_2 সংগ্রহ করিতে নির্গম নল খাড়া জারের নিচ পর্যন্ত চালাইয়া দেওয়া হয়। ইহার কারণ কি?

১৬। NaOH বা KOH হাইড্রোক্লোরিক এসিডের এসিড ধর্ম দূর করিতে পারে; অতএব উহারা ক্ষারক। Znও অনুরূপ কাজ করিতে পারে। কিন্তু Zn-কে ক্ষারক বলা হয় না কেন?

১৭। অক্সিজেন, হাইড্রোজেন বা নাইট্রোজেন গ্যাস জারে সংগ্রহ করিতে গ্যাস জার জলে ভরিয়া নেওয়া হয়। অ্যামোনিয়া, CO_2, SO_2 বা H_2S-এর ক্ষেত্রে এরূপ হয় না কেন?

১। নিচের সমীকরণগুলিতে শূন্যস্থান পূর্ণ কর;

(ক) $HCl + \dots\dots = NaCl + H_2O$

(খ) $\dots\dots + NH_3 = NH_4NO_3$

(গ) $NH_4Cl + NaNO_2 = NH_4NO_2 + \dots\dots$

(ঘ) $CaCO_3 + 2HCl = CaCl_2 + \dots\dots + H_2O$

(ঙ) $Zn + H_2SO_4 = ZnSO_4 + \dots\dots$

(চ) $NH_4Cl + NaOH = NaCl + \dots\dots + H_2O$

(ছ) $NH_3 + H_2O = \dots\dots$

(জ) $FeS_2+H_2SO_4=FeSO_4+$.........

(ঝ) ....$+2H_2SO_4=CuSO_4+SO_2+2H_2O$

২। বন্ধনীতে দেওয়া শব্দগুলি হইতে ঠিক কথাটি নিয়া শূন্য স্থান পূর্ণ কর :

(ক) কার্বন ডাইঅক্সাইড বায়ুর তুলনায় —। (হাল্কা, ভারী)

(খ) হাইড্রোজেন বায়ুর তুলনায় —। (হাল্কা, ভারী)

(গ) অক্সিজেন — প্রতিস্থাপনে সংগ্রহ করা হয়। (বায়ু, জল)

(ঘ) অ্যামোনিয়া — প্রতিস্থাপনে সংগ্রহ করা হয়। (বায়ু, জল)

(ঙ) প্যালাডিয়াম ধাতু — অধিশোষণ করে। (অক্সিজেন, হাইড্রোজেন)

(চ) হাইড্রোজেন সালফাইড সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডের সঙ্গে বিক্রিয়ায় — রূপে বিক্রিয়া করে। (বিজারক, এসিড)

(ছ) পরমাণু হইতে ইলেকট্রন বিচ্ছিন্ন হইয়া — উৎপন্ন হয়। (ক্যাটায়ন, অ্যানায়ন)

৩। শূন্যস্থান পূর্ণ কর :

(ক) কার্বন ডাইঅক্সাইড জলে দ্রাবিত হইয়া — — উৎপন্ন করে।

(খ) জলের ইলেকট্রোলাইসিসে ক্যাথোডে — ও অ্যানোডে — উৎপন্ন হয়।

(গ) ক্লোরিনের সঙ্গে বিক্রিয়ায় সালফার ডাইঅক্সাইড — রূপে বিক্রিয়া করে।

(ঘ) অ্যামোনিয়া বায়ুর তুলনায় —।

(ঙ) সবচেয়ে শীতল অবস্থা সৃষ্টি করিতে পরীক্ষাগারে — ব্যবহৃত হয়।

(চ) এসিড জলে দ্রাবিত হইয়া — আয়ন উৎপন্ন করে।

(ছ) ক্ষার জলে দ্রাবিত হইয়া — আয়ন উৎপন্ন করে।

(জ) অসংপৃক্ত দ্রবণের উষ্ণতা কমাইলে উহা কোন না কোন নিম্নতর উষ্ণতায় — দ্রবণে পরিণত হয়।

(ঝ) প্রত্যেক দ্রবণই স্বচ্ছ — মিশ্রণ।

৪। শুদ্ধ কথাটি রাখিয়া অন্যটি কাটিয়া দাও :

(ক) দ্রাব ও দ্রাবকের ওজনের যোগফল দ্রবণের ওজনের সমান/বেশী।

(খ) ক্ষারের দ্রবণে লিটমাস দিলে উহার রং লাল/নীল হয়।

(গ) বরিক এসিড তরল/কঠিন পদার্থ।

(ঘ) সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড জলে দিলে তাপ শোষিত/উৎপন্ন হয়।

(ঙ) জলের রাসায়নিক চিহ্ন/সংকেত H_2O।

(চ) পরমাণুতে ইলেকট্রন যুক্ত হইয়া অ্যানায়ন/ক্যাটায়ন উৎপন্ন হয়।

(ছ) কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস বেলুন উড়াইতে/আগুন নিভাইতে ব্যবহৃত হয়।

(জ) ধাতুতে ইলেকট্রোপ্লেটিং করার সময় ঐ ধাতুকে অ্যানোড/ক্যাথোড করা হয়।

(ঝ) যে যৌগ তরল বা দ্রাবিত অবস্থায় বিদ্যুৎ পরিবহণ করে তাহাকে ইলেকট্রোড/ইলেকট্রোলাইট বলে।

(ঞ) সোডিয়াম ক্লোরাইডের আণবিক/আনুপাতিক সংকেত NaCl।

(ট) কার্বন ডাইঅক্সাইডের সংকেত CO_2 উহার আণবিক সংকেত ও আনুপাতিক সংকেতের দুইটিকেই/একটিকে বুঝায়।

(ঠ) চিনির জলীয় দ্রবণের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ প্রবাহিত হইতে পারে/পারে না।

(ড) সোডিয়াম কার্বনেটের আণবিক/আনুপাতিক সংকেত Na_2CO_3।

(ঢ) রাসায়নিক বিক্রিয়ায় জারণ ও বিজারণ আলাদা আলাদা/একই সঙ্গে ঘটে।

৫। নিচের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় কোন্ বিক্রিয়কটি জারক ও কোন্ বিক্রিয়কটি বিজারক ?

(ক) ক্লোরিন+হাইড্রোজেন সালফাইড ⟶ হাইড্রোজেন ক্লোরাইড+সালফার

(খ) কার্বন+জলীয় বাষ্প ⟶ কার্বন মনক্সাইড+হাইড্রোজেন

(গ) কপার+সালফিউরিক এসিড ⟶ কপার সালফেট+সালফার ডাইঅক্সাইড

(ঘ) সালফার+অক্সিজেন ⟶ সালফার ডাইঅক্সাইড

(ঙ) আয়রন+সালফার ⟶ ফেরাস সালফাইড

৬। হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম বেলুনে ভরা হয়, কিন্তু কার্বন ডাই-অক্সাইড ভরা হয় না কেন ?

৭। বেলুনে হাইড্রোজেনের বদলে হিলিয়াম ভরা সুবিধাজনক কেন ?

৮। মোমবাতির দহনে তাপ ও আলো উৎপন্ন হওয়ার কারণ কি ?

৯। চুনের জলে ফুঁ দিলে জল ঘোলা হয় কেন ?

১০। কোন বিশুদ্ধ হলুদ রংয়ের পদার্থ গরম করিলে বর্ণহীন গ্যাস ও রূপালী কঠিন পদার্থ পাওয়া যায়। হলুদ রংয়ের পদার্থটি মৌল না যৌগ ?

১১। নিচের চিহ্ন/সংকেত কি বুঝায় :

Ar, Na, H_2, H_2O, NaCl ?

১২। নিচের রাসায়নিক পদার্থগুলির চিহ্ন/সংকেত লেখ :

(i) কার্বন ডাই-অক্সাইড, (ii) জল, (iii) নিয়ন, (iv) নাইট্রোজেন, (v) অ্যামোনিয়া, (vi) সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড।

১৩। হাইড্রোক্লোরিক এসিড, নাইট্রিক এসিড ও সালফিউরিক এসিডের প্রত্যেকটিতেই কোন্ একটি বিশেষ মৌল আছে ?

১৪। চিনির সংপৃক্ত দ্রবণে আরো চিনি দিলে ঐ দ্রবণ কি আরো মিষ্টি হইবে ?

১৫। কপার সালফেটের নীল রংয়ের সংপৃক্ত দ্রবণে আরো কপার সালফেট দিলে ঐ দ্রবণ কি আরো বেশী নীল হইবে ?

১৬। 100 গ্রাম জলে এক গ্রাম নুন দিলে উহা সম্পূর্ণ দ্রাবিত হয়। কিন্তু একই পরিমাণ জলে এক গ্রাম সিলভার ক্লোরাইড দিলে উহার বেশীর ভাগই পড়িয়া থাকে কেন ?

১৭। ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইডের জলীয় দ্রবণে অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড দিলে উৎপাদিত ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রক্সাইড কি কারণে দ্রাবিত না থাকিয়া অধঃক্ষিপ্ত হয় ?

১৮। নুন জলে দ্রাবিত হয় ; চুনও জলে দ্রাবিত হয়। এই দুই পদার্থের দ্রবীভবনে কি পার্থক্য আছে ?

১৯। অ্যামোনিয়াম কার্বনেট শুঁকিলে অ্যামোনিয়ার গন্ধ পাওয়া যায়, কিন্তু অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড শুঁকিলে অ্যামোনিয়ার গন্ধ পাওয়া যায় না। ইহার কারণ কি ?

২০। লিটমাস দেওয়া একই পরিমাণ হাইড্রোক্লোরিক এসিডের (i) একটিতে ফোঁটা ফোঁটা করিয়া সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডের দ্রবণ বেশী পরিমাণে দেওয়া হইল ও (ii) আরেকটিতে ফোঁটা ফোঁটা করিয়া বেশী পরিমাণে সোডিয়াম ক্লোরাইডের দ্রবণ দেওয়া হইল। এই পদার্থগুলির মেশানোয় কি কি পরিবর্তন হইবে ?

২১। ভিনিগার, লেবুর রস ও দই প্রত্যেকটিই টক। ইহাদের মধ্যে আর কি কি মিল দেখা যাইতে পারে ?